

THE BIOGRAPHY OF
ABU BAKR AS-SIDDEEQ ﷺ

এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আবু বকর আস-সিদ্দীক

প্রথম খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী
অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMMAD EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ



মাক্তাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

REPRINTED, MAR 2020

مكتبة الفرقان

জীবন ও কর্ম
আবু বকর আস-সিদদীক
রাযিয়াল্লাহু আনহু
প্রথম খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

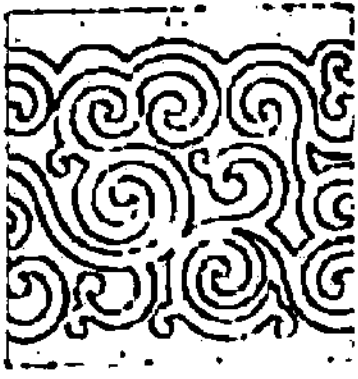
—◆—
অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর
মুহাদিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজিপুর



MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS

ঢাকা, বাংলাদেশ



আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. (প্রথম খণ্ড)

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamibooks.com

maktabfurqan@gmail.com

☎ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫-২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ☎ +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫

পঞ্চম প্রকাশ : শাবান ১৪৪২ / মার্চ ২০২১

চতুর্থ সংস্করণ : জিলকদ ১৪৪১ / জুলাই ২০২০

তৃতীয় সংস্করণ: রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / ডিসেম্বর ২০১৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : জমাদিউস সানি ১৪৩৯ / মার্চ ২০১৮

প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৭ / নভেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

গ্রন্থ সংশোধন : মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান

ISBN : 978-984-91176-3-6

মূল্য : ৳৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)

US\$24.95

অনলাইন পরিবেশক

www.islamibooks.com; www.rokomari.com

www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা



الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলরস অব আর্টসে ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৯৬ সালে উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পিএইচডি থিসিসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক বলেন,

আমার পিএইচডির বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে ‘পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়া এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসে এই শিক্ষার প্রভাব’- এর প্রস্তাব করি। এটা সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার থিসিসটি তিনটি প্রধান অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত হবে... শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর থিসিসটি দীর্ঘ বারশ পৃষ্ঠার বেশি লেখা হয়ে যায়। এত দীর্ঘ থিসিস পেপার দেখে আমার গবেষণা সুপারভাইজার কেবল প্রথম অধ্যায়েই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেন।... আমার গবেষণা সুপারভাইজার আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যা আমার জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন আমার মূল থিসিসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়কে পুনরায় লিখি এবং বই আকারে প্রকাশ করি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল, ‘একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনের শিক্ষা’ - যা পরবর্তী সময়ে ‘আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ’ কিতাব হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন থেকে শিক্ষা’-কে চারটি ভিন্ন কিতাব হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি কিতাবে একজন করে খলীফার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

এ সূত্র ধরেই তিনি ‘সিরাতে আবু বকর রা.’ প্রকাশ করেন। এটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী কালে ফয়সাল শফীক কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ২০০৭ সালে মাকতাবা দারুস সালাম প্রকাশনা থেকে *The Biography of Abu Bakr ra.* নামে প্রকাশিত হয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ—**জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.**। বইটি অনুগ্রহ করে সম্পাদনা করে দিয়েছেন টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেব। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে এদেশে ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর কোনো গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। মাকতাবাতুল ফুরকান উক্ত লেখকের সকল গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতিও লাভ করেছে।

মাকতাবা দারুস সালাম একটি বিশ্বস্ত ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সারা বিশ্বে এর অসংখ্য শাখা রয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকা, আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত। এরকম একটি প্রকাশনার অনুবাদ গ্রন্থের মান নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এ গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদক কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। সম্ভবত তিনি এটি ইংরেজি পাঠকদের বোধগম্যতার বিষয়টি চিন্তা করে অথবা মূল লেখকের অনুমতিক্রমেই করেছেন। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিকর মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা পাঠকের জন্য সহায়ক হয়েছে। বইটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হলেও সম্মানিত সম্পাদক সাহেব তা মূল আরবী বইয়ের সাথেই তুলনা করে সম্পাদনা করেছেন। অনেক সংযোজন অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়াতে বাদ দেওয়া হয়েছে, কোথাও বিবরণের স্বার্থে অতিরিক্ত কথা রাখা হয়েছে। আবার ইংরেজি অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন অনেক অংশ মূল কিতাব থেকে অনুবাদ করে সম্মানিত সম্পাদক সাহেব তা এখানে সংযোজন করে দিয়েছেন। এভাবে মূল আরবী কিতাবের সাথেই যথাসম্ভব সামঞ্জস্যতা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি আলেম নই। অনুবাদের এ বিশাল কাজের উপযুক্তও নই। তবে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম দীনী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমেঁর সোহবতে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। তার সোহবতের উসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ অযোগ্যকে এ কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। খুব আশা, তিনি এটা কবুলও করবেন। সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এ কিতাব আখেরাতে নাযাতের উসিলা হবে।

ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮৪। এ বিশাল কলেবরের বইটি বাংলায় অনুবাদের পর পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বেড়েছে। এজন্য পাঠ-সুবিধা এবং সৌন্দর্য ও মননশীলতার দিকটি বিবেচনা করে বইটি দু-খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহ অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনুদিত মারেফুল কুরআন (মুফতী শফী রহ.), মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনুদিত তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.) এবং আল-কুরআনুল করীম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ) অনুসরণ করা হয়েছে। হাদীসসমূহ অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসের বিশ্বস্ত কিতাবসমূহ ও অন-লাইন তথ্য-মিডিয়াস সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে যেখানে সূত্র অনুযায়ী হাদীসের বাংলা অনুবাদ পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে প্রয়োজনীয় অনুবাদ সম্মানিত সম্পাদক সাহেব যথাযোগ্য সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ ধর্মকে সুস্থির এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আরও ব্যাপক করেছেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় জান-প্রাণ, মাল-দৌলত, পরিবার-পরিজন দিয়ে ইসলামের খেদমতের পাশাপাশি রাসূলের

ইন্তেকালের পর মাত্র দু-বছরের খেলাফতকালে তিনি যে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনেকেই এ কিতাবের প্রুফ সংশোধন ও প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ক্রটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী

মাকতাবাতুল ফুরকান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

১০ জুলাই ২০২০

সম্পাদকের কথা



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

এটা নিশ্চিত সৌভাগ্য যে, এ অধ্যমকে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। জীবনের সময়গুলো যখন কোনো উত্তম ও আল্লাহর প্রিয় কাজে ব্যয় হয়, তখন আল্লাহরই প্রশংসা করা উচিত দিল খুলে, যাতে তিনি এরূপ তাওফিক আরও নসীব করেন। ২০১৩ সালে হজের সফরে বর্তমান আরব বিশ্বের বিদগ্ধ সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবীর রচিত ইসলামের মহান প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ দু-টি ক্রয় করি। সফর থেকে আসার পর প্রথম কয়েকদিন নিয়মিতভাবে, এরপর মাঝে মাঝে গ্রন্থ দু-টি অধ্যয়ন করি।

মাদরাসার ছাত্র হওয়ার কারণে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত, সেই সাথে খুলাফায়ে রাশীদীনের জীবন ও কীর্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক প্রকাশিত ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবী প্রণীত গ্রন্থ দু-টি বিভিন্ন কারণে আলোচনা ও মনযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। কারণ লেখক একদিকে যেমন তার রচনাকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তিনি তাদের জীবন ও প্রতিটি কর্মকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে অত্যন্ত সফলভাবে চিত্রায়ন করেছেন। খলীফা হওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে কাছের দুই সাহাবী কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে নিজেদের জীবন গড়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কিভাবে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেছেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পরে পর্যায়ক্রমে তারা খলীফা হওয়ার পর কিভাবে সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করেছেন - এর বর্ণনা আধুনিক পাঠকদের উপযোগী করে খুব সুন্দরভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক কমান্ডার মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমেদ স্নেহধন্য ও তার মজলিসের বয়ানের সংকলক। হযরতের সাথে তিনি দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। তিনি আমাকে একদিন তার ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবী রচিত জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. গ্রন্থটি সম্পাদনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। এক পর্যায়ে আমি তা করতে রাজি হই। কিন্তু কাজটি হাতে নেওয়ার পর মনে হলো, কাজটি যথেষ্ট কঠিন। কারণ অনুবাদক ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন অথচ আমি ইংরেজি জানি না। আমি আরবিতে রচিত মূল গ্রন্থের সাথে তার অনুবাদ মেলাতে গিয়ে বিপাকে পড়লাম। মূল আরবির সাথে বাংলা অনুবাদের বেশ কিছু জায়গায় অমিল পাওয়া গেল। অনুবাদকের সাথে পরামর্শ করে কাজ শুরু করি। আমি আরবির সাথে সংঘাতপূর্ণ না হলে তা বহাল রাখলাম। আর কিছু জায়গা সহজে মূল আরবির অনুবাদরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে বলে তাই করলাম। ইংরেজি অনুবাদে কিছু বিষয় বাদ পড়েছিল। সেগুলোও সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। পুরো অনুবাদে ব্যক্তি, বিভিন্ন জায়গার নাম, কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তরজমা মূল গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি।

মাদরাসায় পড়ার সময় আকবরাবাদী সাহেবের রচিত 'সিদ্দীকে আকবর' অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, এ বই না পড়লে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানাই হতো না। এখন আবার তারই জীবনী ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবীর

রচনায় শব্দে শব্দে পড়ার সুযোগ হয়েছে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুণাবলী বলে বা গুণে শেষ করা যাবে না। তবে তার যে গুণটি তাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল, তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ও তার সামনে নিজের সবকিছুকে নিবেদন করা। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মাঝে এর অভাবই সবচেয়ে প্রকট। এ উম্মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। আর উষর মরুতে দিক-ভ্রান্ত মুসাফিরের মতো মরীচিকার পেছনে ছুটছে।

সম্পাদনা করতে বেশ সময় লেগেছে। অনুবাদকের তাগাদা না থাকলে হয়তো আরও সময় কেটে যেত। আল্লাহর অশেষ কৃপায় প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। আমি মনে করি, এ বইয়ের অধ্যয়ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর প্রতি অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের জন্য বিরাট পাথেয় হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রিয় সাহাবীদেরকে আরও গভীরভাবে জানার এবং তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য সহায়ক হবে।

গতানুগতিকতার জন্য বলছি না, সত্যিকার অর্থেই আমি এ কাজের মোটেও যোগ্য নই। সেই সাথে অসচেতনও বটে। তারপরেও আল্লাহর তাওফিকে ভালো যা হয়েছে, তার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহর। আর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমার।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের পথে অবিচল রাখুন এবং এই বাংলা অনুবাদকে কবুল করুন।

মুহাম্মাদ আবু বকর

টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা

টঙ্গী, গাজীপুর

সূচিপত্র

ভূমিকা

১৯



মক্কা মুকাররমায় আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর জীবন

প্রথম অধ্যায়

তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা, পরিবার এবং
জাহেলী যুগে জীবন

এক। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, এবং উপাধি	৩৭
১। আল-আতীক	৩৮
২। আস-সিদ্দীক	৪০
৩। আস-সাহিব	৪১
৪। আল-আতকা	৪২
৫। আল-আউওয়াহ	৪৩
দুই। তার জন্ম এবং দৈহিক গঠন	৪৩
তিন। তার পরিবার	৪৪
১। কতিলাহ বিনতে আব্দুল-উজ্জাহ	৪৫
২। উম্মে রুমান ইবনে আমির ইবনে উওয়াইমার	৪৭
৩। আসমা বিনতে উমাইস ইবনে মা'বাদ	৪৭
৪। হাবীবাহ বিনতে খারিযাহ ইবনে যায়িদ	৪৮
চার। জাহেলী যুগে তার জীবন	৫৫
১। বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তার পারদর্শীতা	৫৭
২। তার ব্যবসা	৫৮
৩। গোত্রের লোকদের ভালোবাসা ও চিন্তাকর্ষণের কেন্দ্র	৫৮
৪। তিনি অন্ধকার যুগেও মদ পান করেননি	৬০
৫। তিনি কোনো মূর্তিকে সেজদা করেননি	৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়

তার ইসলাম এবং ইসলামের প্রচারে ভূমিকা, ত্যাগ-তিতিকা এবং প্রথম হিজরত

এক। ইসলাম গ্রহণ	৬৪
দুই। ইসলাম প্রচারে ভূমিকা	৭১
তিন। পরীক্ষা এবং দুর্ভোগ	৭৪
চার। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা	৮২
পাঁচ। নিজের সম্পদ ব্যয় করে নির্যাতিত মুসলমান দাসদের মুক্ত	৮৬
ছয়। প্রথম হিজরত এবং ইবনুদ দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ	৯৫
সাত। আরব প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ	১০৩

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে আবু বকর রা.-এর মদীনায় হিজরত

শিক্ষা এবং উপদেশ	১২১
১। অবিশ্বাসীরা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে	১২২
২। রাসূল সা.-এর মদীনায় হিজরতের সময় আবু বকর রা.	১২৩
৩। তিনি রাসূল সা.-এর সাথে গুহায় সঞ্জী ছিলেন	১২৩
৪। আক্ষরিক অর্থে তাকেই রাসূলের সঞ্জী বলা হয়েছে	১২৩
৫। তিনি রাসূলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য সতর্ক ছিলেন	১২৪
৬। ‘আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’ এর বৈশিষ্ট্য তিনি	১২৫
৭। রাসূল সা.-এর দুঃখ-দুর্দশা এবং সাহায্য ও সাকীনা অবতীর্ণ	১২৬
দুই। লক্ষ্যে পৌঁছতে মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা করা	১২৭
১। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.-এর ভূমিকা এবং অবদান	১৩০
২। আয়েশা রা. এবং আসমা রা.-এর সাধারণ ভূমিকা	১৩১
৩। আসমা রা.-এর বিশেষ ভূমিকা	১৩১
৪। ঘরে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরিতে আসমা রা.	১৩২
৪। আবু বকর রা.-এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা রা.	১৩৩
তিন। আবু বকর রা.-এর নিষ্ঠা	১৩৫
চার। নেতৃত্বে বিচক্ষণতা ও মানুষের সাথে আচরণের দীক্ষা	১৩৮
পাঁচ। মদীনায় পৌঁছার পর আবু বকর রা.-এর অসুস্থতা	১৪০

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রা.

এক। বদরের যুদ্ধে আবু বকর রা.	১৪৬
ক। সংকটময় যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নে তার পরামর্শ	১৪৬
খ। শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে রাসূল সা.-এর সহযোগী	১৪৭
গ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর তাঁবুতে তাঁর গ্রহরী হিসেবে ভূমিকা	১৪৮
ঘ। আবু বকর রা.-কে বিজয়ের সুসংবাদ জানানো হয়েছে	১৪৮
ঙ। বদরের বন্দীরা ও হযর আবু বকর রা.	১৫১
দ্বিতীয়। উহুদ এবং হামরা উল-আসাদ	১৫৬
তৃতীয়। বনু আন-নাদির, বনু আল-মুস্তালিক, আল-খান্দাক এবং বনু কুরাইষার যুদ্ধ	১৬০
বনু আল-মুস্তালিক	১৬৪
খন্দক এবং বনু কুরাইষা	১৬৫
চতুর্থ। হুদাইবিয়া	১৬৫
হুদাইবিয়ার সন্ধি	১৬৭
হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আবু বকর রা.-এর ভূমিকা	১৬৯
পঞ্চম। খায়বারের যুদ্ধ, নাজদ অভিযা এবং বনু ফাযারাহ মিশন	১৭৩
বনু ফাযারাহ সম্পর্কে	১৭৫
ছয়। উমরাতুল কাযা এবং আস-সালাসিল অভিযান	১৭৬
১। উমরাতুল কাযা	১৭৬
২। আস-সালাসিল অভিযান	১৭৭
শিক্ষা এবং উপদেশ	১৭৮
সাত। মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযান	১৮১
✓ মক্কাবিজয় (অষ্টম হিজরী)	১৮১
✓ আবু বকর রা. এবং আবু সুফিয়ান	১৮৩
✓ আয়েশা রা. এবং আবু বকর রা.-এর মধ্যে আলোচনা	১৮৩
✓ আবু বকর রা.-এর মক্কায় প্রবেশ	১৮৪

✓ ছনাইনের যুদ্ধ	১৮৫
✓ আবু বকর রা. শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করলেন	১৮৬
✓ আব্বাস ইবনে মিরদাসের কবিতা	১৮৭
✓ আত-তায়েফ	১৮৯
✓ তাবুক যুদ্ধ, নবম হিজরীতে হজ এবং বিদায় হজ	১৯২
✓ নবম হিজরীতে আমীরুল হজরুপে আবু বকর রা.	১৯৬

পঞ্চম অধ্যায়

মদীনায় আবু বকর রা.-এর জীবন এবং তার কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী

এক। এক নজরে তার মদীনার জীবন	২০১
ক। মদীনার এক ইহুদী ধর্মযাজক ফিনহাসের সাথে তার বিরোধ	১৯২
খ। রাসূলুল্লাহ সা. এর গোপন তথ্যের হেফাজত	১৯৪
✓ আবু বকর রা. এবং জুমু'আর নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	২০৪
✓ টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের ব্যাপারে আবু বকর রা.	২০৫
✓ হালাল রিক্রিকের ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর সতর্কতা	২০৫
✓ আমাকে আপনাদের সন্ধির মধ্যে বসার অনুমতি দিন	২০৬
✓ সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ	২০৭
✓ অতিথিদের সম্মান	২০৮
✓ আবু বকর রা.-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষ্য	২১০
✓ বল, 'হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।'	২১৫
✓ ভালো কাজে প্রতিযোগিতা	২১৮
✓ কিভাবে তিনি রাগকে সংবরণ করতেন	২১৯
✓ আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি	২২১
✓ মদীনা থেকে শামে ব্যবসা করার জন্য গমন	২২৩
✓ আবু বকর রা.-এর আত্মমর্যাদাবোধ	২২৩
✓ আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি	২২৪
দুই। আবু বকর রা.-এর স্বতন্ত্র গুণাবলী	২২৫
✓ আল্লাহর উপর মজবুত বিশ্বাস	২২৬
✓ তার প্রজ্ঞা	২৩০
✓ তার দু'আ ও প্রচণ্ড বিনয়-কাতরতা	২৩৬

রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল, বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে গণজমায়েত এবং উসামার সেনাবাহিনী

প্রথম অধ্যায়

রাসুলুল্লাহ সা. এর ইন্তেকাল এবং বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে গণজমায়েত

প্রথম। রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল	২৪৫
দ্বিতীয়। ভয়ানক পরিবেশ এবং আবু বকর রা.-এর অবস্থান	২৫৪
তৃতীয়। বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে	২৫৯
শিক্ষা ও করণীয়	২৬২
১। জনগণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা	২৬২
২। আবু বকর রা. এবং উমর রা. উভয়ে নির্বাচিত	২৬৬
৩। খেলাফতের ব্যাপারে তার অবস্থান	২৭১
৪। মতভেদসমূহ সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এর মূল্যায়ন	২৭৪
৫। ‘(মুসলিম জাতির) নেতা কুরাইশ সম্প্রদায় থেকে হতে হবে।’	২৭৬
৬। কুরআন মাজীদে আয়াতে ইশারা	২৮১
৭। হাদীসসমূহ যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত রয়েছে	২৮৭
৮। আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা	২৯৮
৯। খেলাফত কী? খলীফা বলতে কি বোঝায়?	৩০১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ

প্রথম। সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ	৩০৯
১। আনুগত্যের শপথ বা বাইআত-এর তাৎপর্য	৩১২
২। আবু বকর রা.-এর সময় প্রণীত আইনসমূহের উৎস	৩১৬
৩। দেশের নাগরিক কর্তৃক খলীফাকে পর্যবেক্ষণ	৩১৮
৪। দেশের সকল নাগরিকদের মধ্যে ন্যায় বিচার	৩২০

৫। সম্পর্কের ভিত্তি হবে সত্যবাদিতা	৩২৯
৬। রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়নি	৩৩১
৭। ব্যভিচার এবং অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	৩৩২

দ্বিতীয়। আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা ৩৩৭

১। আবু বকর রা. : সমাজের একজন আদর্শ ব্যক্তি	৩৪১
২। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে বিচার ব্যবস্থা	৩৫৭
৩। বিধবা মহিলার পুনর্বাসন বিয়ে করার আগ পর্যন্ত অধিকার	৩৬২
৪। মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ	৩৬৪
৫। আবু বকর রা. খলীফা হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া	৩৭৩
৬। আমাদের (নবীদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না	৩৭৮



উসামার বাহিনী এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ

প্রথম অধ্যায়

উসামা রা.-এর বাহিনী

প্রথম। উসামা রা.-এর নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রেরণ	৩৮৯
দুই। উসামার বাহিনীর ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত	৪০১
তিন। উসামার বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষা	৪০৯
১। কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় না	৪০৯
২। কারও মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি থেমে যায় না	৪১২
৩। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যই কুরআন এবং হাদীস	৪১৯
৪। কথা অনুযায়ী আমল হতে হবে এবং ইসলামের সেবায়	৪২১
৫। যুদ্ধের আদব-কায়দা	৪২৪
৬। উসামার বাহিনী প্রেরণে রাজনৈতিক ফায়দা	৪২৭

ভূমিকা



নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে আশ্রয় চাই। আমরা তার কাছেই ক্ষমা এবং সাহায্যপ্রার্থী। আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি ও মন্দ কর্ম থেকে তার আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَوْتِنُوا إِلَّا وَانْتُمُ
مُسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।^১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীণীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু-জন থেকে অগণিত পুরুষ ও

^১ সূরা আল-ইমরান, ৩:১০২।

নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে
অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-
স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ
তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।^২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি
তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের
আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।^৩

বস্তুত, সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম
পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর সবচেয়ে
জঘন্য অপরাধ ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন। সব নতুন সংযোজন
বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত পথভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতার
পরিণাম জাহান্নাম।

ছোট বেলা থেকেই আমি খুব আবেগ নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
আনহুর জীবনী পড়তাম। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা আমাকে
মদীনা মুনাওওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার
তাওফিক দেন। সেখানে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক একটি কোর্স
ছিল। ঐ কোর্সের অংশ হিসেবে আমি খুলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে
হযরত আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত
উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে
আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব
রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী অধ্যয়ন করি। কোর্স শিক্ষকের উপদেশ

^২ সূরা আন-নিসা, ৪:১।

^৩ সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৭০-৭১।

ছিল, আমরা যেন কেবল সিলেবাসের নির্ধারিত কিতাব (আত-তারিখ আল-ইসলামী, মুহাম্মাদ শাকির) পড়ার মধ্যেই সীমিত না থাকি। এর পাশাপাশি অন্যান্য কিতাব যেমন ইবনে কাছিরের আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া এবং ইবনে আছিরের আল-কামিলও যেন অধ্যয়ন করি। এভাবে আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী আরও গভীরভাবে জানার জন্য বিশাল উৎসের সন্ধান পেয়ে যাই।

কয়েক বছর পর আমি উম্মে দারমান আল-ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন আমার পিএইচডির বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে ‘পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়া এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসে এই শিক্ষার প্রভাব’- এর প্রস্তাব করি। এটা সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার থিসিসটি তিনটি প্রধান অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত হবে : এক, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা; দুই, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনীর শিক্ষা; তিন, একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম চার খলীফার (খুলাফায়ে রাশেদীন) জীবনীর শিক্ষা। শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর থিসিসটি বারশ পৃষ্ঠার বেশি লেখা হয়ে যায়। এত দীর্ঘ থিসিস পেপার দেখে আমার গবেষণা সুপারভাইজার কেবল প্রথম অধ্যায়েই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এটাই চূড়ান্ত হয়।

থিসিসটি জমা দেওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী প্রফেসরদের একটি পর্ষদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমার গবেষণা সুপারভাইজার আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যা আমার জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন আমার মূল থিসিসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়কে পুনরায় লিখি এবং বই আকারে প্রকাশ করি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল, ‘একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনীর শিক্ষা’ - যা পরবর্তী কালে ‘আস-সিরাহ

আন-নবুওওয়াহ' কিতাব হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন থেকে শিক্ষা'-কে চারটি ভিন্ন কিতাব হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি কিতাবে একজন করে খলীফার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

আপনাদের সামনে এখন যে কিতাব, 'জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু', এটার লেখা সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, তারপর আমার গবেষণা সুপারভাইজার, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখগণ যারা আমাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী অধ্যয়ন করতে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বিষয়ে তাদের একজনের একটি কথা আমার হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এজন্য আমার মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পড়ার গুরুত্ব বুঝে আসে। একইভাবে রাসূলের সকল সাহাবীদের জীবনী পড়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত হই। তিনি বলেছিলেন,

আধুনিক মুসলমানদের সাথে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়েছে। অনেকে জানে না যে, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কোনটাকে আগে প্রাধান্য দিতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী থেকে এখন অনেকে স্কলারদের জীবনী অধ্যয়ন করতেই বেশি পছন্দ করে। অথচ খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী অধ্যয়ন ইসলামের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার।

খেলাফতে রাশেদাহর যুগেই একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের সকল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেবল প্রতিষ্ঠিতই নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় যত বিভাগ রয়েছে যেমন প্রশাসনিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। খেলাফতে রাশেদাহর শাসনামল যত বেশি উন্নত ছিল,

ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা কখনই তার চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারেনি। তখন এমন এক সময় ছিল, যখন ইসলাম সারাবিশ্বে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, খেলাফতে রাশেদাহর যুগের এতসব সাফল্য ও প্রাপ্তি সত্ত্বেও আধুনিক কিছু মুসলমান ছাত্ররা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর স্কলারদের জীবনী অধ্যয়নের ব্যাপারে অধিক সময় ব্যয় করে, অথবা সমসাময়িক স্কলারদের জীবনী পড়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, যত না আগ্রহী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীর ব্যাপারে।

এ কিতাব লেখার স্বপ্ন থেকে লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি প্রতি পদে পদে আল্লাহর সাহায্য ও করুণা লাভ করেছি। তিনি আমার পথের সব বাধা দূর করে দিয়েছেন। রাতের পর রাত কাজ করার ক্ষেত্রে আমাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং আমার জন্য তথ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সহজ করে দিয়েছেন যা অপরিহার্য ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি কোনো বাধাকেই পরওয়া করিনি। বরং সেগুলোকে অতিক্রম করার জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করার তাওফিক লাভ করেছি।

খেলাফতে রাশেদাহর ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানা কোনো সহজ বিষয় নয়। এর প্রধান কারণ হলো, তাদের জীবনীর তথ্যসমূহ বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এজন্য ইতিহাস গ্রন্থ, হাদীস, ফিকহ, কবিতা এবং তাফসীর—সবগুলো বিষয়েই গভীর ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। এ কিতাবের মূল লক্ষ্য ছিল (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীর উপর আমার অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রেও), বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত তথ্যসমূহ এক জায়গায় একত্রিত করা। তারপর এগুলোকে ক্রমানুসারে এবং বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে এদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, এসব তথ্যের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা। যদি খেলাফতে রাশেদাহর জীবনী

সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে এর দ্বারা প্রতিটি মুসলমানের আত্মিক এবং জাগতিক জীবনের জটিল সমস্যাতির সহজ সমাধান সম্ভব।

আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কারণ তারা এমন একটি যুগের সাথে সম্পর্কিত যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহা কৃতকার্যতা।^৪

আল্লাহ আরও বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।^৫

^৪ সূরা আল-তাওবাহ, ৯:১০০।

^৫ সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুগ সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমাকে সবচেয়ে উত্তম যুগে উত্তম বংশে প্রেরণ করা হয়েছে।’ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘যদি কেউ উত্তম কিছু অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের অনুসরণ করে যারা ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন (রাসূলের সাহাবীগণদের মধ্যে)। এখন যারা বেঁচে আছেন, তাদের কেউই ফিতনা থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নন (আমরা জানি, রাসূলের সাহাবীরা ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু যারা তখনো জীবিত ছিলেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যুর তাওফিক হবে কিনা, এটার নিশ্চয়তা নেই)। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আল্লাহর শপথ, তারা এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, গভীর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য এবং তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। তাদের মহাত্ম্যকে স্বীকার করে নাও এবং তাদের অনুসরণ কর। এজন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে তোমরা আঁকড়ে ধর। বস্তুত তারা হেদায়েতের সরল পথে ছিলেন।’^৬

প্রত্যেক মুসলমানেরই নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের জীবনী পড়া উচিত। এটা যদি তারা না করে, তাহলে ইসলামের শত্রুরা তাদের জীবনের বিভিন্ন বর্ণনাকে বানানো ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে বিকৃতি করবে যেটা অবিশ্বাসীরা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। ইসলামের শত্রুরা ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে। এজন্য তারা মুসলমানদের মনে সাহাবীদের ব্যাপারে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আর এদিকে বেশিরভাগ মুসলমান ঘুমিয়ে আছে!

^৬ শরহুস-সুন্নাহ, আল-বাগাভী (১/২১৪, ২১৫)।

কাফেরদের এই চেষ্টা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে শুরু হয়েছে। কিছু খ্রীস্টান, ইহুদী এবং রাফিযী গ্রুপের সদস্যরা খুব ভালো করেই বুঝতে পারল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তাদের ভেতরে থেকেই তাদের বেশি ক্ষতি করা সম্ভব। মুসলমানদের নেতা সেজে এ ক্ষতি করা আরও সহজ। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করলেও আসলে ভেতরে ভেতরে অবিশ্বাসকে লালন করত। মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দিয়ে তারা খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করার অপচেষ্টা করল। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে যদিও বাহ্যত মুসলমান বলে দাবী করত, আসলে সে ছিল একজন ইহুদী। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তার অনুসারীদেরকে নিয়ে লোকদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ লাগিয়ে দিত এবং এ পর্যায়ে তাদেরই চক্রান্তে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাৎবরণ করেন। এ ঘটনার পর তাদের কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাদের জঘণ্য সব চক্রান্তের কারণেই জঙ্গ জামাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে যারা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তারাই রাসূলের অনেক সাহাবীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে। এ কাজ করার জন্য তারা ইতিহাসের দুর্বল এবং বানোয়াট তথ্যগুলো বেছে নিয়েছে। এক বর্ণনামতে, তারা রাসূলের এক প্রিয় সাহাবীকে ক্ষমতালোভী হিসেবে প্রচার করেছে। পাশ্চাত্যের ইসলামী পণ্ডিতরা (অরিয়েন্টালিস্ট) এবং তাদের সহযোগীরা পরোক্ষভাবে ইসলামকে আক্রমণ করার জন্য বিভিন্ন ছল-ছাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। তারা খুব ভালো করেই জানে যে, কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করা যাবে না। তবে যারা কাতেবে ওহী ছিলেন অথবা রাসূল থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে তারা নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। সাহাবীরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কুরআন-হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেখান থেকে তৃতীয় প্রজন্ম দীন পেয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহতভাবে চলে

এসেছে। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তারা রাসূলের সাহাবীদের সম্পর্কেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিভিন্ন বানোয়াট কাহিনী প্রচার করেছে। বড় বড় মুসলিম স্কলারদের মতোই অরিয়েন্টালিস্ট এবং তাদের সহযোগিরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের বর্ণনার পাশাপাশি এমনভাবে বানোয়াট তথ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে যাতে পাঠকের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করে।

ইসলামের শত্রুদের মধ্য থেকে তাদের পণ্ডিতরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের জীবন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করেছে। এটা তাদের সত্য জানার অভিপ্রায়ে ছিল না, বরং তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় অথবা তাদের মদদপুষ্ট অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিতে গিয়ে এসব অরিয়েন্টালিস্টদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এজন্য গত কয়েক শতাব্দিতে অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের দুশমন হিসেবে পরিচিত এসব অরিয়েন্টালিস্টদের অতীত রচনাদি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন, যা ইসলামের কোনো উপকারে আসেনি।

ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক কিছু লেখার আগে একটি বিষয় দৃঢ়ভাবে ঠিক করতে হবে। সেটা হলো, সত্য বয়ান। মুসলিম ইতিহাসবিদদের ইসলামের শত্রুদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের অসত্য তথ্যগুলোকে ধরিয়ে দিতে হবে। তাদের অসার দাবীগুলোকে খণ্ডন করতে হবে এবং তাদের দুর্বল ও বানানো হাদীসগুলো চিহ্নিত করতে হবে। সর্বোপরি সঠিক, সর্বজন স্বীকৃত এবং বিশ্বস্ত হাদীসের বর্ণনানুসারে ইতিহাসের কিতাব লিখতে হবে।

যদিও ইতিহাসের স্পষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য রয়েছে, তবু সেগুলো এমন কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদের মাধ্যমেই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা প্রয়োজন যার মধ্যে ইসলামের মূল্যবোধ আছে এবং ইসলামের মহান উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে। আপাতদৃষ্টিতে একজন অমুসলমানকে তুলনামূলক বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও সে তার নিজস্ব মত, পূর্ব নির্ধারিত

দৃষ্টিকোণ এবং ঐশ্বরিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রতি তার জটিল অবিশ্বাস নিয়েই তা লিখবে। সংক্ষেপে তার লেখায় ইহজাগতিক এবং বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই লিখবে। এসব ইতিহাসবিদ সাহাবীগণদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে পাঠকের মনে হয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে কেবলই মারামারিতে লিপ্ত ছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত ছিলেন। অথচ এ ব্যাপারে সত্যনির্ভর কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। এমনকি কিছু মুসলিম ইতিহাসবিদ যারা এই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত, তারাও একই ভুল করছে। ইচ্ছে করে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে, তারা ইসলামের সত্যকে জটিল করে উপস্থাপন করছে এবং সাহাবীদের জীবন সম্পর্কে একটি বিকৃত চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরছে। এ ধরনের বই পড়ে মুসলিম পাঠকের মনে অসম্পূর্ণ ধারণা বেড়ে উঠছে। তারা যা পড়ছে, তাই বিশ্বাস করছে। ইসলাম কেবলই রক্তপাতের ধর্ম, সাহাবীরা কেবলই প্রতারণা এবং লোভ-লালসার মধ্যে ডুবে ছিলেন - তাদের মনে এ ধরনের বিকৃত ধারণা বেড়ে উঠছে।

এজন্য মুসলমানদের এখন এমন নির্ভরযোগ্য কিতাব প্রয়োজন যা কেবল সাহাবীদের তখনকার সত্যিকার জীবন বর্ণনা করবে না, তাদের কাজ-কর্মের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও উপস্থাপন করবে। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে উলামায়ে কেরাম ও ইতিহাসবিদরা এরকম কিতাব লেখা শুরু করেছেন। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ আল্লাহ তার দীনকে অবিকৃত অবস্থায় হেফাজত করবেন। এটা তার ওয়াদা। রাসূলের যুগ থেকেই এ পর্যন্ত সব যুগেই অনেককে আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালাম হেফজ করার তাওফিক দিয়ে যাচ্ছেন। যখন মানুষ হাদীস জাল করা শুরু করেছে, তখনই তিনি এমন সব বিশেষজ্ঞ পঠিয়েছেন যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে দুর্বল এবং জাল বর্ণনা থেকে হাদীসকে, রাসূলের সুন্নাতকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন। যখনই ইসলামের মূল শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা সচেতন ও প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তির মাধ্যমে তা প্রতিহত করেছেন। আর তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সদস্য।

এই গ্রন্থে আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি অনুসরণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমি কেবল বিখ্যাত ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করিনি (যেমন আত-তাবারি, ইবনে কাসীর এবং যাহাবি), বরং কুরআনের তাফসীর ও হাদীস, এমন কিতাব যাতে হাদীস সংগ্রহের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, ফিকহ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী এবং হাদীসের বিজ্ঞানশাস্ত্র নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ কিতাবের সহায়তা নিয়েছি। শেষোক্ত কিতাবগুলোতে ইতিহাসের এমন সব বর্ণনা আছে, যেগুলো ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী রচনা করতে গিয়ে আমি সঙ্গতভাবেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী দিয়ে লেখা শুরু করেছি। কারণ তিনি সব সাহাবীদের সর্দার। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকবে এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মেনে চলবে।’^১ খুলাফায়ের রাশেদীনের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, মহান এবং জ্ঞানী। তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যদি কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম (খলীল এমন একটি সম্পর্ক বোঝায় যাতে সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রকাশ পায়; ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন; রাসূলও তেমন; এজন্য তিনি তার সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বানাননি), তাহলে আবু বকরকে নিতাম। যেহেতু আমি সেটা করব না, এজন্য সে আমার ভাই এবং সাহাবী।’^২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

‘তাদেরকে অনুসরণ কর যারা আমার পরে নেতৃত্ব দিবেন;
আবু বকর এবং উমর।’^৩

^১ সুনান, আবু দাউদ (৪/২০১); সুনান, তিরমিযি (৫/৪৪); এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

^২ সহীহ, বুখারী (৩৬৫৬)

^৩ সহীহ সুনান, আত-তিরমিযি, আল-বানি (৩/২০০)।

ইসলাম গ্রহণ করার দিন থেকে আমৃত্যু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্য সকল সাহাবী থেকে অগ্রগামী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদশায় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সৈনিক; আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরও তিনি একইভাবে ইসলামের উপর দৃঢ় থাকেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম জাতিকে একতাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হন। অন্যান্য সাহাবীরা যেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদলকে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, সেখানে তিনি সঠিক ও দ্ব্যর্থহীনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাকে অনুসরণ করে সেটা অব্যাহত রাখেন। যখন মুসলমানরা যাকাত দিতে অস্বীকার করল এবং ভণ্ড নবীরা পুরো মুসলিম জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন খুবই দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরকম আরও অসংখ্য প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন। আমি সেগুলোকে পরিস্কার এবং ক্রমানুসারে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। তবে আমার মূল চেষ্টা ছিল এটা বর্ণনা করা যে, একজন মুসলমান এবং শাসক হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ কিভাবে একটি শক্তিশালী, দৃঢ় এবং উন্নয়নশীল দেশ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে - যা মদীনা থেকে আরব উপত্যকা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে বিস্তার লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত সময়ের শাসনামলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়েছেন; প্রথমটি ছিল আরবে ভণ্ড নবীদের চক্রান্ত দমন করা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যে জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা; আর দ্বিতীয়টি ছিল ইসলামের দাওয়াতকে বহির্বিশ্বে প্রচার-প্রসার করা এবং যেসব দেশ ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেসব দেশ বিজয় করা।

খেলাফতের সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ইরাক বিজয়। তাছাড়া মুসলিম সৈন্যরা মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং কাকা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। মোটকথা, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় অর্জিত বিজয়ের জন্য পরবর্তী খলীফাদের আমলে এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। আমি এখানে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং এ থেকে উদঘাটন করতে চেয়েছি যে, তাদের এরকম অবিস্মরণীয় সাফল্যের মূল কারণ কি ছিল। বিশেষ করে এসব যুদ্ধ-বিজয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি যেখানে তার সামরিক কৌশল, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, পত্রপ্রেরণ যার মাধ্যমে তিনি সামরিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এসব আলোচনা থেকে পাঠক মাত্রই এ উপলক্ষিতে উপনীত হবেন যে, কেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের সব ক্ষেত্রে সব মুসলমান থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। বিশ্বাস, জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং আচরণ—সব বিবেচনায়ই তিনি ছিলেন প্রথম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে তিনি চরিত্রের অনেক উপরের ধাপে উন্নীত হয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে কুরআনে বর্ণিত শিক্ষার বাস্তব চিত্র ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন, বিশেষ করে তার শাসনামল ছিল রাসূলের জীবনের বাস্তব চিত্র। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন, ‘তাদেরকে অনুসরণ কর, যারা আমার পরে নেতৃত্ব দিবেন; আবু বকর এবং উমর।’

আমি মনে করি না যে, এ গ্রন্থ নির্ভুল। তবে আমি এ কথা বলতে পারি যে, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লেখার ক্ষেত্রে সততার সাথে সচেষ্ট ছিলাম। এ গ্রন্থ লেখার বিনিময়ে আমি পার্থিব কিছুই আশা করি না। কেবল আল্লাহর

অনুগ্রহ এবং তার পুরস্কারই আমার উদ্দেশ্য। আমি কেবল তারই সাহায্য চাই। তিনিই একমাত্র প্রভু যিনি তার বান্দার দু'আ কবুল করেন।

আমি এ কিতাবকে ভূমিকাসহ চারটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করেছি যা নিম্নরূপ :

প্রথম পর্ব : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর মক্কার জীবন
প্রথম পর্বকে আবার পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

- ✓ ১। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা এবং পরিবার;
- ✓ এবং জাহেলী যুগে তার জীবন
- ✓ ২। তার ইসলাম এবং ইসলামের প্রচারে ভূমিকা, ত্যাগ-তিতিক্ষা; এবং তার প্রথম হিজরত
- ✓ ৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায়ে হিজরত
- ✓ ৪। যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা ও অবদান
- ✓ ৫। মদীনায়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন এবং তার কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী

দ্বিতীয় পর্ব : রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল এবং বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক গণজমায়েত

এ পর্বে দু-টি অধ্যায় রয়েছে :

- ✓ ১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল এবং বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে গণজমায়েত
- ✓ ২। জনগণের বাইআত গ্রহণ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ

তৃতীয় পর্ব : উসামার বাহিনী এবং ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর জিহাদ

এ পর্বে তিনটি অধ্যায় রয়েছে :

- ✓ ১। উসামার বাহিনী
- ✓ ২। ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদ
- ✓ ৩। ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ

✓ ৪। মুসাইলামাতুল কাযযাব এবং বনু হানীফাহ

✓ ৫। শিক্ষা ও উপদেশ

চতুর্থ পর্ব : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর বিজয় এবং পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রা.-কে মনোনয়ন

এ পর্বে চারটি অধ্যায় রয়েছে :

✓ ১। ইরাক বিজয়

✓ ২। আশ-শাম বিজয় (সিরিয়া এবং নিকটবর্তী এলাকাসমূহ)

✓ ৩। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিভিন্ন দেশ বিজয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ

✓ ৪। পরবর্তী মুসলমানদের খলীফা হিসেবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনয়ন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল

আমি কিতাবটি ৫ মহররম ১৪২২ হি. (৩০ মার্চ ২০০১) তারিখ শুক্রবার রাতে এশার পর লেখা শেষ করি। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি আল্লাহ আমার এ কাজকে কবুল করুন, আমাদেরকে রাসূলের প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম, সত্যবাদীগণ, শহীদ এবং নেককারদের সাথে মিলিত করুন। আল্লাহ বলেন,

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।^{১০}

আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা যিনি একাই আমাকে সাহায্য করেছেন এবং অনুগ্রহ করে এ মহান কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন। আমি আল্লাহ তা'আলার সব উত্তম নাম এবং তার সব মহান গুণাবলীর উসিলা করে দু'আ করছি তিনি যেন আমার এ কাজকে কেবলমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন, তার বান্দাদের উপকারের পাথেয়

^{১০} সূরা আল-ফাতির, ৩৫:২।

বানিয়ে দেন, আমার কিতাবের প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে উত্তম বদলা নসীব করুন, আমার এই কাজকে আমলে সলীহা বানিয়ে দেন এবং যারা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে কবুল করুন। আমি প্রতিটি মুসলমানের কাছে অনুরোধ করছি যারা এই কিতাবটি পড়বেন, তারা যেন তাদের দু‘আয় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন যে কিনা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির ভিখারী।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।^{১১}

এ আয়াত বেশি বেশি পড়বেন। আল্লাহ তা‘আলা তাওফিক দিন।

কতই না পরিপূর্ণ তুমি, হে আল্লাহ, সব প্রশংসা কেবল তোমার জন্য। আমি স্বাক্ষর দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। আমি আপনার ক্ষমা চাই এবং সব গোনাহ থেকে তোমার কাছে তওবা করছি।

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘তাদের শেষ কথা হবে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা কেবলাত্র আল্লাহর জন্য)।’^{১২}

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির ভিখারী
আলী ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী

৫/১/১৪২২ হি.

^{১১} সূরা আল-নমল, ২৭:১৯।

^{১২} সূরা ইউনুস, ১০:১০।



মস্কা মুকাররমায়
আবু বকর রা.-এর জীবন



প্রথম অধ্যায়

**তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা
পরিবার; এবং জাহেলী যুগে তার জীবন**

এক। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ এবং উপাধি

যাদের মাতৃভাষা আরবী নয় এবং যারা আরবদের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কেও বেশি পরিচিত নন, তাদের অনেকেই জেনে অবাক হবেন যে, এই কিতাবের মূল আলোচ্য মহান ব্যক্তির প্রকৃত নাম ‘আবু বকর’ ছিল না। তার নাম ছিল ‘আব্দুল্লাহ’। আবু বকর তার কুনিয়াহ (উপনাম)। ‘কুনিয়াহ’ এমন একটি শিরোনাম যা দিয়ে ব্যক্তির ছেলে অথবা মেয়ের নাম জানা যায়। অথবা এর দ্বারা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত বিশেষ কোনো স্থান, ধারণা, মত বা তার জাতিগত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে কুনিয়াহ লেখা হয়, ‘আবু অমুক এবং অমুক’ অথবা অমুক অমুকের পিতা (কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বলা হয়, ‘উম্মে অমুক এবং অমুক’ অথবা ‘অমুক অমুকের মাতা’)। আক্ষরিক অর্থে কুনিয়াহ কোনো ব্যক্তিকে তার সন্তানের নামের সাথে সম্পর্কিত করে। এভাবে কোনো ব্যক্তির নাম যদি আবু আব্দুল্লাহ হয়, তাহলে সবাই নিশ্চিতভাবে এটা মনে করবে যে, এ ব্যক্তির একজন ছেলে আছে, যার নাম আব্দুল্লাহ। তবে এটা সবসময় সত্য নাও হতে পারে। কুনিয়াহ অনেক ক্ষেত্রে নামের অলঙ্কার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আবু হুরাইরা। হুরাইরা মানে ছোট বিড়াল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীর সাথে সারাক্ষণ

একটি ছোট বিড়াল থাকত, এজন্য তাকে নাম দেওয়া হয়েছে আবু হুরাইরা।

‘আবু বকর’-এর ক্ষেত্রে ‘বকর’ মানে বাচ্চা উট। আবার এটা আরবদের একটি বিরাট উপজাতির পরিচয়ও তুলে ধরে। এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুরো নাম এবং বংশানুক্রম দেওয়া হলো (উল্লেখ্য, ‘ইবনে’ মানে ‘ছেলে’) :

আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে ‘আমির ইবনে ‘আমর ইবনে কা’ব ইবনে সা’দ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব আল-কুরাইশি আত-তাইমী।^{১৩}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশানুক্রমের সব শেষে লেখা হয়, আল কুরাইশি এবং আত-তাইমী। এটা থেকে তিনি যে কুরাইশি এবং আত-তাইম শাখার বংশদ্ভূত ছিলেন, তা বোঝা যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার আদি পিতা মুররাহ ইবনে কাবের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিলেছেন।

আরবে যদি কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু একাধিক নামে পরিচিত হন, তাহলে ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব বোঝা যায়। এজন্য বিচার দিবস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক নাম পাওয়া যায়। এ কারণেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জীবদ্দশায়ই অনেক নাম এবং উপাধি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নামই তার মহৎ চরিত্রের এক অথবা একাধিক খুব উঁচু স্তরের গুণ প্রকাশ করে। সেসব নাম ও উপাধিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

এক। আল-আতীক

আরবী ভাষায় আল-আতীক শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হতে পারে বৃদ্ধ অথবা প্রাচীন, অতি সম্মানিত অথবা এমন

^{১৩} আল-ইসাবাহ, ইবনে হাজার (৪/১৪৪, ১৪৫)।

একজন যে দাসত্ব অথবা অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম দেওয়া হয়েছে আল-আতীক। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাকে বলেছেন, ‘তুমি আতীক (মুক্ত)। কারণ তোমাকে আল্লাহ তা’আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’^{১৪} মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, ‘তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর মুক্ত করা বান্দা।’^{১৫}

অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অথবা চরিত্রের মহানুভবতার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম দেওয়া হয়েছে আতীক।^{১৬} আবার অনেকের মতে, যেহেতু তিনি জীবনের একটি দীর্ঘ সময় তার উন্নত চরিত্রের জন্য সুপরিচিত ছিলেন, এজন্য তার জীবনের শেষ দিকে এ নাম দেওয়া হয়েছে (এটা ‘আতীক’ শব্দের ‘বৃদ্ধ’ অথবা ‘প্রাচীন’ অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট)।^{১৭} এটাও বলা হয় যে, যখনই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের কোনো সন্তান হতো, সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক, মারা যেত। কিন্তু যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটল। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মা তার সম্পর্কে দু’আ করলেন, হে আল্লাহ! এই শিশু (অন্যান্য শিশুদের মতো তাড়াতাড়ি) মৃত্যু থেকে অব্যহতি পেয়েছে। তার মাধ্যমে আমাকে কল্যাণ দিন।^{১৮}

এটা সম্ভব যে, উপরে বর্ণিত একাধিক কারণেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ‘আতীক’ নাম দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সমর্থনও রয়েছে। তিনি তার মহানুভব চরিত্রের জন্য অনেক

^{১৪} আল-ইহসান ফী তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (১৫/২৮০) এবং বর্ণনার সূত্র সহীহ।

^{১৫} সুনান, তিরমিযি (আল-মানাকিব), ৩৬৭৯ এবং আল-আলবানী।

^{১৬} আল-মুআযাম আল-কাবীর, আত-তাওয়ারী (১/৫২)।

^{১৭} আল-ইসাবাহ (১/১৪৬)।

^{১৮} আল-কুনা ওয়াল-আসমা, আদ-দূলাবী (১/৬); খুতুব আবু বকর, মুহাম্মাদ আহমাদ আশুর জামাল আল-কুমী, পৃ. ১১।

বছর ধরেই সুপরিচিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর আতীক বান্দা যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।”^{১৯}

দুই। আস-সিদ্বীক

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে বেশি পরিচিত উপাধি হচ্ছে ‘আস-সিদ্বীক’। ‘সিদ্বীক’ শব্দটি এসেছে ‘সিদক’ থেকে। ‘সিদক’ মানে সত্যবাদিতা। ‘আস-সিদ্বীক’ শব্দটি এ অর্থের প্রগাঢ়ভাব নির্দেশ করে : এমন একজন ব্যক্তি যিনি সর্বক্ষণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যিনি সর্বক্ষণ কোনো কিছু বা ব্যক্তির সত্যতার উপর নিগূঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস)। অন্য কেউ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ‘আস-সিদ্বীক’ উপাধিটি দিয়েছেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একবার আবু বকর, উমর এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তারা যখন উহুদ পাহাড়ে উঠলেন, তখন পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করল। তখন পাহাড়কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে উহুদ! স্থির হও। তোমার উপরে একজন রাসূল, একজন সিদ্দীক এবং দু-জন শহীদ (উমর এবং উসমান) আছেন।’^{২০}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দৃঢ় এবং অবিচল বিশ্বাসের জন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ‘আস-সিদ্বীক’ উপাধি লাভ করেছেন। মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে জেরুযালেমে মসজিদ আল-আকসায় গিয়েছিলেন। মক্কার অবিশ্বাসীরা এ বিষয়ে কানা-ঘুষা করেছিল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে এক রাতে মক্কা থেকে জেরুযালেমে

^{১৯} তারীখ আদ-দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম ফী আহম আল-খুলাফা আর-রাশিদীন, ড. ইয়াসরি মুহাম্মাদ হানী, পৃ. ৩৬।

^{২০} সহীহ, বুখারী (৫/১১)

যাওয়া এবং ফিরে আসার সামর্থ্য ও বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ করছে)।
 ঐদিন কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেল যারা পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী ছিল এবং ঈমান এনেছিল।
 কিছু সংখ্যক লোক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেল।
 তারা তাকে বলল, ‘তুমি কি তোমার সাথীর খবর রাখ? তিনি যে
 দাবী করেন, তিনি গত রাতে জেরুযালেমে গিয়েছিলেন।’ আবু
 বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তিনি কি সত্যিই এটা বলেছেন?’
 তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তিনি
 যদি বলে থাকেন, তাহলে সত্য বলেছেন।’ তারা বলল, ‘তুমি কি
 তাকে বিশ্বাস করবে যে বলে যে সে এক রাতে জেরুযালেম গিয়েছে
 আবার সকাল হওয়ার আগেই ফিরে এসেছে?’ আবু বকর বললেন,
 ‘হ্যাঁ। আমি এর চেয়ে আরও বিশ্বাস্যকর বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করি।
 আমি বিশ্বাস করি তার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসে
 সকালে-বিকেল।’ এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
 আনহুর নাম হয়ে যায় আস-সিদ্দীক।”^{২১}

তিন। আস-সাহিব

আক্ষরিক অর্থে আস-সাহিব মানে সঙ্গী। এটা এমন একটি উপাধি
 যেটা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে আবু বকর
 রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছেন। মদীনায হিজরতের সময় তিনি
 যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গুহায়
 ছিলেন, এজন্য আল্লাহ তা’আলা তাকে এ নাম দিয়েছেন। আল্লাহ
 তা’আলা বলেন,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
 إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দু-জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সাকিনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত, আল্লাহ কাফেরদের কথাকে হেয় করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{২২}

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে তার সঙ্গী বলতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই বুঝানো হয়েছে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছেন, ‘যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় ছিলেন (আমার সাথে), তখন আমি তাকে বললাম, যদি শত্রুদের কেউ নিচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে তার পায়ের নিচে দেখে ফেলবে।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর! ঐ দু-জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা (নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যাপারে), যখন তাদের তৃতীয় জন আল্লাহ?’^{২৩}

চার। আল-আতকা

আল-আতকা মানে অধিক ধার্মিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ। কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে আল-আতকা শব্দটি মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

^{২২} সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৪০।

^{২৩} সহীহ, বুখারী শরীফ (৩৬৫৩)।

এবং এ (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীর
ব্যক্তিকে।^{২৪}

এ আয়াতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল-আতকা হিসেবে
উল্লেখ করা হয়েছে যা সামনে আরও বিশ্লেষণ করা হবে। ঐসব
মুসলমানদের আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হবে যাদেরকে কাফেররা
মারাত্মকভাবে কষ্ট দিত এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাল
খরচ করে তাদেরকে ক্রয় করে আযাদ করেছিলেন।

পাঁচ। আল-আউওয়াহ

আল-আউওয়াহ শব্দটির কমপক্ষে দুটো সম্ভাব্য অর্থ আছে। একটি
অর্থ হতে পারে, এমন একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর ইবাদতে খুব
বেশি নিমগ্ন। অন্য অর্থ, এমন একজন যে খুব নরম প্রকৃতির এবং
দয়ালু। ইবরাহীম আন-নাখাই বলেছেন, মানুষের প্রতি দরদ এবং
অনুগ্রহের কারণে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল-আউওয়াহ।^{২৫}

দুই। তার জন্ম এবং দৈহিক গঠন

বিদ্বান্ব আলেমগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি হস্তীবাহিনীর
ঘটনার বছরের পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে বছর আবরাহা তার
বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সে বছরকে হস্তীবাহিনীর
ঘটনার বছর বলা হয়। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বয়সে ছোট
ছিলেন। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত না থাকলেও উলামায়ে কেরাম তার
সঠিক জন্ম তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ
কেউ মনে করেন যে, তিনি হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর থেকে তিন
বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ মনে করেন যে, তিনি

^{২৪} সূরা আল-লাইল, ৯২:১৭।

^{২৫} আত-তাবাকাত আল-খুবরা (৩/১৭১)।

হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর থেকে দুই বছর ছয় মাস পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কেউ মনে করেন যে, তিনি হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর থেকে দুই বছর কয়েক মাস পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। অতি সম্ভ্রান্ত পিতা-মাতার ঘরে তার জন্ম হয়েছে। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি মানুষের কাছে গৌরব এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৈহিক গঠন হালকা-পাতলা ছিল। তার দেহের রং ছিল ফর্সা সুন্দর। এ প্রসঙ্গে কাইস ইবনে আবী হাযিম বলেন, ‘আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে গেলাম। আর তিনি ছিলেন হালকা গড়নের, ক্ষীণ-অল্প মাংসল, ফর্সা।’ অনেক ইতিহাসবিদদের মতে, তার দেহের ফর্সা সাদা রংয়ের সাথে হলুদাভ আভা ছিল। তার দাড়ি বেশি বড় ছিল না এবং সামান্য কুঁজো ছিলেন। তার হালকা-পাতলা দৈহিক গঠনের জন্য পায়জামা নিচের দিকে নেমে যেত এবং কোনোমতে কোমরের শেষাংশে আটকে থাকত। তার চেহারা ছিল শীর্ণকায় এবং তার ললাটদেশ প্রশস্ত ও খুব উঁচু ছিল। তার চোখ দুটো ঈষত কোটরাগত ছিল। তার পেটে কোনো চর্বি ছিল না। পা দুটো সরু হলেও শক্তিশালী ছিল। তিনি তার দাড়ি ও সাদা চুলে মেহদী ও কাতাম দ্বারা খেঁযাব করতেন।^{২৬}

তিন। তার পরিবার

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতার নাম উসমান ইবনে আমির ইবনে আমর। তার উপনাম আবু কুহাফাহ। এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। আবু কুহাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেন। এ সময় তিনি ছিলেন খুব বৃদ্ধ ও দুর্বল। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর,

^{২৬} সহীহ, বুখারী (৫৮৯৫); সহীহ, মুসলিম শরীফ (২৩৪১); আবু বকর আস-সিদ্দীক, মাযদি আস-সাদিদ, পৃ. ৩২।

তোমার পিতাকে রেখে আসলেই পারতে, তাহলে আমি তাকে দেখতে যেতে পারতাম।' তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কাছে আসাও তার জন্য একটি বড় দায়িত্ব।' এ কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়স্কদের কি পরিমাণ সম্মান করতেন! এটা তার একটি বড় সুন্নাত। আরেক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' আবু কুহাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার অঙ্গিকার করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতার ইসলাম গ্রহণকে স্বাগত জানান এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন যে, এ ঘটনার স্বাক্ষী হিসেবে তোমার পিতার চুলের রং পরিবর্তন করে দাও।' ঐসময় আবু কুহাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চুলের রং ছিল থাগমাহ গাছের মতো (এটা এমন একটি সাদা রংয়ের গাছ যার সাথে আরবরা তখন বয়স্কদের সাদা চুলের তুলনা করত)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের নাম ছিল সালমাহ বিনতে সাখর ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম। তার কুনিয়াহ ছিল উম্মুল খাইর। তিনি ইসলামের শুরুর দিকেই মুসলমান হন। এ বিষয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আরও বিষদ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। জীবনের বিভিন্ন সময় তার মোট চারজন স্ত্রী ছিল। তার সন্তানের সংখ্যা মোট ছয় জন; তিনজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে। নিচে তার স্ত্রীদের বিবরণ দেওয়া হলো।

১। কুতাইলা বিনতে আব্দুল-উজ্জাহ ইবনে আসা'দ ইবনে যাবির ইবনে মালিক

কুতাইলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এ বিরোধের মূল কারণ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

আনহু ইসলামের পূর্ব যুগেই তাকে তালাক দিয়েছিলেন। কুতাইলা দু-সন্তানের জননী ছিলেন; আব্দুল্লাহ এবং আসমা। কাতিলা মদীনায় হিজরত করেননি। কিন্তু তিনি তার মেয়ে আসমাকে দেখার জন্য মদীনায় গিয়েছিলেন। মেয়ের জন্য কিছু হাদীয়া নিয়েছিলেন। তাতে ছিল পনির ও ঘি। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এসব হাদীয়া গ্রহণ করেননি এবং তাকে ঘরে প্রবেশেরও অনুমতি দেননি। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা পুরো বিষয়টা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। একদিকে তিনি মুসলমান। আর তার মা ঈমান আনেননি। অন্যদিকে তিনি তার আপন মা, যার গর্ভে তিনি জন্মেছেন। তাকে পরম যত্নে ও ভালোবাসায় লালন-পালন করেছেন। এটা হয়তো ঠিক যে, কাফের হওয়ার জন্য কুতাইলা আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নন। কিন্তু মা হিসেবে তা অবশ্যই পেতে পারেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এ জটিল পরিস্থিতিতে আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিষয়টির সমাধান জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ‘সে (আসমা) অবশ্যই তার মাকে ঘরে প্রবেশ করতে দিবে এবং তার আনা সব উপটৌকনও গ্রহণ করবে।’ এ ঘটনার পরেই আল্লাহ কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল করলেন,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচারণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।^{২৭}

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরীকার বলে দিয়েছেন যে, ঐসব অবিশ্বাসী যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, আল্লাহ তাদের সাথে মুসলমানদেরকে ভালো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন না। বরং মুসলমানদেরকে তাদের সাথে সদাচারণ করতে বলা হয়েছে। বস্তুত 'আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

২। উম্মে রুমান ইবনে আমির ইবনে উওয়াইমার

উম্মে রুমান রাযিয়াল্লাহু আনহা বনু কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ গোত্রের মহিলা ছিলেন। তার প্রথম স্বামী আল-হারিস ইবনে সাখবারাহ মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তারপর তাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করেন। তিনি মক্কায় প্রথম দিকে মুসলমান হন। পরবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি দু-সন্তানের জননী ছিলেন; আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। অত্যন্ত বরকতময় জীবন-যাপন করে উম্মে রুমান রাযিয়াল্লাহু আনহা ছয় হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

৩। আসমা বিনতে উমাইস ইবনে মা'বাদ ইবনে আল-হারিস

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার কুনিয়াহ ছিল উম্মে আব্দুল্লাহ। এ কুনিয়াহ সম্ভবত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার এক সন্তানের দিকেই সম্বন্ধ করে। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর জন্য প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন মুসলমান যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকেই ইসলাম কবুল করেন। এমনকি সাহাবীরা যখন দারে আরকামে একত্রিত হতেন, তারও আগে তিনি মুসলমান হন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এজন্য মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার এক পর্যায়ে তিনি এবং তার স্বামী জাফর বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে অনেকগুলো

বছর তারা সেখানে অবস্থান করেন। তারপর খায়বর যুদ্ধে বিজয়ের আগে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসতে বলেন। এজন্য তারা দ্বিতীয়বার হিজরত করেন। সেই হিজরত ছিল আবিসিনিয়া থেকে মদীনায। মদীনায আসার কিছুদিন পরেই জাফর বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর লড়াইতে শহীদ হন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে বিয়ে করেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন পুত্র সন্তানের মা হন। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি রাসূলের কথাগুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন। যারা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উম্মুল ফযল (আল-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী) অন্যতম। তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শশুরালয়ের দিক থেকে অনেক সম্মানী ছিলেন। কারণ তার শশুরালয়ের আত্মীয়দের মধ্যে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় ব্যক্তিবর্গ।

৪। হাবীবাহ বিনতে খারিযাহ ইবনে যায়িদ রা.

হাবীবাহ বিনতে খারিযাহ ইবনে যায়িদ ইবনে আবু যুহায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহা আনসার গোত্রীয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে তিনি খায়রায গোত্রের একজন সদস্যা ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের কিছু দিন পরেই তার গর্ভে একজন কন্যা জন্মগ্রহণ করে; উম্মে কুলসুম। আস-সুনহ এলাকায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। আস-সুনহ মদীনার একটি মহল্লা। এখানে খায়রায গোত্রের একটি শাখা বনু আল-হারিস এর বসবাস ছিল।

১। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দেখেন, তাহলে তার মক্কার জীবনে এমন অনেক পরিবারের সন্ধান পাবেন যেখানে ছেলে ইসলাম কবুল করেছে অথচ তার পিতা তখনো কাফের। এরকম খুব কমই পাওয়া যাবে যে, পিতা ইসলামে প্রবেশ করেছে অথচ তার ছেলে-মেয়ে ইসলাম কবুল করেনি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর দ্বিতীয় দলের ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বয়স্কদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। অথচ আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন ইসলাম কবুল করেননি। কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে যখন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বড় ছেলে আব্দুর রহমান হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবুল করেন। তারপর থেকেই তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলমান। সারাক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছাকাছি থাকার জন্য মরিয়া হয়ে থাকতেন। তার অনেক কীর্তির মধ্যে তিনি যুদ্ধের ময়দানে সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।^{২৮}

২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায হিজরতের সময় গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{২৮} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩৪৬)।

ওয়া সাল্লাম হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর থেকে কুরাইশরা তাকে ধরার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কার কুরাইশদের কাছ থেকে দিনের বেলা এসব পরিকল্পনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন গুহায় লুকিয়ে ছিলেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতে সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গিয়ে এসব তথ্য তাদের কাছে সরবরাহ করতেন। আত-তায়েফ অবরোধকালে তিনি শত্রুর তীরের আঘাতে আহত হন এবং এরপর তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় শহীদ হিসেবে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.

আসমা বিনতে উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহুর গর্ভের সন্তান মুহাম্মাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজের বছর জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ গোত্রের একজন সম্মানিত শিশু হিসেবে তিনি আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে লালিত-পালিত হন। পরবর্তী কালে তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। মিশরে থাকাকালীন তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।^{২৯}

৪। আসমা বিনতে আবু বকর রা.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বড় বোন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইতিহাসে ‘দুই ফিতাওয়ালী’ হিসেবে বেশি পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই নাম দিয়েছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিতার জন্য খাবারের একটি সুফরা তৈরি

^{২৯} নসব কুরাইশ, পৃ. ২৭৭; আল-ইসতিআব (৩/১৩৬৬)।

করেছিলেন। কিন্তু তা বাধার কোনো দড়ি ছিল না। এজন্য তিনি তার কোমরবন্ধকে দু-টুকরা করে সুফরা বেঁধেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম দেন, ‘দুই ফিতাওয়ালী’। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত সাহাবী আয-যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। তিনি যখন মদীনায হিজরত করেন, তখন অন্তঃসত্তা ছিলেন। তার গর্ভে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়ের। মদীনায পৌঁছেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এটা ইতিহাসে খুব বিখ্যাত একটি ঘটনা। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মদীনায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর জন্মগ্রহণ করা প্রথম মুসলমান সন্তান।

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বরকতময় দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তার বয়স একশ হয়েছিল। তখনো তার দাঁত ছিল এবং তার জ্ঞানে কোনো ক্রটি পরিলক্ষিত হয়নি। বেশিরভাগ বৃদ্ধদের শেষ বয়সে তেমন কিছু করার থাকে না। অথচ আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট খেদমত করে গেছেন। যে কেউ তার কাছে যেত, তার কাছে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি ৫৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার দু-ছেলে, আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু, উরওয়াহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহসহ আরও অনেকে তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কেবল ইলম দিয়ে মুসলিম জাতির খেদমত করেননি, সম্পদ দিয়েও সহায়তা করেছেন। তার সম্পদের বিরাট অংশ তিনি নিয়মিত গরিব ও অসহায়দের দান করতেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে মক্কায ইন্তেকাল করেন।

৫। আয়েশা রা.— মুসলমানদের মা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপাধি ছিল ‘সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদী’। ছয় বছর বয়সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে তার বিয়ে হয় এবং নয় বছর বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে যান। তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উম্মে আব্দুল্লাহ নামে উপনাম প্রদান করেন। তার কোনো সন্তান ছিল না। এজন্য পাঠকমাত্রই এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, কেন তার উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ (আব্দুল্লাহর মা) দেওয়া হলো? উপনাম নেওয়াটা আরবদের মধ্যে একটি সাধারণ রীতি ছিল। কোনো সন্তান না হলেও উপনাম নেওয়া হতো। আরব ইতিহাসে এরকম অনেকেই ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় অনেক বিজ্ঞ পুরুষ সাহাবীদের চেয়ে তিনি অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাসূলের অনেক কাছাকাছি ছিলেন আবু হুরাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়াদির ব্যাপারে তার জানার সুযোগ ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের কাছ থেকে জেনেই তিনি বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুরোপুরি এ বিষয়ে কাছ থেকে দেখা ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। এজন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াদির ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি অন্যান্য স্ত্রীগণের চেয়েও অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি বয়সে কম, বুদ্ধিমতি এবং আশ্চর্যজনক তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিনী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি তার জীবনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে প্রচার-প্রসারের কাজে নিজে উৎসর্গ করেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে যখনই বিখ্যাত তাবীঈ মাসরুফ কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, ‘সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা, যার নির্দোষ হওয়াকে আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং নিশ্চিত করেছেন (ওহীর

মাধ্যমে) এবং আল্লাহর হাবীবের হাবীবা, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে...' - এবং তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে মোট ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয়টিতে মোট ১৭৪টি হাদীস রয়েছে। এককভাবে বুখারী শরীফে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে ৫৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে এরকম আরও ৬৯টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো তিনিও তেঁষটি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি জীবনে কোনো সন্তান প্রসব করেননি। তিনি ৫৭ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।^{৩০}

৬। উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা.

তার মা ছিলেন হাবীবাহ বিনতে খারিযাহ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের কিছু দিন পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুসজ্জায়, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দুই ভাই এবং এক বোন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জীবিত ছিলেন। এজন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন, 'তোমার দুই বোন এবং দুই ভাই', তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুবই আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আসমাকে তো জানি। আমার আরেক বোন কে?' তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'সে হাবীবাহ বিনতে খারিযাহের গর্ভে। আমার মনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে সে তোমার বোন।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ধারণা তার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয়। হাবীবাহ বিনতে খারিযাহ একজন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় উম্মে কুলসুম।^{৩১}

^{৩০} তাবাকাত ইবনে সা'দ (৮/৫৮)।

^{৩১} তাবাকাত (৩/১৯৫)।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি জঙ্গ-জামাল যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। স্বামী মারা যাবার পর ইদতকালীন সময়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে হজ সম্পন্ন করেন।

উপরে বর্ণিত সবাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরকতময় পরিবারের সদস্য ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তার পরিবার এমন এক গৌরবময় পরিবার যেখানে চার জেনারেশনের সন্তানাদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার মা আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পিতা আবু কুহাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু—এরা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। অন্য দিক থেকেও এই চার জেনারেশনে সাহাবী রয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার পিতা আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার পিতা আবু বকর এবং তার পিতা আবু কুহাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সবাই একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউই মুনাফিকের দলভুক্ত ছিলেন না। সাহাবীদের যুগে এ কথা খুব প্রসিদ্ধ ছিল যে, ‘ঈমান আর মুনাফেকির ঘর আছে। মুহাজিরীনদের মধ্যে ঈমানের একটি ঘর ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘর। আর আনসারদের মধ্যে ঈমানের কয়েকটি ঘর ছিল বুন আন-নাযযার গোত্রে।’^{৩২}

^{৩২} আবু বকর আস-সিদ্দীক (১/২৮০); মুহাম্মাদ মাআদুল্লাহ (ইবনে তাইমিয়া রচিত মিনহাজ আস-সুন্নাহ কিতাবের সারাংশ)

চার। জাহেলী যুগে তার জীবন

আমরা ইতিমধ্যে এ আলোচনা করেছি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশ বংশের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এ বংশের অন্যান্য সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা অনেক উপরে ছিল। মহান ব্যক্তিত্বের কারণে যেমন কাউকে কাবা শরীফের চাবি দেওয়া হতো যা খুবই উঁচু মর্যাদার ব্যাপার, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন ছিলেন। কুরাইশ গোত্রের মর্যাদাপূর্ণ দশটি দায়িত্ব দশটি শাখার দশ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। তারা হলেন,

১। খালেদ ইবনে আল ওয়ালিদ, বুন মাখযুম গোত্রের। যুদ্ধের কিছু বিষয় তার দায়িত্বে ছিল।

২। আল-আক্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, বনু হাশিম গোত্রের। তার হাতে হজ মৌসুমে সবাইকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পরেও তার এই দায়িত্ব বহাল ছিল।

৩। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, বনু উমাইয়া গোত্রের। কুরাইশ বংশের যুদ্ধের পতাকা তার হাতে ছিল। কুরাইশ বংশের কোনো সর্বাধিনায়ক ছিল না। এটা বলা যায় যে, জরুরী পরিস্থিতিতে যখন তারা কোনো বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারত না, তখন তারা বিষয়টা নিয়ে আবু সুফিয়ানের দ্বারস্থ হতো। তিনি তখন তাদের নেতৃত্ব দিতেন।

৪। আল-হারিস ইবনে আমির, বনু নাওফিল গোত্রের। তিনি কুরাইশদের কাছ থেকে দান হিসেবে সংগৃহীত টাকা-পয়সা গরিব হাজী ও মুসাফিরদের মধ্যে বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

যেসব হাজীদের ফেরার সামর্থ্য থাকত না, তাদেরকেও এই ফান্ড থেকে সহায়তা করা হতো।

৫। উসমান ইবনে তালহা ইবনে যামআহ ইবনে আল-আসওয়াদ, বনু আসাদ গোত্রের। তিনি কুরাইশদের গভর্ণিং কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তার সাথে পরামর্শ করতেন।

৬। আবু বকর আস-সিদ্দীক, বনু তাইম গোত্রের। ঋণ এবং দিয়াত (রক্তপণ) সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি দায়িত্বে ছিলেন। যদি তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে অথবা কুরাইশদের পক্ষ থেকে কাউকে ঋণ এবং রক্তপণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন অন্যান্য কুরাইশ সদস্যরা তাকে সহায়তা করত। যদি অন্য কেউ এ বিষয়ে ঘোষণা দিত, তবে কেউ তাকে সাহায্য করত না।

৭। উমর ইবনে আল-খাতাব, বনু আদি গোত্রের। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে তিনি কুরাইশদের প্রধান দূত হিসেবে কাজ করতেন।

৮। সাফওয়ার ইবনে উমাইয়াহ, বনু যুমাহ গোত্রের। আল-আযলাম সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল-আযলাম একটি প্রথা যেখানে কেউ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে লটারি করত। লটারিতে তিনটি কাগজ থাকত। যেখানে একটিতে লেখা থাকত 'কর', আরেকটিতে 'কর না' এবং আরেকটিতে কিছুই লেখা থাকত না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন হয়তো কোথাও সফরে যাবেন। এজন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তখন তিনি আল-আযলামের সাহায্যে লটারি করে সিদ্ধান্ত নিবেন সফরে যাবেন কি যাবেন না।

৯। আল-হারিস ইবনে কায়িস, বনু সাহ্ম গোত্রের। তিনি মক্কার গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতেন। মুশরিকরা তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে টাকা-পয়সা ও সম্পদ দান করত, এসব তার দায়িত্বে ছিল।

ইসলাম পূর্ব যুগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু গুণ এবং দায়িত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এসবের কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তার পারদর্শীতা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সময়ে আরবদের মধ্যে বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু কুরাইশ বংশের ইতিহাস সম্পর্কেই জানতেন তা নয়, বরং তিনি বিভিন্ন আরব বংশ ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞান রাখতেন। এ বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তার অনেক ছাত্র পরবর্তী সময়ে নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (যেমন আকীল ইবনে আবী তালিব এবং আরও অনেকে)। ইসলাম আবির্ভাবের পর তার এই আরবের বিভিন্ন বংশের উদ্ভব ও বিকাশের ক্রমধারা সম্পর্কিত জ্ঞান অনেক কাজে লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনায হিজরতের আগে সেখানে বিভিন্ন গোত্রের অবস্থান ও তাদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রসঙ্গে গোত্র-প্রধানদের সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেন।

জাহেলী যুগেও উত্তম চরিত্র এবং উন্নত স্বভাবের মতো মহৎ গুণাবলী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সমাজে একজন ব্যবসায়ী এবং এমনকি একজন বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এ বিষয়ে সমসাময়িক অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বংশের ক্রমবিকাশ বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিবারের মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো এরকম করেননি। ভালো-মন্দ দুটোই জানা সত্ত্বেও বংশের ধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি মন্দ বিষয়ের উল্লেখ না করে কেবল ভালোটাই বলতেন। ইসলাম আবির্ভাবের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের মধ্যে বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি কুরাইশের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন এবং তাদের ভালো-

মন্দ উভয়টাই জানতেন।এ সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অবশ্যই কুরাইশ বংশের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে আবু বকর সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।’^{৩৩}

২। তার ব্যবসা

ইসলাম-পূর্ব যুগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ব্যবসায়িক কাজে শাম দেশের বুসরা (সিরিয়া ও আশেপাশের এলাকা) এবং অন্যান্য শহরে যেতেন। তার ব্যবসার মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে তিনি ধনী ছিলেন এবং তখনো গরিব ও অসহায়দের নিঃস্বার্থভাবে দান করতেন। যদিও তিনি কুরাইশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন না, তবুও তিনি ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও উদারতার জন্য সবার কাছেই খুব সম্মানিত ছিলেন। তার এই সুনামের কারণে ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বেশি হতো এবং তাকে লাভের পেছনে ছুটতে হতো না। যদি কারও ব্যবসায় প্রতারণার ভয় হতো, তখন তারা তাদের মূলধন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হস্তান্তর করত। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে কোনো ধরনের ছল-ছাতুরী তো করবেনই না, বরং তাদের সাথে স্বচ্ছ ও সততার আচরণ করবেন।

৩। গোত্রের লোকদের ভালোবাসা ও চিন্তাকর্ষণের কেন্দ্র

কুরাইশ বংশের অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে কুরাইশী সমাজে তারা নিশ্চিতভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু এটা নিশ্চিত ছিল না যে কুরাইশ বংশের অন্যান্য সদস্যদের কাছে একইভাবে তিনি সম্মান ও ভালোবাসা পাবেন। কারণ সম্মান ও ভালোবাসা অর্জন করতে হয়।

^{৩৩} সহীহ, মুসলিম (২৪৯০); তাবারানি, আল-কাবির (৩৫৮২)।

এটা বিবেচনায় রেখে জেনে অবাক হবেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুরাইশ বংশের সকল সম্ভ্রান্ত, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞ, গরিব এবং দুর্বল সদস্যরা সার্বজনীনভাবে ভালোবাসত। তার প্রতি সকলের এই ভালোবাসার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে ভালোবাসত কারণ তিনি কুরাইশ বংশের একজন সত্যিকার আদর্শ ব্যক্তির যাবতীয় সৎ চরিত্রের বাস্তব নমুনা ছিলেন; ব্যবসায়ীরা তাকে ভালোবাসত তার ব্যবসায়িক সততা এবং বিশ্বস্ততার জন্য; বিজ্ঞরা তাকে ভালোবাসত কারণ তিনি ছিলেন সমসাময়িক আরবদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী; গরিব-দুঃখীরা তাকে ভালোবাসত তার দানশীলতা ও উদারতার জন্য। উপরে বর্ণিত সবাই তাকে ভালোবাসত তার উদার আতিথেয়তার জন্য। তিনি প্রায়ই অনেককে তার বাসায় একসাথে খাবারের দাওয়াত দিতেন।

করাহ গোত্রের প্রধান ইবনুদ দাগিনাহ ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিনতেন। দু-জনের মধ্যে দীর্ঘ দিন দেখা নেই। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন (এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরতের আগে), তখন তাদের আবার দেখা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি ইবনুদ দাগিনাহর সংস্পর্শে আসেন। ইবনুদ দাগিনাহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুরবস্থা এবং বাধ্যতামূলক মক্কা ছাড়ার কথা জানতে পেরে তাকে বললেন, ‘তার মতো একজন ব্যক্তির পক্ষে মক্কা থেকে বহিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিপদ-আপদে অসহায় মানুষদের সাহায্য করেছেন, অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং কথা ও কাজে সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন।’^{৩৪} ইবনুদ দাগিনাহর উপরোক্ত মন্তব্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, যা ইমাম ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, প্রথম ওহী পাওয়ার পর ভীত-সন্ত্রস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে শব্দ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন, ঠিক একই শব্দ

^{৩৪} সহীহ, বুখারী (৩৯০৫)।

ইবনুদ দাগিনাহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুণের কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। অথচ ঘটনাটি ছিল কাকতালীয়। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম আবির্ভাবের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা-চেতনায় ও চরিত্রে অভিন্ন ছিলেন। এজন্য এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরে কেন তাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব ছিল!

৪। তিনি অন্ধকার যুগেও মদ পান করেননি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে কখনো মদ পান করেননি। এতে মদ পান করার স্বাদ ভালো লাগা না লাগার ব্যাপার ছিল না। তিনি মদ পানের অপকারীতা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন। তিনি তার ব্যক্তিত্বকে সবসময় উন্নত ও সম্মানজনক পর্যায়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মদীনা শরীফে মদ পান করা হারাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারও অনেক আগে, মক্কায় ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই নিজের জন্য মদ পান করা হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। একবার তিনি এক মদ্যপায়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মদ্যপ ব্যক্তিটির হাতে এক টুকরা বিষ্ঠা ছিল। এটা সে তার মুখের কাছে এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছে যেন সে এটা খাবে। আসলে সে এটা খেতেই চাচ্ছিল। কিন্তু মুখের কাছে নিতেই এর উৎকট গন্ধে তার বোধদয় হয়। এ ঘটনায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব বিচলিত হয়েছিলেন। মদ্যপ ব্যক্তিটির জন্য না। বরং মদ খাওয়ার মন্দ অভ্যাস এবং তা খেয়ে অচেতন হওয়ার ব্যাপারে।

পরবর্তী সময়ে তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘ইসলাম গ্রহণের আগে আপনি কি কখনো মদ পান করেছেন?’ এর প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দিয়েছেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।’ তারপর তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কেন?’ তখন তিনি বললেন, ‘আমি আমার সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে উন্নত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট

ছিলাম। আমি এটা নিশ্চিতভাবেই জানতাম, যে ব্যক্তি মদ পান করল, সে তার সম্মান এবং ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিল।’^{৩৫} আরেক বর্ণনা মতে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়েই ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে মদ পান থেকে বিরত ছিলেন।’^{৩৬}

৫। তিনি কোনো মূর্তিকে সেজদা করেননি

আরেকটি বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাদৃশ্য ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবনে একবারের জন্য হলেও কখনো মূর্তি পূজা করেননি। এটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ব্যতিক্রমী দিক যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে বিরল। তাদের প্রায় সবাই ইসলামে প্রবেশের পূর্বে মূর্তিপূজক ছিলেন। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুবক বয়সে উপনীত হলেন, তখন তার পিতা তাকে একটি উপাসনালয়ে নিয়ে গেলেন যেখানে মূর্তি ভরা ছিল। ঐসব মূর্তিদের দিকে ইশারা করে তার পিতা বললেন, ‘এরা তোমার খোদা।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অল্প বয়সেই বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিষয়টিকে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করতে চাইলেন। একটি মূর্তির দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, ‘আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খাদ্য দাও।’ মূর্তির কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে তিনি আবার বললেন, ‘আমার শরীরে কাপড় নেই। আমাকে কাপড় দিয়ে আবৃত কর।’ তারপরেও যখন কোনো জবাব পেলেন না, তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন যেটা মূর্তির চেহারায় গিয়ে আঘাত করল। সেটি আধোমুখ হয়ে ভূপাতিত হলো। এভাবে তার প্রশংসনীয় চরিত্র, দ্যুতিময় জ্ঞান ও সুস্থ স্বভাব তাকে এমন সব কাজ থেকে বিরত রেখেছিল যেগুলো ভদ্রতা ও আভিজাত্যকে ভুলগঠিত করে এবং যেসব মূর্খতামূলক কর্মকাণ্ড মর্যাদাকে হেয় করে, তা থেকেও তিনি বিরত ছিলেন।

^{৩৫} সিরাহ ওয়া-হায়াত আস-সিদ্দীক, মাযদি ফাতহী, পৃ. ৩৪।

^{৩৬} তারিখ আল-খুলাফা, সুয়ুতি, পৃ. ৪৯।

ইসলাম-পূর্ব যুগে তার পাণ্ডিত্য ও উন্নত গুণাবলীর কারণে তিনি পরবর্তী কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ও মহান ছিলেন। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বলেছেন, 'ইসলাম-পূর্ব যুগে তোমাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর তারা তোমাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে সঠিকভাবে চর্চা করে।'৩৭

ইসলাম পূর্ব যুগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ভালো-মন্দ বোঝার জন্য তার কোনো শিক্ষক বা পথনির্দেশক ছিল না। আমরা জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল প্রকার মন্দ থেকে বাঁচিয়ে নবুওতের দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্য কথায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মন্দ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে যা তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত একটি বিষয়, যে কেউ তার জীবনী অধ্যয়ন করলে তা বুঝতে পারবে। অন্য দিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। অনেক দিক দিয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার চরিত্রের এমন সব সাদৃশ্য ছিল, যাতে দু-জনকে যমজ ভাই বলে মনে হয়। কুরাইশ বংশের প্রায় সকলেই জীবনে একটি নির্দিষ্ট পথে চলতেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন। একই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে দু-জনের মধ্যে এত বেশি বন্ধুত্ব ছিল যা কল্পনা করা যায় না। ইসলাম গ্রহণের পর এই বন্ধন দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর হতে থাকে।

ইসলাম পূর্ব যুগে তার চরিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি টাকা-পয়সা খুব বিজ্ঞোচিতভাবে খরচ করতেন, মহান

গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতেন এবং জীবনের বিভিন্ন জটিল সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন। যারা তাকে চিনতেন, সবাই তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন। ইসলাম আবির্ভাবের পরেও কুরাইশরা অনেক সাহাবীকে অপমান করার ও দোষ ধরার জন্য মরিয়া থাকত। কিন্তু তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় সেটা করত না। তারা তাকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করত। তারা শুধু একটি বিষয়ে আপত্তি করত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। কুরাইশদের মন থেকে তার ব্যাপারে সব ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে তাকে তিক্ত ও চরম শত্রুতে পরিণত করতে এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট ছিল।^{৩৮}

^{৩৮} মিনহাজ আস-সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (৪/২৮৮, ২৮৯); আবু বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ আব্দুররহমান কাসিম, পৃ. ১৮-১৯।



দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু বকর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের
প্রচারে ভূমিকা, ত্যাগ-তিতিক্ষা;
এবং তার প্রথম হিজরত

এক। ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ইসলাম এক বরকতময় নতুন জীবনের সূচনা করে। দুনিয়াতে তার অবস্থানকে যথার্থ এবং অর্থবহ করে। অন্যদিকে সত্যানুসন্ধানের জন্য তার অবিরাম চেষ্টার সমাপ্তি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, দুনিয়াতে সব শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। শিশুর পিতামাতাই তাকে ইহুদী, খ্রীস্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বানায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে জন্ম থেকে আটত্রিশ বছর (অথবা আরও বেশি বা কম) পর্যন্ত এই নিষ্পাপ অবস্থা খুবই মজবুত ছিল। এই পুরো সময় তিনি এমন এক সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন ছিলেন যার সাথে তার নিষ্পাপ এবং নিকলুস চরিত্রের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরবের বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। অনেক শহর-বন্দর ঘুরেছেন। তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। এ সময় তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। বিশেষত তিনি খ্রীস্ট মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন। যারা একেশ্বরবাদী মতবাদের

অনুসারী ছিলেন এবং এক আল্লাহর অস্তিত্বকে পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করতেন, তাদের ব্যাপারেও তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। একটি ঘটনা তার চিন্তা-ভাবনায় খুব বেশি প্রভাব ফেলে। একবার তিনি কাবার চত্বরে বসা ছিলেন। এ সময় যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল এবং ইবনে আবীস সালত এর মধ্যে কথোপকথন তার কানে আসে। ইবনে আবীস সালত যায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে কল্যাণ প্রত্যাশী! তোমার সকাল কেমন কেটেছে?’

যায়েদ বললেন, ‘ভালো।’

‘তুমি কি কিছুর সম্মান পেয়েছ?’

‘না।’ অতঃপর যায়েদ নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন,

كُلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا مَضَى فِي الْحَنِيفِيَّةِ بُورُ

একত্ববাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাস ছাড়া সব দীনই কিয়ামত দিবসে বাতিল সাব্যস্ত হবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুনলেন, তাদের একজন বলছে, ‘মানব জাতির জন্য একজন নবী আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে।’

পরবর্তী কালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেছেন, ‘এ ঘটনার আগ পর্যন্ত এমন একজন নবী সম্পর্কে (যাকে খুব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে) আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল এর কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন। তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন এবং নিজেই নিজের সাথে কথা বলতেন। আমি তাকে দেখতে পেয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালাম এবং আমি যা শুনেছি, তা তাকে বললাম। তখন তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমরা আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং (নাযিলকৃত গায়েবী) জ্ঞান সম্পর্কে খুব বেশি পরিচিত। বস্তুত, এই নবী আরবদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। আরবদের বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কে আমার কিছু জানা আছে এবং আমি জানি যে, তোমাদের

বংশই আরবদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, ‘হে আমার চাচা, নবীরা কি বলে?’ তিনি জবাবে বললেন, ‘নবীরা তাই বলেন যা তাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে। অবশ্য তিনি অবিচার করেন না। কোনো অন্যায়-অবিচারে সহায়তাও করেন না। অবিচার সহ্যও করেন না।’ তারপর যখন আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠালেন, আমি তাকে বিশ্বাস করলাম এবং তার উপর ঈমান আনলাম।’

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে অন্ধকার যুগে যেসব কবিগণ একেশ্বরবাদী মতবাদের উপর কবিতা রচনা করতেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেসব কবিতা মুখস্থ করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে কিস ইবনে সাঈদার কবিতা মুখস্থ বলতে পারবে যেটা সে উকায বাজারে আবৃত্তি করেছিল? এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে একটি ঘটনার দিকে ইশারা করেছেন। মজলিসের সবাই নিরব। কেবলমাত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! তার কবিতা আমার মুখস্থ আছে।’ তারপর তিনি কিস ইবনে সাঈদার কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন। কিস ইবনে সাঈদা কাফেরদের উদ্দেশ্য করে উকায বাজারে প্রকাশ্যে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির একটি লাইন এরকম : আমি শপথ করে বলছি, আল্লাহর কাছে এমন একটি ধর্ম আছে, যা তার কাছে তোমাদের ধর্মের চেয়ে অধিক প্রিয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিস ইবনে সাঈদার এই কবিতার কোনো শব্দ ভুলে যাননি। বরং তিনি শোনার পর থেকে অনেক বছর পর্যন্ত এটা স্মরণ রেখেছেন। এজন্য তিনি পুরো কবিতাটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অন্যান্য সাহাবীদের সামনে মুখস্থ আবৃত্তি করতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেছেন, ‘আমি যখনই কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তখন ইসলাম

গ্রহণের ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যেত। কেবলমাত্র আবু বকর এর ব্যতিক্রম। দাওয়াত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইসলাম কবুল করেছে এবং রাসূলের উপর ঈমান এনেছে। কোনো রকম সংশয় বা দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে জানতেন, তাদের কাছে এটা কোনো অবাক করার বিষয় ছিল না। যেমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ নবুওতের দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, ঠিক তেমনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে বিগত আটত্রিশ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করেছেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। একবার তিনি শাম দেশে সফর করছেন। সেখানে তিনি একজন পাদ্রীর দেখা পেলেন। তার নাম ছিল বুহাইরা। তার সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কথা বলতে চাইলেন। বুহাইরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘মক্কা থেকে।’ তারপর বুহাইরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোন বংশের তা জানতে চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘কুরাইশ বংশের।’ বুহাইরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি করেন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমি একজন ব্যবসায়ী।’ তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললেন, তখন বুহাইরা বললেন, ‘আল্লাহ যদি আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেন, তাহলে আপনার বংশ থেকে তিনি একজন নবী পাঠাবেন। আপনি সেই নবীর জীবদ্দশায় তার মন্ত্রী হবেন। আর তার মৃত্যুর পর তার খলীফা হবেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুহাইরার এই কথাগুলো গোপন রাখলেন। অন্য কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জানাননি।^{৩৯}

^{৩৯} আল-খুলাফা আর-রাশিদীন, মাহমুদ শাকির, পৃ. ৩৪।

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো ধরনের সংশয় প্রকাশ করেননি। এর কারণ সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগ থেকেই খুব গভীরভাবে চিনতেন। কুরাইশ বংশের অন্যান্যদের মতো তিনিও জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন পরম বিশ্বস্ত ও সৎ মানুষ। কিন্তু রাসূলের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যদের চেয়ে এ সত্য সম্পর্কে আরও বেশি অবহিত ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আরও অনেক চমৎকার গুণের কথা জানতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য বিষয়েও মিথ্যার আশ্রয় নেন না। কখনো তিনি কারও কাছ থেকে সম্মানের আশা করেন না। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর ব্যাপারে তিনি মিথ্যা বলবেন, এটা কিছুতেই হতে পারে না।^{৪০}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘অবশ্যই আমি আল্লাহর নবী এবং রাসূল। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন (অন্যকে আহ্বান করতে) এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং তার কোনো শরীক নেই। তাই কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই ঈমান।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে এ আহ্বানে সাড়া দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। এ প্রতিজ্ঞা তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। এর কয়েক বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে বলেছেন,

যখন আল্লাহ তা’আলা আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তখন তোমরা বলেছিলে, ‘তুমি

^{৪০} তারিখ আদ-দাওয়া ফী আহদ আল-খুলাফা আর-রাশিদীন, পৃ. ৪৪।

মিথ্যা বলছ (এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশ বংশের ঐসব সদস্যদের প্রতি ইশারা করেছেন যারা তখনো ঈমান আনেননি)।’ অথচ আবু বকর বলেছে, ‘তিনি সত্য বলেছেন।’ তারপর সে আমাকে তার জান এবং মাল দিয়ে সাহায্য করেছে। তোমরা কি তাকে আমার জন্য ছেড়ে দিবে না (তার সমালোচনা এবং ক্ষতি করা থেকে)?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাগুলো পর পর দু-বার বলেছেন।^{৪১}

এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী ইতিহাসে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে প্রথম মুসলমান পুরুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইবরাহীম আন-নাখাই, হাসান ইবনে ছাবিত, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম করুল করেছেন। ইউসূফ ইবনে ইয়াকুব আল-মাযিসুন বলেন, আমি আমার পিতা এবং ইসলামের অনেক বড় পণ্ডিত যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আল-মুনকাদির, রাবেয়া ইবনে আব্দুর রহমান, সালেহ ইবনে কাইসান, সা’দ ইবনে ইবরাহীম এবং উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আল-আখনাস প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতাম। তাদের মধ্যে সামান্যতমও সন্দেহ ছিল না যে, ইসলামের প্রথম মুসলমান আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইবনে আব্বাস বলতেন যে, ‘(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া) ইসলামে সর্বপ্রথম নামায পড়েছেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু।’

তথাপি সর্বপ্রথম কে মুসলমান হয়েছেন, যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকগণের কাছে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েই গেছে। তবে উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিকগণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। অন্যরা একইভাবে মনে করেন যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, যায়েদ ইবনে হারিসা

^{৪১} সহীহ, বুখারী (৩৬৬১)।

সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। এর মধ্যে আরেক দল মনে করেন যে, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইমাম ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব মতবিরোধকে খুব সুন্দরভাবে সমান্তরাল একটি বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসেন। তিনি লেখেন, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু মুক্ত দাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো বাল্য বয়সে উপনীত হননি। উপরোল্লিখিত সবাই ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্য ছিলেন। সবশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন।^{৪২}

উপরে যাদের মুসলমান হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ দ্বারা অনেক বেশি উপকার হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সর্দার, কুরাইশদের মধ্যে মর্যাদাবান নেতা, সম্পদশালী, ইসলামের দাঈ, অন্যদের আকর্ষণকারী ও সহানুভূতিশীল। তিনি তার সম্পদ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যে খরচ করতেন। অতঃপর ইবনে কাসীর বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সর্বপ্রথম) উপরোক্ত বিভিন্ন মতগুলোর মাঝে সমন্বয় করে জবাব দেন, ‘স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, নারীদের মধ্যে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, মুক্ত দাসদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আর নাবালকদের মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই খুশি হলেন। আয়েশা

^{৪২} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩/২৬, ২৮)।

রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন, তখনই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, মক্কার উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে কেউই তখন এত আনন্দিত ছিল না। তার আনন্দের মূল কারণই ছিল যে, এইমাত্র আবু বকর ইসলাম কবুল করেছেন।’^{৪৩}

ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে রাসূলের মিশন খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এ অবস্থায় খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার উৎসাহ আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ তাকে খুব সাহায্য যুগিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন : তিনি ছিলেন সদগুণাবলীর প্রতিমূর্তি। তার জ্ঞান ও উত্তম চরিত্রের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসত এবং সম্মান করত।

মূলত তার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের জন্য ছিল এক বিরাট বিজয়।

দ্বিতীয়। ইসলাম প্রচারে ভূমিকা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বোঝা বহন করলেন এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিখলেন যে, ইসলাম ধর্ম আমলের, দাওয়াতের এবং জিহাদের।

আর একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার নিজের জান এবং মাল আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।^{৪৪}

এ সত্য উপলব্ধি করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইরে বের হয়ে পড়লেন এবং কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমল শুরু করলেন :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে আহ্বান করুন হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনো বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।^{৪৫}

আমি আগেও উল্লেখ করেছি, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সার্বজনীনভাবে সকলেই ভালোবাসত। সমাজের বিজ্ঞ, ব্যবসায়ী,

^{৪৪} সূরা আল-আনআম, ৬:১৬২-১৬৩।

^{৪৫} সূরা নাহল, ১৬:২২৫।

জ্ঞানী এবং দুর্বল-অসহায় সবাই। কিন্তু সম্ভবত তিনি সমাজের জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ মানুষদের কাছেই নিজের প্রভাবকে বেশি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরাইশী সমাজে প্রধানত বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রতিনিধিত্ব করতেন। তারা সাধারণত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাদের সম্মান এবং প্রতিপত্তির জন্য ব্যবসায়িক কাজে বেশি সময় দিতে হতো না। অবসর সময় তারা জ্ঞানার্জনে ব্যয় করতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব মানুষদের কাছে যেতেন এবং ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করতেন। তার এ কাজে খুব চমৎকার ফল হয়। তার প্রাথমিক দাওয়াতে এমন সব মানুষ ইসলামে দাখিল হন, যারা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

এদের মধ্যে যুবায়ের ইবনু আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি-ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা ইবনে আল-যাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু সালামাহ ইবনে আব্দুল আস'আদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-আকরাম ইবনে আবি আল-আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ্য। প্রত্যেকেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়েছেন এবং তার কাছেই তারা ইসলাম কবুল করেছেন। তারপর তারা প্রত্যেকে অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম প্রচার-প্রসারে কেবল তার বন্ধুদের মধ্যেই সাফল্য পাননি, তার পরিবারের সদস্যদের বেলায়ও একইভাবে সফল হয়েছেন। তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের সবাই ইসলামের প্রথম দিকে ঈমান এনেছিলেন : আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে রুমান রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দাস, আমির ইবনে ফুহাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সফল দাঈ ছিলেন - এ কথা বলে তাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বরং তার সব গুণাবলী বিবেচনা করলে এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, তিনি দাঈ হিসেবে অনেক বেশি সফল ছিলেন। তার অন্যান্য গুণাবলী যেমন আন্তরিকতা, মহানুভবতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদির তালিকা অনেক দীর্ঘ। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান যারা বিশ্বাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তাদেরকে এসব গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একজন সফল দাঈ বানিয়েছিল।

তৃতীয়। পরীক্ষা এবং দুর্ভোগ

যুগ যুগ ধরে এ নিয়ম চলে আসছিল যে, প্রথমে যারা হকের কথা বলেছেন, তারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, জাতি-গোষ্ঠি এমনকি পুরো দেশ এরূপ জুলম-অবিচারের মুখোমুখি হয়েছে। যথারীতি সাহাবায়ে কেরামও এ থেকে ভিন্ন ছিলেন না। তারা এমন যুলুমের শিকার হয়েছেন যদি তা কোনো পর্বতমালার উপর আরোপ করা হতো, তাহলে তাও ভূমির সাথে মিশে যেত। তারা তাদের সম্পদ খরচ করেছিলেন দ্বীনের পথে। ইসলাম নামক বৃক্ষের গোড়ায় তারা তাজা খুন ঢেলেছিলেন। আল্লাহই জানেন, কি পরিমাণ কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয়েছিল!

নিভীক ও দুর্বল সাহাবীরা এবং দাসরা কুরাইশদের হাতে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের স্বীকার হতেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও এ অত্যাচার-নিপীড়ণ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও এর ব্যতিক্রম নন। বরং একবার তিনি এত বেশি মার খেয়েছিলেন যে, মৃত্যু প্রায় অবশ্যস্তাবী ছিল।

যখন মুসলমানদের সংখ্যা কেবল আটত্রিশজন হয়েছে, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য অনুরোধ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর! আমরা কিন্তু সংখ্যায় কম।’ তবুও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে বের হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই লাগলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে বের হলেন। অন্যান্য মুসলিমগণ মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে অবস্থান নেয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। বস্তুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম বক্তা, যিনি প্রকাশ্যে লোকজনকে আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি আহ্বান করলেন। মুশরিকগণ অবিলম্বে আবু বকরের উপর এবং মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মসজিদের বিভিন্ন স্থানে থাকা মুসলমানদেরকে তারা ভীষণ প্রহার করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তারা পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করে এবং তাকে বেদম মারপিট করে। পাপিষ্ঠ উতবা ইবনে রাবিয়াহ তার কাছে আসে এবং পুরোনো ভারী দু-টি জুতো দিয়ে তাকে প্রহার করে, সেগুলো দিয়ে তার চোখে, মুখে আঘাত করে এবং তার পেটের উপর উঠে দাঁড়ায়। তাকে এমন প্রহার করা হয় যে, তার নাক-মুখ চেনা যাচ্ছিল না।

নিপীড়ণ তখনো চলছিল। এক পর্যায়ে মনে হলো, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত বেঁচে নেই। সত্যিকার অর্থে তিনি প্রায় মরেই গিয়েছিলেন। ঐসময় অনেক দেরীতে হলেও তার গোত্রের (বনু তাইম) লোকেরা এসে তাকে উদ্ধার করে। তারা আক্রমণকারীদেরকে হটিয়ে দেয় এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত মৃত্যুবরণ করেছেন ভেবে বাসায় নিয়ে আসে। বনু তাইম গোত্রের লোকেরা তারপর মসজিদে ফিরে আসে এবং ঘোষণা করে, ‘আল্লাহর শপথ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু হলে আমরা উতবা ইবনে রাবিয়াহকে খুন করে তার প্রতিশোধ নেব।’ তারপর তারা আবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পিতা আবু

কুহাফাহ-এর নিকট ফিরে আসে। আবু কুহাফাহসহ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান ছিল না। দিন শেষে তিনি একটু সুস্থতা বোধ করেন এবং তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া এবং নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা না করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায়? তিনি কেমন আছেন?’ যেহেতু গোত্রের লোকেরা মুসলিম ছিল না—একই গোত্রের সদস্য হিসেবে তারা আবু বকরকে বাঁচিয়েছে এবং তারা নিজেরাও রাসূলের চরম বিরোধী, এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথায় তারা আহত হলো। তারা তাকে তিরস্কার করে তার শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তাকে তো অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে!

তিনি প্রায় মরেই গিয়েছিলেন। তার এখন নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। জ্ঞান ফিরে পেলেও তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন এবং সারা শরীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিল। গোত্রের লোকেরা তার মা উম্মুল খাইরকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু খাবার-পানীয় দিতে বলল। সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর উম্মুল খাইর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু খেতে দিলেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছিলেন। বনু তাইম গোত্রের কেউই রাসূলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এমন একটি ভয়াবহ আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে তার অবস্থা জানা সহজ ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার গোত্রের (বনু হাশিম) লোকেরা সাহায্য করেছে।

উম্মুল খাইর বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমি তোমার বন্ধু সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় কেমন আছেন) কিছু জানি না।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আপনি

(আল-খাত্তাবের মেয়ে এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বোন) উম্মে জামিলের নিকট যান এবং তাকে রাসূলের কথা জিজ্ঞেস করুন।’

উম্মুল খাইর জানতেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের জীবনের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালোবাসেন। এজন্য তিনি ছেলের অনুরোধ বিনা বাক্যে মেনে নিলেন এবং উম্মে জামিলের খোঁজে বের হলেন। তাকে পাবার পর উম্মুল খাইর বললেন, ‘আবু বকর তো তোমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে।’

উম্মে জামিল বললেন, ‘আমি আবু বকরকে চিনি না এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কেও কিছু জানি না। তবে যদি আপনি চান, তাহলে আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে যেতে পারি।’ উম্মুল খাইর বললেন, ‘হ্যাঁ, চল।’ তারপর তারা দু-জন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে এলেন। তারা এসে দেখলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চরম অসুস্থ এবং ধারণা করলেন, তিনি এখন মৃত্যুর পথযাত্রী। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ চরম আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর শপথ, কাফের ও পাপিষ্ঠের দল আপনার এ দুরবস্থা করেছে। আমি নিশ্চিত আশাবাদী, আল্লাহ তা‘আলা তাদের থেকে আপনার প্রতি যুলুমের প্রতিশোধ নিবেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?’ উম্মে জামিল বললেন, ‘পাশে তো আপনার মা রয়েছেন। তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনছেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার মায়ের ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন।

উম্মে জামিল বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ ও ভালো আছেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘তিনি কোথায় আছেন?’ উম্মে জামিল জবাব দিলেন, ‘তিনি এখন ইবনুল আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে আছেন।’ এ কথা শোনার পর নিজের চরম দুর্বলতা ও বিশ্বাসের

আবশ্যকতা সত্ত্বেও তিনি বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্য পানীয় মুখে তুলব না।’ তিনি নিশ্চিত হতে চান যে, রাসূল সুস্থ আছেন!

উম্মুল খাইর এবং উম্মে জামিল এ অবস্থায় যেতে চাইলেন না। পরিস্থিতি একটু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া নিরাপদ নয়। এজন্য তারা ইচ্ছে করে একটু দেরী করলেন। পরে পরিস্থিতি যখন সত্যিই শান্ত হলো, তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দারুল আরকামে নিয়ে এলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু হাঁটতে পারছিলেন না, এজন্য তাদের কাঁধে ভর করে মাটি ঘেঁষে হাঁটছিলেন। তারা যখন দারুল আরকামে প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌড়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন। তাকে চুমু খেলেন। অন্যান্য মুসলমানরাও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করার জন্য ছুটে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের এই চিন্তিত অবস্থা দেখে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! পাপিষ্ঠ উতবা আমার মুখে যে আঘাত করেছে তা ব্যতীত অন্যত্র এখন আমার খুব একটা ব্যথা-বেদনা নেই। এই যে আমার আশ্রয়, তিনি তার সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। আপনি তো বরকতময় সত্তা, তাকে আল্লাহর পথে আসার দাওয়াত দিন এবং আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে যেন জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের জন্য সঙ্গে সঙ্গে দু‘আ করলেন এবং তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। উম্মুল খাইর এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।^{৪৬}

^{৪৬} আস-সিরাহ আন-নবুওয়্যাহ, ইবনে কাসীর (১/৪৩৯-৪৪১); আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩/৩০)।

শিক্ষা এবং উপদেশ

১। বর্তমান যুগে অনেকেই বিধর্মীদের কাছে অপমান এবং অপবাদের আশঙ্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে দ্বিধাবোধ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালো করেই জানতেন, ইসলামের প্রচারের কাজে তাকে শুধু মৌখিক অপমান করা হবে না, শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হবে। তা সত্ত্বেও তিনি সেসব পরওয়া করেননি। তার কাছে প্রকাশ্যে বিধর্মীদের কাছে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে, কোনো আক্রমণের ভয় তিনি পাননি। অনেকে প্রশ্ন করেন, মুসলমানদের কাছে তখন কি এমন ছিল যাতে তারা ইসলাম প্রচারের কাজে রাসূলের জীবদশায় এত বেশি সাফল্য পেয়েছেন? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ত্যাগের কথা চিন্তা করলে এরকম প্রশ্ন অবান্তর মনে হবে। তার গোত্রের লোকেরা ভেবেছিল, এত মারাত্মক আঘাতে তিনি হয়তো মরেই গেছেন। এরকমভাবে তিনি নিজে এবং অন্যান্য সাহাবীরা তাদের জীবনে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরূপ করা তাদের জন্য সম্ভব ছিল, কারণ তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূলের মহব্বত তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ছিল। তাওহীদের ঝাঙা উত্তোলন করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

২। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, দুনিয়াতে এর কোনো নমুনা পাওয়া যাবে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন, তার আঘাত ছিল মারাত্মক। তার বিশ্রাম এবং চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। তারপরেও তিনি চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা না ভেবে রাসূলের অবস্থা জানতে চেয়েছেন। এতে তার গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে যায় যারা কেবল তার অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিল। তিনি রাসূলের সংবাদ জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ না রাসূলের সাথে দেখা হয়, ততক্ষণ তিনি কোনো খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সোজা

হয়ে বসার মতো অবস্থা ছিল না, হাঁটার তো প্রশ্নই নেই। তবু তার দৃঢ় মনোবল এবং রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে রাসূলের কাছে ছুটে গেছেন এবং সব বাধা অতিক্রম করেছেন। আল্লাহ তাকে এবং সকল সাহাবীদেরকে উঁচু মর্যাদা দান করুন।

৩। মক্কার অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিগত সম্প্রীতি। এটা তাদের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করত। এমনকি অনেক সময় ধর্মীয় সম্প্রীতি থেকেও এটা প্রাধান্য পেত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজ গোত্রের অধিকাংশ লোকেরা ছিল কাফের। তারপরেও তারা তাদের স্বধর্মীয় লোক উতবা ইবনে রাবিয়াহর বিরুদ্ধে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

৪। ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে রাসূলের সাহাবীরা পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। যখন কোনো বিপদের আঁচ পেতেন, তখন খুব সাবধানতার সঙ্গে সেটা মোকাবেলা করতেন। উম্মে জামিল উপরে বর্ণিত ঘটনায় তা কয়েকবার দেখিয়েছেন। মক্কার উত্তেজিত পরিবেশ যেখানে মুসলমানরা মারাত্মকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে, এটা বুঝতে পেরে তিনি উম্মুল খাইরকে বলেছেন, ‘আমি আবু বকর সম্পর্কেও কিছু জানি না এবং রাসূল সম্পর্কেও কিছু জানি না।’ এটা তার একটি হেকমত ছিল। যেহেতু তখনো উম্মুল খাইর মুসলমান হননি। সম্ভবত তিনি মক্কার কুরাইশদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করছেন। উম্মে জামিল নিজেও তার ইসলাম কবুলের কথা গোপন রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, উপরের বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সরাসরি খবরটা জানাতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি উম্মুল খাইরকে তার সাথে গিয়ে তার ছেলের সাথে দেখা করার প্রস্তাব দেন।

তৃতীয়ত, উম্মে জামিল এটা হয়তো এমনিই করেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি উম্মুল খাইরকে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলেন এই বলে যে,

‘আল্লাহর শপথ, যারা আপনার সাথে এ আচরণ করেছে, নিশ্চয়ই তারা কাপুরুষ এবং অবিশ্বাসী। আমি আশাবাদী, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে এর প্রতিশোধ নিবেন।’ এর আগেও তিনি উম্মে আল-খাইরের ছেলের প্রতি একইভাবে সান্ত্বনার কথা বলেছিলেন। তখন তিনি উম্মুল খাইরকে বলেছিলেন, ‘তবে যদি আপনি চান, তাহলে আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে যেতে পারি।’ মূলত, তিনি উম্মে আল-খাইরের কাছে নিজের নিরপেক্ষ ভূমিকার প্রেক্ষিতে বিশ্বস্ততা অর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন যেন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করতে পারেন।

চতুর্থত, যখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন, তখন তিনি সতর্ক ছিলেন কাফেরদের মধ্যে কেউ যেন তাদের আলোচনা না শোনে। তিনি কিছুতেই উম্মুল খাইরকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যেহেতু তিনি তখনো মুসলমান হননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে স্বাধীনভাবে কথা বলার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন, তখন উম্মে জামিল তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কথা বলেন। শুরুতেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় আছেন, এ তথ্য দেননি। কিন্তু পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, তখন বলেছেন। মক্কায় থাকাকালীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকে জানা যায় যে, সব সাহাবীরাই এমন সতর্ক ছিলেন। এজন্য মক্কার কাফেররা মুসলমানদের গোপন বৈঠক সম্পর্কে কখনই কিছু জানতে পারত না।

পঞ্চমত, যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মে জামিলকে দ্বারে আরকামে নিয়ে যেতে বললেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হননি। তিনি পরিস্থিতি শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন যাতে তাদেরকে দেখে ফেলার ভয় না থাকে।

৫। জীবন পরিক্রমায় সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রম, দুর্ভোগ, পরীক্ষা এবং সহিষ্ণুতা সহ্য করার পর প্রতিদান পাওয়া যায়। কুরাইশদের নির্যাতনে চরম দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করার পর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মা উম্মুল খাইরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বললেন এবং তার জন্য দু'আ করতে বললেন। এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যত কষ্ট, তার মায়ের ইসলাম কবুল করার মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ঘটনায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের একান্ত চিন্তা ছিল, সন্তানের সুস্থতা ও বেঁচে থাকা নিয়ে যেমন পৃথিবীর সাধারণ মায়েরদের থাকে। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মূল চিন্তা ছিল মায়ের চিরস্থায়ী নাযাতের বিষয়ে। তিনি যা চাইলেন, তা হলো, মা যেন এরূপ অবস্থায় দীন কবুল করে নেয়।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে এবং সবচেয়ে বিপদজনক সময়ে সারাক্ষণ তার পাশে ছায়ার মতো থাকার কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন (তার গোত্রের নিরাপত্তা সত্ত্বেও এবং কমপক্ষে ইসলাম পূর্ব যুগে কুরাইশদের বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও দুর্ভোগ সহকারীদের একজন।

চার। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিস্ময়কর সব গুণাবলী যার মাধ্যমে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা বলে সাব্যস্ত হন, সেগুলোর মধ্যে আরেকটি বড় গুণ ছিল তার সাহসিকতা, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তিনি ভয় পেতেন না। আল্লাহর দীনের সাহায্যের ব্যাপারে কারও নিন্দার ভয় করতেন না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিছু মুসলমান ইসলাম গ্রহণের কথা নির্যাতনের ভয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে গোপন রেখেছিল। এটা দোষণীয় কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ তখন বেঁচে থাকাটাও একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই গোপনীয়তা রক্ষা করেননি। বরং তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন যে, তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। পরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এই অসীম সাহসিকতার

জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খুব প্রশংসা করতেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের কাছে ফেরাউনের সময় এক ব্যক্তির ঈমানের সাথে (যে তার ঈমানকে লুকিয়েছিল) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের তুলনা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতেন।

একবার আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতের সময় এক খুতবায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘হে লোকসকল, তোমরা বল তো, সবচেয়ে বড় বীর কে?’ ঐসময় যারা উপস্থিত ছিল, সবাই বলল, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন, সবচেয়ে বড় বীর আপনি।’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন,

যে কেউ আমার মোকাবিলায় এসেছে আমি তার বদলা নিয়েছি। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যতিক্রম। আমরা বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করি। মুশরিকদের কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে যাতে তার কাছে আসতে না পারে সে জন্য রাসূলুল্লাহর সাথে যে কোনো একজনকে থাকার জন্য আমরা নাম আহবান করলাম। আল্লাহর কসম, সে দিন আবু বকর ব্যতীত কেউ এগিয়ে এল না। তিনি খোলা তলোয়ার উঁচু করে রাসূলুল্লাহর শিয়রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মুশরিকদের কেউ এদিকে অগ্রসর হলেই তিনি তাকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিতেন। সুতরাং আবু বকরই সবচেয়ে বড় বীর। আমি দেখেছি, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর সাথে বিরোধিতা করত, আবু বকর তার জবাব দিতেন, মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়াতেন। কাফেররা অভিযোগ দিত, তুমি-ই তো আমাদের অনেক মা’বুদের স্থলে একজন মা’বুদের কথা প্রচার করছ। আল্লাহর কসম, তখন আমাদের মধ্য হতে আবু বকর ব্যতীত আর কেউ এগিয়ে যেত না। তিনিই তাদের সামনে বাধ সাধতেন, তর্ক করতেন ও লড়াই করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি বলছেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা বলে নিজের কাপড়ে চেহারা ঢাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি মোবারক ভিজে যায়। তারপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, বল দেখি, ফেরাউন বংশের সেই মু’মিন লোকটি উত্তম, না আবু বকর উত্তম?’ প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সবাই নিরুত্তর হয়ে গেল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, ফেরাউন বংশের সেই মু’মিন লোকটির জীবনের সমুদয় পুণ্যের তুলনায় আবু বকরের এক মুহূর্তের পুণ্য অনেক বেশি। কেননা সে তার ঈমানকে গোপন করে রেখেছিল। আর আবু বকর প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন।’^{৪৭} মক্কায় এক দশকেরও বেশি নির্যাতন ও দুর্ভোগের পরেও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এখনও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতার কথা স্মরণ করেন এবং তার এই স্মৃতি এত বেশি উজ্জল যে, সেটা স্মরণ করে তিনি নিজে কাঁদেন এবং তার কথা শুনে অন্যের চোখেও অশ্রু নির্গত হয়।

উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার ইবনে আমর ইবনুল আসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের কাছ থেকে সবচেয়ে খারাপ কি আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন, তা জানতে চান। ইবনে আমর জবাবে বলেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের একদিকে হিজরে নামায পড়ছিলেন। তখন উকবাহ ইবনে আব্বি মুআইত কাছে এসে কাপড় দিয়ে রাসূলের ঘাড় পেঁচিয়ে সজোরে গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন দৌড়ে রাসূলের কাছে আসেন। এক ধাক্কায় উকবা ইবনে মুআইতকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, ‘তুমি কি একজন মানুষকে আঘাত করছ শুধু এজন্য যে, তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?’

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুসারে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কার কাফেররা মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন পাশে

^{৪৭} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩/২৭১-২৭২)।

দাঁড়ান এবং চিৎকার করে বলেন, ‘তোমরা কি একজন মানুষকে প্রহার করছ শুধু এজন্য যে, তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?’ এ পরিস্থিতিতে অন্য কেউ পাশে দাঁড়াননি এবং রাসূলের প্রতি নির্দয় আচরণে কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও করেনি। ঐ সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি ছিল না। এটা খুব ভালো করেই জানা ছিল যে, এ সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই নিজের উপর নির্যাতনকে ডেকে আনা। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। অনেকে নিজেদের ঈমানকে কুরাইশদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। অনেকে নিজের জীবনের কথা চিন্তা করে প্রকাশ্যে কখনো কিছু বলত না। হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু উপরের বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে সবচেয়ে বিপদজনক সময়ে একজনই রাসূলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলকে বাঁচানোর জন্য তিনি একাই প্রতিবাদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম মুসলমান যিনি আল্লাহর পথে নির্যাতন সহ্য করেছেন, তিনিই প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাঁচানোর জন্য কাফেরদের অত্যাচার প্রতিহত করেছেন এবং তিনিই প্রথম অন্যকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। সারাজীবনে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমনভাবে ছিলেন যেন তিনি তার ডান হাত। ইসলাম পূর্ব যুগের একজন সফল ব্যবসায়ী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সব ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি দিন-রাত ইসলামের পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকা এবং তাকে সাহায্য করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এ পথে তিনি তার প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং সময় সবকিছুই খরচ করেছেন। বেশিরভাগ সময় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অন্যান্য সাহাবীদেরকে প্রশিক্ষণ, সান্ত্বনা দেওয়া এবং দীন শিক্ষার কাজ করতেন। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

ইসলাম কবুল করলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে রাতে খাবার খাওয়ানোর অনুমতি আমাকে দেন।’ তারপর তিনি আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তায়েফ থেকে আনা অনেক দামী কিসমিস খেতে দিয়েছিলেন। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে যেখান থেকে বোঝা যায় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, বরং অন্যান্য সাহাবীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও খেয়াল রাখতেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার জাতির মধ্যে অন্যদের প্রতি সবচেয়ে দরদী ব্যক্তি আবু বকর।’

পাঁচ। নিজের সম্পদ ব্যয় করে নির্যাতিত মুসলমান দাসদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা

মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানের জন্য কুরাইশদের মধ্যে হতাশা বাড়তে থাকে। তখন তারা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের বর্বরতার কোনো সীমা ছিল না। এক্ষেত্রে তারা দুর্বল মুসলমানদেরকেই বেছে নিত যাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না এবং সমাজে তাদের কোনো সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল না। মুসলমান দাসরা এ চরম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দলের ছিলেন। কুরাইশরা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখত। প্রথমত, অত্যাচারের কারণে মুসলমানরা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে। দ্বিতীয়ত, দুর্বলদেরকে নির্যাতন করে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত মুসলমানদেরকে সতর্ক করা। তৃতীয় বিষয়টা লক্ষ্যবস্তু না হলেও কার্যকারণ অবশ্যই ছিল যে, এ নির্যাতনের মাধ্যমে তারা তাদের ভেতরের গোস্বা ও হতাশাকে দমন করতে চাইত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘প্রথম যারা ইসলাম কবুলের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, তারা ছিলেন সাত জন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার মা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু, শুয়াইব রাযিয়াল্লাহু আনহু, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ তা’আলা তার গোত্রের লোকদের মাধ্যমে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর বাকি সবার উপর কুরাইশরা চরম অত্যাচার করেছে। গরম লোহা দিয়ে শরীরে ছেক দিয়েছে। প্রচণ্ড রোদের উত্তাপে পুড়িয়েছে। প্রত্যেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কাফেররা যা বলতে বলেছে, তা বলেছে (তারা অবিশ্বাসের কথা মুখে উচ্চারণ করেছে কিন্তু তাদের অন্তর ঈমানে পূর্ণ ছিল)।

শুধু বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের বিপরীতে কোনো কিছু উচ্চারণ করতে রাজি হননি। তার কাছে আল্লাহর জন্য জীবন দেওয়া সহজ ছিল (কাফেররা যখন তার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু অথবা অবিশ্বাসের কোনো কথা বলার প্রস্তাব করেছে)। কাফেরদের কাছে মেরে ফেলা কোনো ব্যাপার ছিল না। বরং তারা তাকে মেরে ফেলার মতোই নির্যাতন করেছে। শিশুদেরকে তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা তাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছে। আর বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সারা পথে কেবলই বলছিলেন, আহাদ, আহাদ (আল্লাহ এক। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই)।

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য করার জন্য কোনো পরিবার ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মানুষই মনে করা হতো না। কুরাইশদের ধারণায় তার একমাত্র কাজ মনিবের সেবা ও তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকা, তাকে অন্যান্য প্রাণীর মতোই বেচা-কেনা করা হতো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার কোনো মতামত থাকতে পারে, এটা ছিল কুরাইশদের কাছে একটি হাস্যকর বিষয়।

এজন্য ইসলাম গ্রহণের কারণে জীবন-যাপনে এমন কোনো পরিবর্তনের আশঙ্কায় তারা দাসদের প্রতি এতটা ক্ষেপে গিয়েছিল।

যদি এটা বলা হয় অথবা ধরে নেওয়া হয়, ইসলামের শত্রুরা যেভাবে বলে এবং চিন্তা করে, কৃতদাসরা মক্কার সমাজে তাদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য ইসলাম কবুল করেছিল। এর উত্তরে আমরা বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে প্রবেশ করেছিল। অন্য দাসদের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য যারা তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সমাজে দাসদের অবস্থান কিভাবে উন্নত হয়েছিল? অথচ সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে দাসদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের যাওয়ার অনুমতি ছিল না। অন্যদিকে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো, চাবুক মারা হতো, উত্তপ্ত মরুভূমির বালুতে প্রচণ্ড রোদে পোড়ানো হতো এবং পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। এটা নিশ্চিতভাবেই সত্য যে, অন্যান্য সাহাবীদের মতোই দাসরা ইসলাম কবুল করেছেন এবং ঈমান তাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন। এজন্য ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি হয়েছেন, এমনকি তাদের নিজেদের জীবনও। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু অবিশ্বাসের কোনো উক্তি উচ্চারণের চেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগকেই সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও জীবন বাঁচানোর জন্য এরকম কোনো উক্তি করার অনুমতি ছিল। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জবরদস্তি উচ্চারণ থেকে ধৈর্য ধরা যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসে অটল থাকা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবিশ্বাসের কোনো কথা উচ্চারণ করেননি। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দু-টিরই পরিচয় দিয়েছেন।

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনিব ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। সে যখন তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেন, তখন তাকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য ভয় দেখিয়েছে। ভয় কাজ না করাতে তাকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু

ঈমানে দৃঢ় ছিলেন এবং কিছুইতেই কুফরের পথ অবলম্বন করে বিপথে যাননি। একজন দাসের পক্ষে এমন আচরণ করা যে, সে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া নিজের ধর্ম পছন্দ করে নিতে পারে, এটা উমাইয়া ইবনে খালফ মেনে নিতে পারেনি। এজন্য সে তাকে এর উপযুক্ত একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছে। তাকে অন্যান্য মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে চেয়েছে। সারাদিন অনাহারে রেখে উমাইয়া ইবনে খালফ বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে গেছে। তাকে চিত করে শুইয়ে তার অন্যান্য দাসদেরকে তার বুকের উপর একটি ভারী পাথর রাখার হুকুম করেছে। ইতিমধ্যে তার হাত দু-টি বেধে ফেলা হয়েছে যেন তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। যখন এ জঘণ্য নির্যাতন শুরু হলো, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করতে লাগলেন, তখন উমাইয়া ইবনে খালফ বলল, ‘তুমি এ অবস্থায়ই থাকবে যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ কর অথবা মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করে লাত-উজ্জার উপর ঈমান না আন।’ তীব্র কষ্টের কোনো যাতনা প্রকাশ না করে এবং উমাইয়ার কথার দিকে ভ্রক্ষেপ না করে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে কেবলই বলছিলেন, আহাদ, আহাদ।

উমাইয়া এবং তার গোলামরা বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্যাতন করতেই থাকল। নির্যাতনের ফলে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা এত শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো সম্ভব নয়। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রহার করতে করতে এটা যেদিন তারা বুঝতে পারল, সেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ পথেই কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি উমাইয়া ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘এই গরিব লোকটার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করবে না?’ তুমি কি তাকে মারতেই থাকবে?’

উমাইয়া জবাবে বলল, ‘তুমিই তাকে নষ্ট করেছ। এখন তুমি তাকে তার এ অবস্থা থেকে বাঁচাও।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

বললেন, ‘আমি অবশ্যই সেটা করব। আমার একজন কাল গোলাম আছে। সে খুব শক্তিশালী এবং তোমার ধর্মের উপর অনেক দৃঢ়। আমি বিলালের পরিবর্তে তাকে তোমাকে দিতে চাই।’

উমাইয়া খুব আগ্রহের সাথে বলল, ‘আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি।’ যখন লেন-দেন হয়ে গেল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন যে, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এখন মুক্ত স্বাধীন মানুষ। অন্য বর্ণনায় আছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের কোনো গোলামের বিনিময়ে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করেননি। তিনি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাত উকীয়া (স্বর্ণ পরিমাণের একক) অথবা চল্লিশ উকীয়ার বিনিময়ে খরিদ করেন এবং পরে তাকে আযাদ করে দেন।

প্রতিটি দুর্ভোগের পরেই কোনো না কোনো সুসংবাদ বা পুরস্কার থাকে। কুরাইশদের হাতে চরম দুর্ভোগ ও অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করার পর তিনি কেবল একজন দায়িত্বশীল এবং সদাশয় মুসলমান কর্তৃক মুক্ত হননি, বরং সাথে সাথে তিনি একজন স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়েছেন। পরে তিনি আযাদ মানুষ হিসেবে ইসলামের পথে একইভাবে নিবেদিত ছিলেন, যেমন তিনি গোলাম থাকা অবস্থায় ঈমানের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে তিনি আরও বেশি কিছু করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আযাদ হয়ে তিনি তার সব শক্তি ইসলামের স্বার্থে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। একবার তিনি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলেছিলেন, ‘গত রাতে আমি বেহেশতে আমার আগে তোমার পায়ের শব্দ পেয়েছি।’ সাহাবীদের মধ্যে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান সম্পর্কে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে (বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুক্ত করেছিলেন।’

সাহাবীরা খুব উদ্বেষ্টের সাথে লক্ষ্য করছিল যে, দুর্বল এবং অসহায় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের হার ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। তারা তাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারছিলেন না। সমাজের ধনী ও গরিব সব মুসলমানরাই কোনো না কোনোভাবে কুরাইশদের হাতে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছিলেন। এর মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন মুসলমান কৃতদাসদের নির্যাতন থেকে বাঁচানোর একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি তাদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। এজন্য টাকা-পয়সার কোনো পরওয়া করতেন না।

আরও কয়েকজন কৃতদাসকে খরিদ করে আযাদ করেছিলেন। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন আমির ইবনে ফুহাইরা। তিনি বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে বী'রে মাউনার ঘটনায় শহীদ হন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আযাদকৃত আরও দু-জন কৃতদাস হচ্ছেন, উম্মে উবাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং জিন্নেরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জিন্নেরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এই সুযোগে তখন মুশরিক কুরাইশরা বলতে থাকে, 'লাত এবং উজ্জা (মুশরিকদের দু-জন দেবতা) তার দৃষ্টি শক্তি কেঁড়ে নিয়েছে।' জিন্নেরাহ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং বলেছেন, 'তারা মিথ্যা বলছে। আল্লাহর ঘরের শপথ, লাত এবং উজ্জাহ কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, কোনো উপকার করারও সামর্থ্য রাখে না।' এর পরেই আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টি শক্তিকে আবার ফিরিয়ে দেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আন-নাহদিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মেয়ে হিন্দিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করেছিলেন। তারা মা-মেয়ে আব্দুদার গোত্রের এক মহিলার অধীনে ছিলেন। সেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পাশ দিয়েই কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা তাদের মনিবের আটা পিষতেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের মনিবের কাছে গিয়ে তাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করলেন। ঐ মনিব মহিলা তার প্রস্তাবে রাজি হলো না। বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমি তাদেরকে আযাদ করব না।' আবু

বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার শপথ ফিরিয়ে নিতে বললেন। মহিলা বলল, ‘তুমি তা ফিরিয়ে নাও। তুমিই তাদেরকে সর্বনাশ করেছ। এখন তুমি তাদের মুক্ত কর (মানে আমার কাছ থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও)।’

‘তাদের জন্য আমাকে কত টাকা দিতে হবে?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা যখন তার নির্ধারিত মূল্য দাবী করল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি তাদের ক্রয় করলাম এবং মুক্ত করে দিলাম।’ তিনি তখন আন-নাহদিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মেয়ে হিন্দিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই সুখবর দেওয়ার জন্য গেলেন। তারপর বললেন, ‘তার আটা তাকে ফেরত দাও।’ তারা বলল, ‘হে আবু বকর! আমরা কি আমাদের হাতের কাজ শেষ করে (আটা পিষার কাজ) তাকে সেটা ফেরত দিব না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমরা চাইলে তা শেষ করতে পার।’

লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম এই মহিলাদের এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মানুষ হিসেবে একই মর্যাদা দিয়েছে। মনিবদের সাথে যেভাবে সম্বোধন করা হয়, এখানে মহিলারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেভাবে সম্বোধন করেনি। মানুষ হিসেবে একে অন্যের সাথে এভাবেই কথা বলতে পারা উচিত। আরও দেখার বিষয় হচ্ছে, কিভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করলেন! একটু আগে তিনিই তার সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে আযাদ করেছেন। ইসলাম কিভাবে আন-নাহদিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মেয়ে হিন্দিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আচরণকে মার্জিত করেছে। তারা খুব সহজেই আটাগুলো যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে চলে যেতে পারত অথবা ঐ অবস্থায়ই ফেরৎ দিতে পারত। কিন্তু তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আটা পিষার কাজ শেষ করে তা আগের মনিবকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু মুআম্মাল গোত্রের আরেকজন যুবতী কৃতদাসীকে খরিদ করে আযাদ করেছিলেন। যখন এই মহিলা

মুসলমান হলেন, তখন উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু (তখনো তিনি মুসলমান হননি) তাকে ইসলাম ধর্ম থেকে ফেরানোর জন্য খুব মারধর করেন। তাকে প্রহারের এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে উমর প্রহার বন্ধ করে বলতেন, ‘আমি প্রহার করা বন্ধ করেছি, এজন্য দুঃখিত। আমার বিরক্তিই এ কাজ থেকে আমাকে বিরত রেখেছে।’ এ ধরনের অপমানজনক কথা বলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বস্তি পাওয়ার আগেই ঐ মহিলা সাহাবী বললেন, ‘আসলে আল্লাহই তোমার মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’ তাকেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্রয় করে আযাদ করে দেন।

নির্যাতিত দুর্বল মুসলমানদের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে গভীর দরদ ও ভালোবাসা অনুভব করতেন। কুরআন মাজীদে ক্রীতদাসদের আযাদ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার আগ থেকেই তিনি তার প্রচুর সম্পদ এ কাজে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তা’আলা কুরআন মাজীদে মুসলমান দাসদের আযাদ করার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ এবং অনেক বড় পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

কুরাইশদের বেশিরভাগ লোক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গরিব ও দুর্বলদের পেছনে টাকা খরচ করার ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করত। এমনকি তার বাবা (তখনো মুসলমান হননি) তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি এ ধরনের কাজকে মূল্যহীন মনে করতেন। একদিন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, ‘হে আমার সন্তান, আমি দেখছি তুমি দুর্বল গোলামদের আযাদ করছ। তুমি যদি এটা করতেই চাও, তাহলে শক্তি-সামর্থ্য গোলামদের আযাদ করতে পার যারা তোমার কাজে আসবে এবং তোমার নিরাপত্তায় সাহায্য করতে পারবে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘হে আমার পিতা, আমি এ কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, মুসলমান গোলামরা তার ভাই এবং একই পরিবারভুক্ত। দুনিয়ার সব মুশরিকরা মিলেও একজন মুসলমানের সমকক্ষ নয়। এটা খুব স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তা’আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই মহানুভবতার দিকে ইশারা করে কুরআন মাজীদে

আয়াত নাযিল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।
আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى ۝ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى ۝ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى ۝ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝ وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ إِنَّ
عَلَيْنَا لِلْهُدَى ۝ وَ إِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَ الْأُولَى ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّى ۝ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ۝ وَ
سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَ لَسَوْفَ
يَرْضَى ۝

‘অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়; এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। আমার দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা। আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে; যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এবং তার উপর কারও কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত। সে সত্ত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।^{৪৮}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই মানবিক আচরণকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে কতই না মুখাপেক্ষী! এতে সারা দুনিয়ায় ইসলামে শত্রুদের দ্বারা হত্যা, নির্যাতন ও অপমানের স্বীকার মুসলমানদের মধ্যে একতা ফিরে আসবে, বিশ্বাসগত শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা সম্ভব হবে।

ছয়। আবু বকর রা.-এর প্রথম হিজরত এবং ইবনুদ দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ

প্রতিনিয়ত নির্যাতনে কষ্ট ও যাতনায় মুসলমানরা যখন অতিষ্ঠ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, আবিসিনিয়া এমন একটি দেশ যেখানে অবিচার নেই। অনেক দুর্বল এবং নিঃস্ব সাহাবীরা এ খবরে স্বস্তি লাভ করে। তারা আবিসিনিয়ার পথে দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য সফরের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও হিজরতের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তার হিজরত করার সিদ্ধান্ত এবং আবিসিনিয়ায় নতুন জীবন শুরু করার আগ্রহে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখন পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ছিল। কুরাইশদের কাছে অন্যান্য সাহাবীদের থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ভালো ছিল। তার গোত্রের লোকেরা তার নিরাপত্তার ব্যাপারে সাহায্য করত। তিনি অন্যান্যদের মতো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তবুও কুরাইশদের অমানবিক অত্যাচার থেকে তিনি বাঁচতে পারেননি (এর আগে আমরা দেখেছি কিভাবে তাকে প্রহার করা হয়েছে। তিনি প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন।)। এজন্য অনেকের মতো তিনিও মক্কা থেকে হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন এবং অন্য কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন, ‘আমি আমার বাল্যকাল থেকেই আমার পিতামাতাকে দীনের অনুসারী বলেই দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক দিন সকাল-বিকাল দু-বার আমাদের বাড়িতে আসতেন। মুসলমানগণ যখন কাফের-মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবিসিনিয়ায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। বারক আল-গিমাদে (মক্কা থেকে পাঁচ দিনের পথ) পৌঁছার পর আল-কোররাহ গোত্র প্রধান ইবনুদ দাগিনার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। (আল-কোররাহ হচ্ছে বনু হাউন ইবনে খুযাইমাহ গোত্রের একটি শাখা দল।) ইবনুদ দাগিনা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আবু বকর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দেশে দেশে ঘুরব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব।’ ইবনুদ দাগিনা বললেন,

হে আবু বকর! আপনার মতো জ্ঞানী-গুণী লোককে দেশ থেকে বহিস্কার করা যায় না এবং এমন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতেও পারে না। আপনি তো দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদেরকে সাহায্য করেন। আত্মীয়তা রক্ষা করেন। অন্যের বোঝা নিজে বহন করেন। মেহমানদেরকে আদর-আপ্যায়ন করান এবং বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম। আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ফিরে এলেন। তার সাথে ইবনুদ দাগিনাও ফিরে আসলেন। সন্ধ্যাবেলা ইবনুদ দাগিনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশী লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে বলেন, ‘আবু বকরের মতো লোককে দেশ থেকে বহিস্কার করা যায় না। ঐ ধরনের লোক স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতেও পারে না। তোমরা কি এমন লোককে বের করে দিতে চাও, যে লোক দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে অর্থ উপার্জন করে দেয়, আত্মীয়তা রক্ষা করে, অন্যের বোঝা নিজে বহন করে, মেহমানদেরকে আদর-আপ্যায়ন করে এবং বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য করে?’

কুরাইশের লোকেরা ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় প্রদান বিষয়ক যিহ্মদারী প্রত্যাখ্যান করল না। ইবনুদ দাগিনাকে তারা বলল যে, তুমি আবু বকরকে বলে দাও সে যেন তার ঘরের মধ্যে নামায আদায় করে এবং যা ইচ্ছা ঘরের মধ্যেই করে। তার কাজ-কর্ম যেন প্রকাশ্যে না করে এবং এতদ্বারা আমাদেরকে যেন বিব্রত না করে। কারণ আমরা আশঙ্কা করছি যে, আমাদের নারী ও শিশুরা তাতে বিভ্রান্ত হতে পারে। ইবনুদ দাগিনা এসব আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল। এভাবেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে অবস্থান করছিলেন। নিজ ঘরের মধ্যে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করতেন। সশব্দে নামায আদায় করতেন না। নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যত্র কুরআন পাঠ করতেন না।

এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে নতুন ভাবের উদয় হয়। তার ঘরের পাশে তিনি একটি মসজিদ তৈরি করেন। ঐ মসজিদে তিনি নামায পড়তে এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তাকে দেখে মুশরিক নারী ও শিশুরা অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং ক্রন্দনকারী মানুষ। কুরআন পাঠের সময় তিনি তার অশ্রু থামিয়ে রাখতে পারতেন না। এ অবস্থা দেখে কুরাইশী সম্ভ্রান্ত লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠায়।

ইবনুদ দাগিনা তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, ‘হে ইবনুদ দাগিনা! তোমার আশ্রয়ে আবু বকরের অবস্থান আমরা মেনে নিয়েছিলাম এই শর্তে যে, সে তার ঘরের মধ্যে তার প্রতিপালকের ইবাদত করবে। এখন সে ঐ শর্ত লঙ্ঘন করেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণে সে একটি মসজিদ তৈরি করেছে। সেখানে সে প্রকাশ্যে নামায আদায় করে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, তাতে আমাদের নারী ও ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত হবে। তুমি তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বল। তার ঘরের মধ্যে থেকে সে যদি নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে রাজি থাকে, তবে সে তা করবে।

আর সে যদি প্রকাশ্যেই তা করতে চায়, তবে তুমি তাকে বলে দাও তোমার আশ্রয়ে থাকাজনিত যিম্মাদারী সে যেন ফিরিয়ে দেয়। তোমার আশ্রয় প্রদানের যিম্মাদারী আমরা অমর্যাদা করতে চাই না। অন্যদিকে আবু বকর প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে সে সুযোগও আমরা তাকে দিতে পারি না।’

এ কথা শোনার পর ইবনুদ দাগিনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলেন, ‘হে আবু বকর, আপনি তো জানেন, কুরাইশগণ আপনার প্রতি কী শর্ত আরোপ করেছিল। আপনি হয় ঐ শর্ত মোতাবেক আপনার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখবেন, নতুবা আমার আশ্রয়দান জনিত যিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিবেন। কারণ, কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার পর ঐ যিম্মাদারী পালনে আমি ব্যর্থ হয়েছি আরবরা এমন কথা শুনুক ও বলাবলি করুক আমি তা পছন্দ করি না।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘আমি বরং তোমার যিম্মাদারী তোমার নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।’

এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আর ইবনুদ দাগিনার নিরাপত্তায় ছিলেন না। তিনি কাবাগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানে তার সাথে কুরাইশের এক অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাথার উপর দুর্গন্ধময় ময়লা নিক্ষেপ করে। তখন তিনি ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে তিনি বললেন, ‘তুমি কি দেখ নাই এই মূর্খ আমার সাথে কি আচরণ করেছে?’ ওয়ালিদ বলল, ‘এর জন্য তুমিই দায়ী (তুমি ধর্মত্যাগী হওয়ার কারণেই তোমার আজ এই অবস্থা)।’ তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনবার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন, ‘হে প্রতিপালক! আপনি কতই না ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল!’

শিক্ষা এবং উপদেশ

১। এ ঘটনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুদ দাগিনা কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরের জীবনীর দিকে তাকাবেন, তাদের পক্ষে ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কার কাফেররা তার সাথে কি ব্যবহার করত, সেটা ধারণা করা সম্ভব হবে না। তারা হয়তো মনে করবেন যে, কুরাইশদের সমাজে তার তেমন কোনো মর্যাদাবান অবস্থান ছিল না। আসলে বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি মক্কায় একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্য সব সম্ভ্রান্ত নেতারা তাকে পছন্দ এবং সম্মান করত। এজন্য ইবনুদ দাগিনা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আপনার মতো একজন সম্ভ্রান্ত এবং সচ্চরিত্রবাণ ব্যক্তির পক্ষে দেশ ত্যাগ করা অথবা আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা, কোনোটাই উচিত নয়। কারণ আপনি গরিবদের সাহায্য করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখেন, অভ্যাগত মেহমানদের সেবা করেন এবং অন্যের ভাগ্যের পরিবর্তনে সহায়তা করেন।’ এটা প্রমাণ করে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ক্ষমতা ও সম্মান তালাশ করেননি। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটা এমন এক লক্ষ্য যার জন্য তিনি তার নিজের মাতৃভূমি, পরিবার এবং সম্পদ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। যাতে তিনি পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে পারেন এবং কোনো নির্যাতনের আশঙ্কা না করে নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। আল্লাহ আবু বকর এবং অন্যান্য সকল সাহাবীর উপর রাজি হয়ে যান।

২। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের মূল আকর্ষণ অথবা ভিত্তি ছিল কুরআন। তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন, তার অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতেন এবং তার উপর আমল করতেন। কুরআনের সাথে এই সংশ্লিষ্টতা তার ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কুরআনের সাথে সম্পর্কের কারণেই

তার মধ্যে বাগীতা, গভীর চিন্তা এবং যুক্তির আলোকে ইসলামের শিক্ষাকে উপস্থাপন করার এক অসাধারণ যোগ্যতার সৃষ্টি হয়। কুরআন আল্লাহর কালাম। তিনি ভালো করেই জানেন, তার কালাম দিয়ে কিভাবে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে হবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দিন-রাত কুরআন পড়তেন। কুরআনে শেখানো পদ্ধতির সঠিক অনুসরণ করার ফলে তিনিও মানুষের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করার হেকমত আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। এজন্য দেখা যায় যে, তার হাতে অনেকে মুসলমান হয়েছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কুরআনের সাথে যে সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেখান থেকে বর্তমানে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় তার চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরত। এই কান্নাই প্রমাণ করে তার কুরআন বোঝার পাণ্ডিত্য এবং তার অন্তঃকরণের গভীর বিশ্বাস। মানুষ দুই কারণে কাঁদে। এক, সে হয়তো খুব করুণ অবস্থার স্বীকার। দুই, সে হয়তো খুব বেশি আনন্দিত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সত্যিকার আদর্শ মুসলমান। তার মধ্যে এ দু-টি অবস্থাই কাজ করত। প্রথমত, তিনি খুব খুশি ছিলেন এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সঠিক সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, সঠিক সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুতির ভয় এবং অতীত গোনাহের কারণে তিনি দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতেন। আর কুরআন প্রতিনিয়তই একজন সত্যিকার বিশ্বাসীকে আমলের হিসাব, আখেরাতে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ কথাগুলো স্মরণ করে তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি নিজের চোখে পানি ধরে রাখতেন না। তার কান্নার কারণে তার আশে-পাশে যারা থাকত, তারাও কাঁদত। এজন্যই মুশরিক কুরাইশ নেতারা তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ব্যপারে ভয় করত। তারা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াত শুনত, তার চারপাশে জমায়েত হতো। এর ফলে কুরাইশ নেতারা নিশ্চিতভাবে এ আশঙ্কার করল যে, এতে তাদের পরিবার-পরিজন মুসলমান হয়ে যাবে!

সারাজীবন কুরআনের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক সত্যিই বিস্ময়কর! তিনি কুরআন হিফজ করেছেন, তার অর্থ হৃদয়াঙ্গম করেছেন এবং তার শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি কখনই না জেনে কুরআন নিয়ে কথা বলতেন না। যদি কেউ কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ জানতে চাইত, তিনি যদি সেটা জানতেন, তাহলে বলতেন। আর যদি জানা না থাকত, তাহলে জবাব দিতেন, ‘কোন জমিন আমাকে বহন করবে আর কোনো আকাশ আমাকে ছায়া দিবে যদি আমি কুরআনের আয়াতের অর্থের ব্যাপারে এমন কিছু বলি যা আল্লাহ বোঝাতে চাননি!’

তদুপরি তিনি যদি কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের অর্থ বুঝতে সক্ষম না হতেন, তবে তিনি তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করতেন। আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন,

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।^{৪৯}

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে মন্দ কাজ করেনি?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতে মন্দ কাজের জন্য নিশ্চিত আযাবের ভয় পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জবাব দিলেন, ‘তুমি কি ক্লান্ত হও না? তুমি কি দুঃখিত হও না? তুমি কি মন্দ পরিণামের জন্য দুর্ভোগ সহ্য কর না?’ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

জানালেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর ঈমানের উপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কর না, চিন্তা কর না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।^{৫০}

এখানে যারা বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যারা আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ডান-বামে যায় না। মানে তারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্য কারও দিকে রুজু হয় না। অন্য কারও কাছ থেকে ভালোবাসা, ভয় এবং কিছু আশা করে না - সাহায্য চায় না, বিশ্বাসও করে না। এগুলোরী- তারা কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আশা করে। তারা শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসে। তার সাথে কারও শরীক করে না। যদি তারা কোনো বিপদ থেকে সাহায্য আশা করে, তখন তারা কেবল তার কাছেই প্রার্থনা করে। তারা দুনিয়াতে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, সে যত বড়ই হোক। তারা অন্তঃকরণে কেবল তার কাছেই সাহায্য চায়।

আল্লাহর পথের দাঈগণের উচিত সারাক্ষণ কুরআনের সান্নিধ্যে থাকা, কুরআন তিলাওয়াত করা, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, কুরআনের গুপ্ত রহস্য ও মর্মার্থ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। কুরআনের মধ্যে ভাষাগত, জ্ঞানগত ও শরীয়তের বিধানগত মানুষকে অক্ষম করে দেওয়ার যে শৈলী রয়েছে, তা লোকদের

সামনে প্রকাশ করা। তাছাড়া কুরআনের মধ্যে যুদ্ধ, পারস্পর কলহ-বিবাদে মাধ্যমে যে মানবতা নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তা থেকে মুক্তি লাভের যে রাস্তাগুলো রয়েছে, তা যুদের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করাও জরুরী। সময়ের প্রেক্ষাপটে দাওয়াত প্রদানের কলা-কৌশলগুলো আয়ত্ত্ব করা প্রয়োজন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সে সময়ে কুরআন প্রকাশ্যে তিলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যকর পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাত। আরব প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ

যখন মক্কায় মুসলমানদের অবস্থা খুব শোচনীয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি এমন একটি গোত্রের সন্ধানে ছিলেন যারা তাকে এবং তার সাহাবীদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং ইসলামকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে। তিনি তায়েফের নেতাদের মন জয় করতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখান করে এবং চরমভাবে অপমান করে। তারা তাকে তায়েফ থেকে বের করে দেয় এবং এ কাজে ছোট শিশু এবং নরাধমদের লেলিয়ে দেয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের মৌসুমকে কাজে লাগান। এ সময় তিনি বিভিন্ন আরব গোত্রের দলপতিদের সাথে দেখা করেন। তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাদের মধ্যে ইসলামের পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা করার মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করেন। এ সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সফলভাবে রাসূলকে এ কাজে সাহায্য করেন। কারণ তিনি ছিলেন আরবদের বংশানুক্রম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞ। এজন্য তিনি এসব গোত্রের ভালো-মন্দ জানতেন। তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণে রাসূল প্রতিটি গোত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতেন যা তাকে তাদের সাথে কথোপকথনে

অকল্পনীয় সাহায্য করেছে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারা আরবে এবং আরবের বাইরে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে উত্তম গোত্র পছন্দ করতে সহায়তা করেছিল।

আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘যখন আল্লাহ তা’আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরব গোত্রদের কাছে ইসলাম প্রচারের আদেশ করলেন, তখন তিনি তাদের কাছে গেলেন। আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা এক গোত্রের কাছে গেলাম যাদের মধ্যে গাষ্ঠীর্ষ এবং শান্তভাব বিরাজ করছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা কারা?’ তখন একজন বলল (যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল), ‘শাইবান ইবনে আবু ছালাবাহ গোত্রের লোক।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, ‘আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। এরা খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাদের মধ্যে মাফরুক ইবনে আমর, হানী ইবনে কাবীসা, মুসান্না ইবনে হারিসাহ এবং নূমান ইবনে শরীক আছেন। তিনি একজন ভালো বক্তা এবং ভদ্র। তার চুলের বিনুনির দু-টি অংশ বুকের উপর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। সব লোকের মধ্যে সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে কাছে বসা ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা কতজন?’ মাফরুক জবাব দিল, ‘আমরা সংখ্যায় এক হাজারের চেয়ে বেশি হব। এক হাজার সদস্যের কোনো দল সংখ্যা স্বপ্নতার কারণে পরাজিত হয় না।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা কেমন শক্তিশালী (যুদ্ধে)?’ মাফরুক জবাব দিলেন, ‘আমরা শত্রুর দেখা পেলে সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হই। আর আমরা রাগান্বিত হলে মরণপণ যুদ্ধ করি। আমরা শিশুদের চেয়ে ভালো ঘোড়া এবং অধিক দুগ্ধ দানকারী উটনী থেকে অস্ত্র বেশি পছন্দ করি। যুদ্ধে জয়ের ব্যাপারটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি কখনো এটা আমাদের অনুকূলে দেন আবার কখনো বিপক্ষে। সম্ভবত, তুমি কুরাইশদের

ভ্রাতা?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, তার খবর যদি তোমাদের কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে খুবই সুসংবাদ। তিনিই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।’ তখন মাফরুক বলল, ‘হে কুরাইশদের ভ্রাতা! আপনি আমাদেরকে কিসের দিকে আহ্বান করেন?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ادْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِلَى أَنْ تُؤْوُونِي وَتَنْصُرُنِي فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ تَطَاهَرَتْ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ وَاسْتَغْنَتْ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, তোমরা এটা স্বীকার করবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো শরীক নেই এবং আমি তার দাস এবং রাসূল। আমি এদিকেও তোমাদের আহ্বান করি, তোমরা যেন আমাকে আশ্রয় দাও এবং আমাকে সাহায্য কর। বস্তুত কুরাইশরা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছে এবং তার প্রেরিত রাসূলের উপর অবিশ্বাস করেছে। সত্য জানার পরও তারা মিথ্যা আঁকড়ে আছে। আর আল্লাহ সবচেয়ে অমুখাপেক্ষী, সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত।

মাফরুক বললেন, ‘হে কুরাইশদের ভ্রাতা, আর কিসের দিকে আপনি আহ্বান করেন? আল্লাহর কসম, এর চেয়ে ভালো কোনো কথা আমি আগে শুনিনি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর নিচের আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আপনি বলুন, এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার কর না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা কর না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিয়িক দিয়ে থাকি, প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে হোক অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা কর না। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।^{৫১}

মাফরুক বলল, ‘আল্লাহর কসম, আপনি সবচেয়ে উন্নত চরিত্র এবং উত্তম আমলের দিকে আহ্বান করেছেন। যারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছে তারা চরম মিথ্যুক এবং পথভ্রষ্ট।’ তারপর মাফরুক সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টাকে হানি ইবনে কাবিসার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, ‘তিনি হচ্ছেন হানি, আমাদের নেতা। ধর্মীয় বিষয়ে আমরা তার সিদ্ধান্তেই চলি।’ তারপর হানি বললেন, ‘হে কুরাইশদের ভ্রাতা, আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু এক বৈঠকে আলোচনার পরই, যার পূর্বে কোনো আলোচনা হয়নি এবং যার পরেও কিছু হবে না, যদি আমরা আমাদের ধর্ম ছেড়ে আপনার ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সেটা হবে খুবই লজ্জার। পরিণাম না ভেবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারি না। তাড়াহুড়ো পথভ্রষ্টতার সহগামী। আর আমরা যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া পছন্দ করি না। এজন্য আমরা এখন (আমাদের স্বজাতির কাছে) ফিরে যাব এবং আপনারাও ফিরে যাবেন। তারপর আমরা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব।’

হানি এ পর্যন্ত বলার পর থামলেন। মনে হয় তিনি মুসান্না ইবনে হারিসাহর মতামত চাচ্ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তিনি হচ্ছেন মুসান্না, আমাদের শায়েখ। যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি আমাদের দায়িত্বে থাকেন। মুসান্না (যিনি পরে ইসলাম কবুল করেছিলেন) বললেন, ‘হে কুরাইশ ভ্রাতা, আমি আপনার সব কথা শুনেছি। আমাদের ধর্ম ছেড়ে আপনার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং আপনাকে মেনে চলার ব্যাপারে হানি যা বলেছে, তাই আমার মত। আমাদের আবাসস্থল হচ্ছে দুই জনপদের মাঝখানে। একদিকে ইয়ামামাহ এবং অন্যদিকে সিমামাহ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই দু-টি মালভূমি কি?’ মুসান্না বললেন, ‘এর একটি হলো, স্থলভাগের উঁচু ভূমি ও আরবের স্থলভাগ। আরেকটি হলো, পারস্য (ইরান)-এর ভূমি ও কিসরার নদ-নদী বেষ্টিত এলাকা। বর্তমানে আমরা কিসরার সাথে চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিসরা আমাদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছে যে, আমরা যেন কোনো প্রবর্তক গ্রহণ না করি এবং আমরা নতুন কোনো কিছু না ঘটাই। আমরা কাউকে আশ্রয়ও দিতে পারব না। হে কুরাইশদের ভ্রাতা, আমার মনে হচ্ছে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছেন, এটা কিসরার বাদশা পছন্দ করবে না। আপনি যদি চান, আপনাকে আমরা আরব স্থলভাগের এলাকায় আশ্রয় দিতে পারি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

তোমরা কোনো মন্দ জবাব দাওনি। বরং তোমরা বাস্তবভিত্তিক কথাই বলেছ। অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা তার ধর্মকে এমন এক সম্প্রদায়কে দিয়ে সাহায্য করবেন, যারা সবদিক থেকেই এটাকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, যদি সামান্য সময় আল্লাহ তা’আলা তোমাদেরকে পার্সিয়া দেশ ও বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদের নারীদেরকে ভোগ করার সুযোগ দেন, তাহলে কি তোমরা আল্লাহর গৌরব বর্ণনা করবে, তার ইবাদত করবে এবং মহত্ব বর্ণনা করবে?

নোমান ইবনে শারিক বললেন, ‘হে আল্লাহ, তোমার পক্ষে এটা খুবই সম্ভব।’

শিক্ষা এবং উপদেশ

১। অন্য যে কোনো সাহাবী থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বেশি খেদমত করতে পেরেছিলেন। রাসূলের সাথে তার সার্বক্ষণিক অবস্থান ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। ইসলামী দাওয়াতের স্বভাব ও মেজাজ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি অনেক দিক দিয়ে আল্লাহর নেয়ামতে ধন্য ছিলেন। সম্পদ, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা—এসবই তার ছিল। ইতিহাসে এরকম অনেককেই পাওয়া যাবে যাদের এ যোগ্যতাগুলো ছিল। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবার থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তিনি কিছুই নিজের জন্য রাখেননি। সব কিছু উজার করে দিয়ে ইসলামের খেদমত করেছেন। তার যে সম্পদ ছিল, তা তিনি গরিবদেরকে সাহায্য এবং মুসলমান গোলামদেরকে আযাদ করার কাজে ব্যয় করতেন। উপরের ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতেন। তার সুন্দর আচরণ ও প্রজ্ঞা দিয়ে বিদেশী প্রতিনিধি দলের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের ভালো-মন্দ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তথ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার মিশনে সহায়তা করেছেন।

২। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের অজ্ঞাতসারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই থাকতেন। এ সময় তিনি বিদেশী নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য আরব গোত্র প্রধানদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

এবং কিরকম হেকমত প্রয়োগ করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে, তা শেখার ও জানার এক পরম সুযোগ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য সাধারণ কাউকে খোঁজ করছিলেন না। এমন কোনো গোত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন না যে অন্য কোনো পরাশক্তির সাথে বিভিন্ন সন্ধি-চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ। বিশেষ করে এমন কোনো শক্তি যে ইসলামের আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং নিকট ভবিষ্যতে মুসলমান জাতি ও ইসলামের ধ্বংস করতে উদ্যত হবে। মূলত, বনু শাইবার সঙ্গে এমন এক দেশের সাথে চুক্তি ছিল যারা তাদের চেয়ে দুর্বল অথবা সমকক্ষ কোনো জাতি ছিল না। হয়তো তাদের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী জাতি হলেও হতো। তাও না। বরং তারা ঐসময়ের এক চরম শক্তিশালী জাতি, পারস্য সম্রাটের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। এজন্য কোনোভাবেই আংশিক নিরাপত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উপযুক্ত সমাধান ছিল না। যদি কোনো কারণে পারস্য সম্রাট মুসলমানদেরকে আয়ত্তে আনতে অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে কোনো সৈন্যদল পাঠায়, তখন বনু শাইবার গোত্রের লোকেরা পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে রাজি হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধও করবে না।

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য আল্লাহ এমন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে করবেন যারা তার দ্বীনকে সবদিক থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম’— এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে মুসান্না ইবনে হারিসাহকে জবাব, যখন সে ইরানের অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আয়ব অঞ্চলের পানির ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি দূরদর্শী রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা রাখে, সে বুঝতে পারবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরূপ দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন।

৩। সত্যিকার অর্থে, শেষ পর্যন্ত বনু শাইবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় প্রদান করেনি। তবুও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খুব সঠিকভাবে, সম্মান ও যৌক্তিকতার সাথে আচরণ করেছে যা আরবদের অন্যান্য গোত্রে পাওয়া যায়নি। বনু শাইবা গোত্রের নেতৃবৃন্দ অকপটে তাদের সত্যিকার শক্তি-সামর্থ্যের কথা তুলে ধরেছে। তারা তাদের দুর্বলতা লুকানোর পরিবর্তে নিজেদের দুর্বল ও সংবেদনশীল বিষয়গুলোর সাথে সশ্রুটের প্রভাব সম্পর্কে ধীর-স্থিরভাবে প্রকাশ করেছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল, এ ঘটনার দশ বছর বা তার কিছু বেশি সময় পরে এই বনু শাইবা গোত্রই ইসলাম কবুল করে তারা যে সশ্রুটের ভয়ে এক সময়ে প্রকম্পিত ছিল, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় মুসান্না ইবনে হারিসাই ইরাক বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। পারস্যের বিরুদ্ধে এই বনু শাইবা গোত্রই সবচেয়ে বেশি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। যখন তারা অমুসলিম ছিল, তারা পারস্য সশ্রুটকে ভীষণ ভয় পেত। এত বেশি ভয় পেত যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা কখনো তারা কল্পনাও করেনি। এই সশ্রুটের ভয়েই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে মেনে নিতে পারেনি যদিও তারা এ আহবানের সত্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিল না। এখানে আমরা ইসলামের বড়ত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি যে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন, তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আখেরাতে জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।



তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে আবু বকর রা.-এর মদীনায হিজরত

যতই দিন যাচ্ছে, কুরাইশরা ততই মুসলমানদের উপর আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে। এজন্য কিছু মুসলমান দু-একবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। অন্যরা কুরাইশদের নির্যাতনে অসীম ধৈর্যধারণ করে টিকে আছেন। মুসলমানদের জীবন যখন চরম দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনায হিজরতের সুসংবাদ আসে। মদীনায ইতিমধ্যে অনেকে মুসলমান হয়েছেন এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ এবং তার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তখন মুসলমানরা, অনেকে ব্যক্তিগতভাবে, অনেকে ছোট ছোট কাফেলায়, মদীনায হিজরত করা শুরু করলেন। এ সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘তুমি তাড়াহুড়ো কর না। সম্ভবত আল্লাহ তা’আলা তোমাকে একজন সঙ্গী মিলিয়ে দিবেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন অথবা কমপক্ষে এ আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই মদীনায হিজরত করবেন। উপরোক্ত কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকেই ইশারা করেছেন। আর তখন থেকেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে মদীনায হিজরত করার সার্বিক পরিকল্পনা জানার জন্য অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করতেন। এ সময় তিনি আগত সফরের জন্য দু-টি উট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। একটি উট তার নিজের জন্য, আরেকটি তার সঙ্গীর জন্য। সঙ্গী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন, এ আশাই করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা এবং এর অধিবাসীদের ছেড়ে হিজরত করার অনুমতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার, হয় সকালে না হয় সন্ধ্যায়, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে আসতেন। যেদিন হিজরতের অনুমতি পেলেন, সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে এলেন। এমন সময় তিনি কখনো আসতেন না। তাকে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় কিছু একটি ঘটেছে। তা না হলে এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতেন না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে প্রবেশ করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খাটের একদিকে সরে গিয়ে রাসূলকে বসার জায়গা দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসলেন। তখন বাড়িতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমি এবং আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার এখানে অন্য যারা আছে, তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে? আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ আমাকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমিও কি সঙ্গে যেতে পারব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারবে।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, আমি সেদিনের আগে জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও এত কাঁদতে পারে। আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেদিন কাঁদতে দেখেছি।

অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, এই দেখুন, আমি এই দু-টি উট এই কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।’ তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উরায়কাতকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য ভাড়া করেন। তিনি ছিলেন বনু আদ-দাইল ইবনে বকর গোত্রের। তার মা ছিল বনু সাহম ইবনে আমর গোত্রের। আব্দুল্লাহ ইবনে উরায়কাত ছিলেন মুশরিক, তবে বিশ্বাসভাজন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উটগুলোকে তার হাতে ন্যাস্ত করলেন যেন সে এগুলোকে প্রস্তুত রাখে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য)।’

বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, ‘একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবু বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার আগমন বার্তা শুনে বললেন, ‘আমার মাতাপিতা তার প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই আসছেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ

দু-টি উট থেকে আপনি যে কোন একটি গ্রহণ করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '(ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমরা তাদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কোমরবন্দের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারনেই তাঁকে 'জাতুন নিতাকাইন' (কোমরবন্ধ বিশিষ্ট) বলা হতো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু (রওনা হয়ে) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তারা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে মক্কায় রাত যাপনকারী কুরাইশদের সাথে ভোর বেলায় মিলিত হতেন এবং তাদের দু-জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হতো তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন।

যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত, তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা তাদের কাছেই দুখালো বকরীর পাল চড়িয়ে বেড়াত। রাত্রে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাদের নিকটে যেত এবং তারা দু-জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তারা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইবনে ফুহাইরা বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে এরকমই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনী আবদ ইবনু আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন যিনি ছিলেন একজন দক্ষ গাইড। পারদর্শী পথ প্রদর্শককে 'খিরীত' বলা হয়। আস ইবনে ওয়াইল আসসাহমীর পরিবারের সাথে তার মৈত্রী চুক্তি ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তারা উভয়ে

তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাদের উট দু-টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রে পরে সকালে উট দু-টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। সে যথাসময়ে তা হাজির করল। আমির ইবনে ফুহাইরা ও পথ প্রদর্শক তাদের উভয়ের সঙ্গে চলল। পথ প্রদর্শক তাদের নিয়ে সমুদ্র উপকূল পথ ধরে চলতে লাগল।

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার পরিবার ছাড়া অন্য কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের খবর জানত না। যখন নির্দিষ্ট সময় এল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি থেকে পেছনের ছোট দরজা দিয়ে বের হয়ে যান। এ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের ব্যাপারে সম্ভাব্য সব গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। কুরাইশরা যেন তাদের অনুসরণ করতে না পারে এবং এই বরকতময় সফরকে বিঘ্নিত করার কোনো সুযোগ না পায়। তিন রাত সাওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানের পর তাদের সাথে গাইড আব্দুল্লাহ ইবনে উরায়কাত এর সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার হাযওয়ারা এলাকায় একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি থামলেন এবং বললেন,

আল্লাহর শপথ, তুমিই আল্লাহর সবচেয়ে পবিত্র ভূমি এবং আল্লাহর জমিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের করে দেওয়া না হতো, তাহলে আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সাওর পাহাড়ে উপনীত হয়েছিল। এখানে পৌঁছে তারা দ্বিধায় পড়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপরে উঠে চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর

রাযিয়াল্লাহু আনহু যে গুহায় লুকিয়ে ছিলেন, কাফেররা তার দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। সেখানে তারা মাকড়সার জাল দেখতে পায়। এটা দেখে তারা বলে, এখানে যদি মুহাম্মাদ প্রবেশ করে তাহলে তো মাকড়সার জাল এমন অক্ষত থাকার কথা না।' আল্লাহর সৈন্য বাহিনী মিথ্যার বিরুদ্ধে এবং সত্যের জন্য কাজ করে। এরকম একজন সৈন্যের ভয়াবহতা তার আকৃতি দেখে বোঝা যাবে না। যেমন এখানে মাকড়সা। আর ছোট পাখি আবরাহার হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি ছোট একটি ভাইরাস একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।^{৫২}

সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের পাশাপাশি মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কোনোভাবেই এ সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বরং তিনি পুরোপুরি আল্লাহর সাহায্য এবং সহায়তার উপরই বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন। এর সাথে অনবরত সেই দু'আ পড়ছিলেন যা আল্লাহ তা'আলা তাকে শিখিয়েছিলেন :

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

বলুন, হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।^{৫৩}

^{৫২} সূরা আল-মুদাসসির, ৭৪:৩১।

^{৫৩} সূরা আল-বনী ইসরাঈল, ১৭:৮০।

যখন মুশরিকরা গুহার চারিদিকে জড় হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরে বলেছেন, আমি যখন গুহায় ছিলাম, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, তাদের কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, ‘হে আবু বকর! ঐ দু-জন সম্পর্কে তুমি কি ধারণা কর যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ?’ আরেক বর্ণনায় এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘শান্ত হও, হে আবু বকর! আমরা দু-জন। আর তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ।’

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন দু-জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত, আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{৫৪}

সওর গুহায় তিন রাত থেকে পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। কয়েকজন মুশরিক তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাদের অনেকের ধারণা ছিল, তিনি ইতিমধ্যে তাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু দাইল গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে উরায়কিতকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করা হয়েছিল। যদিও সে মুশরিক ছিল, তথাপি তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বাস ছিল। তাকে তাদের উটগুলো দিয়ে রেখেছিলেন এবং সে যথাসময়ে তিনদিন পর গুহার সম্মুখে এসে হাজির হয়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে একটি অপরিচিত এবং অব্যবহৃত পথে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয় যাতে মক্কার কুরাইশ কাফেররা সহজে পাকড়াও করতে না পারে।

মদীনায় যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুদাইদ পল্লীতে উম্মে মা'বাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পুরো নাম আতিকাহ বিনতে কা'ব আল-খুজাইয়াহ। আর কুদাইদ এলাকায় খুযাইয়া গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। উম্মে মা'বাদের ভাইয়ের নাম হুবাইশ ইবনে খালিদ আল-খুজাই। তিনিই উম্মে মা'বাদের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার থেকে এ ঘটনা অনেকেই বর্ণনা করেছেন। এজন্য অনেক হাদীস গ্রন্থে এটা স্থান পেয়েছে। উম্মে মা'বাদের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন, 'তার ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং অনেক সূত্র ধরেই এটি বর্ণিত হয়েছে যেখানে সূত্রগুলোর একটি অন্যটিকে আরও শক্তিশালী করেছে।'

মক্কার বিভিন্ন সমাবেশে কুরাইশ সর্দাররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মৃত অথবা জীবিত) সন্মানদাতার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিল। এটা কোনো সামান্য পুরস্কার ছিল না। এক শত উটের ওয়াদা করা হয়েছিল। তখনকার আমলে এটা অনেক বড়

সম্পদ বিবেচিত হতো। এ ঘোষণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মক্কা শহরের বাইরে বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে এ খবর প্রচারিত হলো। সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম এই খবর পেয়ে যে কোনো উপায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজে বের করার দৃঢ় সংকল্প করল। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করবে, এটাও স্থির করে নিল। সে কেবল একাই এই পুরস্কারের লোভে রাসূলকে খুঁজছিল তা নয়। বরং অনেকেই এ শিকারে নেমেছিল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় যে তিন দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা খুব সঠিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সুরাকা যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্তপিপাসু ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর কুদরত (যাকে কোনো পরাস্তকারী পরাস্ত করতে সক্ষম নয়) সুরাকাকে রাসূলের নিরাপত্তাদানকারী বানিয়ে দিল। অথচ সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিহতকারী ও বিরুদ্ধবাদী।

এদিকে মদিনায় মুসলমানগণ শুনলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তারা প্রত্যহ সকালে মদিনার (বাইরে) হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করে থাকতেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে আসতেন। মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকা আল-হাররা পাথুরে এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইহুদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইহুদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এই তো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি—যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলমানগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদিনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডান দিকে মোড়

নিয়ে বনী আমর ইবনু আউফ গোত্রের অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরব রইলেন। আনসারদের মধ্য থেকে যারা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে সমবেত হতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রোত্তাপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পড়তে লাগল এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে তার চাঁদর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ছায়া করে দিলেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারল।

এদিন খুব সুখ ও আনন্দের ছিল। এরকম দিন মদীনার ইতিহাসে আর আসেনি। লোকজন এদিনে উত্তম পোষাক পরে জাতীয় উৎসবে মেতে উঠেছিল। সত্যিই এদিন ছিল প্রাণোচ্ছল উৎসবের দিন। এদিনই ইসলাম মক্কার সীমিত গণ্ডি ছেড়ে মদীনার বিশাল ভূখণ্ডে আগমন করেছে। মক্কার ভূমি সংকীর্ণ ছিল না। সংকীর্ণ ছিল তার অধিবাসীরা। আর মদীনার ভূখণ্ড বিশাল ছিল এজন্য যে, কিয়ৎকাল পরেই ইসলাম মদীনা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার অধিবাসীরা খুব আগ্রহের সাথে আল্লাহর পরম অনুগ্রহকে তাদের উপর বরণ করেছিল। তারা খুব খুশি ছিল এই ভেবে যে, ইসলামের কল্যাণে তাদের ভূমি উৎসর্গ হবে। এই অনুগ্রহের কথা বুঝতে পেয়েই তারা তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে আনন্দ-উৎসবে মেতেছিল। তারা সমস্বরে কোরাস গাইছিল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর রাসূল।’ অকৃত্রিম ভালোবাসায় এই বরণ উৎসব শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসায় গেলেন এবং সেখানে অতিথি হলেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খারিজাহ ইবনে যায়েদ খাযরাযি আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসায় অতিথি হলেন।

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীর মদীনায হিজরত শেষ হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে হিজরতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমাপ্তি হয়নি। মদীনায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপদে পৌঁছার পর থেকেই চারিদিকে ইসলামের সুবাতাস বইতে শুরু করে। তার মদীনায আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলামী দাওয়াতের একটি পর্ব শেষ হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি পর্বের সূচনা হয়। হিজরতের একটি উদ্দেশ্য ছিল একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। মদীনায এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি সভ্য এবং উন্নত রাষ্ট্র গঠন করেন যার ভিত্তি ছিল বিশ্বাস, ধার্মিকতা, মহানুভবতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। এ কারণেই এই নতুন রাষ্ট্র শীঘ্রই সমসাময়িক দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল।

সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ছিল ব্যতিক্রম। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে মুসলমান জাতির লাগাম ধরতে পারেন যখন তিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ধীর-স্থিরভাবে প্রতি মুহূর্তে একজন আদর্শ মানুষ এবং মুসলমান হিসেবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করছিলেন। এই প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি হয় হিজরতের মাধ্যমে যেখানে তিনি একাই তার সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

শিক্ষা এবং উপদেশ

প্রথমত, আল্লাহ বলেন,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ

سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَآيِدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন দু-জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত, আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{৫৫}

এ আয়াত থেকে সাতটি কারণে অন্যান্য সাহাবীদের থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায়।

এক। অবিশ্বাসীরা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মক্কা ছেড়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা তাকে যখন বাধ্য করেছে, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা ছাড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তাকে কাফেররা বহিস্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু-জনের একজন।’ দু-জন বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মদীনায হিজরত করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গী হিসেবে ছিলেন।

দুই। রাসূল সা.-এর মদীনায হিজরতের সময় আবু বকর রা. একমাত্র সঙ্গী ছিলেন

সকল সাহাবীই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সময় তার সফরসঙ্গী হয়ে দুর্লভ সম্মান লাভ করার আগ্রহ লালন করতেন। কিন্তু শুধুমাত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি ছিলেন, ‘দু-জনের একজন’ এবং সেখানে তৃতীয় কেউ ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনে যেখানেই তার সাথে কেবল একজন বিশিষ্ট সাহাবী সঙ্গী হিসেবে থেকেছিলেন, এই সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। যেমন, মদীনায হিজরতের সময়, বদরের যুদ্ধে রাসূলের সাথে কমান্ড সেন্টারে, বিভিন্ন বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময় ইত্যাদি।

তিন। তিনি রাসূল সা.-এর সঙ্গে গুহায় সঙ্গী ছিলেন

উপরের আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গুহায় সঙ্গী হিসেবে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত সাহাবী ছিলেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমি যখন গুহায় ছিলাম, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, তাদের কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাদের দেখে ফেলবে।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, ‘হে আবু বকর! ঐ দু-জন সম্পর্কে তুমি কি ধারণা কর যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?’ আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘শান্ত হও, হে আবু বকর, আমরা দু-জন। আর তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ।’

চার। আক্ষরিক অর্থে তাকেই রাসূলের সঙ্গী বলা হয়েছে

আল্লাহর বাণী ,

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা এই যে, ‘তখন তিনি আপন সঙ্গীকে (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) বললেন।’ এ আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, তিনি কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গুহায় সঙ্গী ছিলেন এমন নয়, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারাজীবনে সবসময় তাকে সাহায্য এবং তার জন্য আত্মোৎসর্গের জন্য নিবেদিত ছিলেন যা অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তার অনেক বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যাতে অন্য সাহাবীগণ শরীক ছিলেন না। এর মধ্যে এটা একটি যে, আল্লাহ তাকে **صاحب** বা সঙ্গী বলেছেন।

পাঁচ। তিনি রাসূল সা.-এর সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য সতর্ক ছিলেন

বর্ণিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য খুবই সতর্ক ছিলেন। কিভাবে? রাসূল তাকে বলেছেন, চিন্তিত (দুঃখিত অথবা ভীত) হয়ো না। এখান থেকে এটা বোঝা যায় যে, গুহায় অবস্থানের সময় রাসূলের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীত এবং চিন্তিত ছিলেন। এখানে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি রাসূলের জন্য ভীত এবং চিন্তিত ছিলেন? এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি নিজের জন্য ভীত এবং চিন্তিত ছিলেন না। তার সারা জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন হলে তিনি এক মুহূর্তও দেরি করতেন না। এজন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। এটা পরীক্ষার যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ভীত এবং চিন্তিত ছিলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভয়াবহ অবস্থার জন্য চিন্তিত ছিলেন, আর ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, পরিস্থিতিতে শত্রুরা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে এবং তখন কুরআন নাযিল হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে!

একই কারণে মদীনায় হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যাতে কেউ হঠাৎ

আক্রমণ করতে না পারে। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো রাসূলের আগে আগে চলতেন, আবার কখনো পেছনে চলতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এরকম অবস্থান পরিবর্তন করছেন, আবু বকর জবাবে বলেন, ‘যখন আমি মনে করি সামনে কোনো আক্রমণ হতে পারে, তখন আগে চলে যাই। আবার যখন মনে হয়, পেছনে মুশরিকরা আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছে, তখন পেছনে চলে যাই।’ যখন আবু বকর গুহায় নামেন, তখন সেখানে একটি গর্ত দেখতে পান। এজন্য প্রথমে তিনি গর্তে নামেন। হতে পারে সেখানে কোনো প্রাণী আছে। তিনি রাসূলের জন্য প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করবেন, তার সব সম্পদ ও পরিবার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করবেন, কিন্তু রাসূলের কোনো কষ্ট সহ্য করবেন না। এরূপ করা সব মুমিনের জন্য ওয়াজিব। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মুমিনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

হয়। ‘আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’—এর বৈশিষ্ট্য তিনি রাসূল সা.-এর অংশীদার

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন গুহায় ছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

আল্লাহ ‘আমাদের সাথে’ আছেন, এ সম্মান হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য নির্দিষ্ট। এখানে আল্লাহ তাদের সাথে ছিলেন মানে শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তার সাহায্য নিয়ে তাদের সাথে ছিলেন। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে বলতে চেয়েছেন, ‘হে আবু বকর, শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। আপনাকেও আল্লাহ সাহায্য করবেন।’ একইরকমভাবে আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ

আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব
জীবনে ও স্বাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।^{৫৬}

ড. আব্দুল কারীম জাইদান إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের
সাথে আছেন) আয়াতে যে ‘সাথে থাকা’-এর কথা বলা হয়েছে, সে
সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে ‘সাথে থাকা’ সূরা নাহলের إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন
যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে) এ আয়াতের ‘সাথে
থাকা’-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কেননা এর আগের আয়াতে কোনো
শর্তের কথা নেই। আর সূরা নাহলের আয়াতে সাথে থাকার জন্য
তাকওয়া ও ইহসানের শর্তারোপ করা হয়েছে। এজন্য হিজরতের
সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর
রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আল্লাহ শর্তহীন থাকার মানে তাদের
অনেক উচ্চ মর্যাদা বোঝায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আল্লাহ থাকা মানে
তিনি তাদেরকে তার নিদর্শন ও গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য
করবেন।

সাত। রাসূল সা.-এর উপর দুঃখ-দুর্দশা এবং সাহায্য ও সাকীনা
অবতীর্ণ হওয়ার সময় আবু বকর রা. একাই পাশে ছিলেন

আল্লাহ বলেন,

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا

অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সাকীনা নাযিল করলেন
এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা
দেখনি।^{৫৭}

দুই। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা করা এবং তা অনুসরণ করা

যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায হিজরতের ঘটনা খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তাহলে সে এই মোবারক সফরের দু-টি বিষয়ে বিস্মিত না হয়ে পারবে না; প্রথমত, মক্কা থেকে বের হওয়া এবং মদীনা পর্যন্ত সফরের পেছনে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ। দ্বিতীয় এই যে, বাস্তবসম্মত এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কৌশল অবলম্বন যা তাকে নিরাপদে মদীনায পৌঁছার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেছে। এজন্য এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, কোনো কাজ করার আগে পরিকল্পনা করে করা রাসূলের সুন্নাত। প্রতিটি মুসলমানেরই তার জীবনের সব কাজের একটি সঠিক এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যারা এটা করে না, তারা শুধু নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেরই বড়াই করে; আর পরিণতিতে কেবলই নিজের ও অন্যান্যদের ক্ষতি করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায হিজরতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন কয়েকটি বিষয় দৃষ্টিগোচর না হয়ে পারে না; মদীনায নিরাপদে পৌঁছার জন্য পুরো সফরের বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মূলত এই সফরের প্রতিটি বিষয় আগেই সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে ভরদুপুরে এসেছিলেন। এ সময় প্রচণ্ড গরমে সহজে কেউ বাসা থেকে বের হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময়টাকে বেছে নিয়েছিলেন যেন তিনি কুরাইশ নেতাদের অথবা তাদের অনুচরদের দৃষ্টি এড়াতে পারেন।

খ। লোকচক্ষু এড়িয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি একটি কাপড় দিয়ে মাথা ও চেহারার অধিকাংশ ঢেকে রেখেছিলেন।

গ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ির সবাইকে সরিয়ে দিতে বলেছিলেন। তারপর তিনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন যে, তারা মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ছাড়তে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন পথে যাবেন কিংবা কোন দিকে যাবেন, এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলেননি।

ঘ। গভীর রাতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন।

ঙ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি অপরিচিত এবং অব্যবহৃত পথে সফর করেছিলেন। এজন্য তিনি মরুভূমির রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই পথপ্রদর্শক ছিল একজন মুশরিক। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত জানার পর মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর নির্ভর করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। যদি নিশ্চিত কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বিধর্মী কাউকে বিশ্বাস করা যায়, তবে তার সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন

মুশরিককে মরুভূমির অচেনা পথে তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তারা তাকে তাদের সফরের জন্য বাহনগুলো দিয়ে বিশ্বাস করেছিল এবং তিন দিন পর সওর পাহাড়ের গুহায় সাক্ষাতের সময়ও নির্ধারণ করা ছিল। মোটকথা, তারা তার উপর খুবই সংবেদনশীল তথ্যের ব্যাপারে আস্থা রেখেছিলেন। এটাই প্রমাণ করে যে, মুশরিক হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন।

বিশেষ কোনো গুণ থাকলে অবিশ্বাসী এবং গোনাহগারকেও ব্যক্তিগত কাজে বিশ্বাস করা যায়। যেমন যে কোনো মুসলমান একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করতে পারে, কারণ সে হয়তো তার কোনো নিকটাত্মীয়, অথবা সে দীর্ঘদিনের পরিচিত, অথবা সে একজন ভালো প্রতিবেশী, অথবা তার চরিত্র খুব ভালো, অথবা তার মধ্যে এরকম অন্য কোনো গুণ রয়েছে। মূলত নির্দিষ্ট কোনো অবিশ্বাসীকে ব্যক্তিগত কাজে বিশ্বাস করাটা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়ার পরই তিনি সর্বপ্রথম তার পরিবারে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এমনকি তার গোলামকেও ইসলামের দাওয়াত দেন। এক্ষেত্রে তিনি বিরাট সফলতা লাভ করেন। পরিবারের সবাই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, ইসলামে প্রবেশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং পরিবারের সবাইকে আত্মশুদ্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মানসিকতাকে এমন স্তরে উন্নীত করা যেন প্রয়োজনে ইসলামের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতে পারে। এক্ষেত্রেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সফল। এটা উপরের ঘটনা থেকে খুব ভালোভাবেই বোঝা যায়। তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে অনুপম সব ত্যাগ স্বীকার করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায নিরাপদে এবং সফলভাবে হিজরতের এই মোবারক সফর করতে পারেন।

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.-এর ভূমিকা এবং অবদান

হিজরতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ছোট থেকেই আব্দুল্লাহকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যেন তার অন্তরে ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রোথিত হয়ে যায়। যেভাবে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, তাতে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তার মধ্যে পিতার মতই চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। পিতা ও ছেলের মধ্যে একই ধরনের বুদ্ধিমত্তা, মহানুভবতা, আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি দীনের জন্য আত্মোৎসর্গের কামনা তীব্র ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপদে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত তার দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে তার পিতা তাকে সব আগেই বলে রেখেছিলেন। সংক্ষেপে তিনি গোয়েন্দা অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দিনের বেলা তিনি কুরাইশ নেতাদের বিভিন্ন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরার জন্য মক্কার কুরাইশরা যেভাবে চেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছিল, তা জানতে পারতেন। তারপর রাতের আঁধারে খুব সাবধানতার সাথে গুহা অভিমুখে যেতেন। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে হিসেবে তিনি সবসময়ই কাফেরদের নজরদারীতে থাকতেন। তবু তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ব্যবহার করে এমনভাবে সেখানে পৌঁছতেন যেন কেউ তাকে অনুসরণ করতে না পারে। তারপর ভোর হওয়ার আগেই তিনি তার বাড়িতে ফিরে আসতেন যেন তিনি সারারাত বাসায়ই ছিলেন। খুবই দক্ষতার আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার

দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনই তাকে কেউ ভুল বুঝতে পারেনি, ধরতেও পারেনি।

২। আয়েশা রা. এবং আসমা রা.-এর সাধারণ ভূমিকা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের ঘটনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন, ‘আমরা খুব দ্রুত উটে আরোহনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং তাদের জন্য একটি সুফরা (দস্তরখান যেটা খাবার খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) একটি ব্যাগে ভরে দিলাম। আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কোমরবন্ধের একটি কাপড়কে দু-ভাগ করে ব্যাগের মুখটা ভালোভাবে বেঁধে দিল। এজন্য তাকে ‘দুই ফিতাওয়ালী’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

৩। আসমা রা.-এর বিশেষ ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের ঘটনায় আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সওর পাহাড়ের গুহায় খাবার এবং পানীয় নিয়ে যেতেন। ইসলামের জন্য তিনি শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করেছেন। তিনি নিজেই তার কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন, ‘যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন, তখন আবু জাহেল বিন হিশাম কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে আসে। তারা দরজায় এসে দাঁড়ালে আমি দেখা করতে গেলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আবু বকরের কন্যা, তোমার পিতা কোথায়?’ আমি জবাব দিলাম, ‘আমি জানি না।’ আবু জাহেল ক্রোধান্বিত হয়ে হাত ওঠাল। আর সে ছিল বদমেজাজী, অশ্লীলভাষী ও নিকৃষ্ট। সে আমাকে এত জোড়ে চপেটাঘাত করল যে, আমার কানে তাল লেগে গেল। তারপর তারা চলে গেল।’

এভাবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। শত্রুর কঠিন নির্যাতনের

বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ থেকে তিনি মুসলমান নারী এবং পুরুষের জন্য একটি অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

৪। ঘরে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরিতে আসমা রা.-এর ভূমিকা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার সমস্ত পুঁজি নিয়ে বের হয়ে যান। তার অবশিষ্ট পুঁজির পরিমাণ ছিল পাঁচ/ছয় হাজার দিরহাম। যখন তার দাদা আবু কুহাফা তাকে দেখতে এসে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, তোমার পিতা তোমাদেরকে এরকম অসহায় অবস্থায় রেখে সব সম্পদ সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে!’ আবু কুহাফা অন্ধ ছিলেন। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘না দাদা। আবু অনেক সম্পদ রেখে গেছেন।’ এ কথা বলে তিনি তার পিতার টাকা-পয়সা রাখার জায়গায় কয়েকটা পাথর রাখেন। তারপর বলেন, ‘আপনি আপনার হাত দিয়ে দেখুন, এই যে এটা তিনি রেখে গেছেন।’ আবু কুহাফা হাত দিয়ে স্পর্শ করে খুশি হয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, সে যদি এটা তোমার জন্য রেখে দিয়ে থাকে, তাহলে সে ভালো কাজই করেছে।’ পরে তিনি যখন এই ঘটনা স্মরণ করতেন, তখন বলতেন, ‘আল্লাহর কসম, আমার পিতা ঘরে কিছুই রেখে যাননি। দাদাকে সন্তুনা দেওয়ার জন্য আমি ঐরকম করেছিলাম।’ আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার দাদার সামনে একটি পাথর রেখেছিলেন। আর আবু কুহাফা সেটাকে স্বর্ণের টুকরা মনে করেছিলেন।

খুব সহজেই আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিতার দোষ গোপন করতে এবং বৃদ্ধ দাদাকে সন্তুনা দিতে পেরেছিলেন। তাকে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। তার পিতা মূলত পাথরটাকে তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন যেন তিনি তার দাদাকে সন্তুনা দিতে পারেন। কিন্তু তিনি শুধু পাথরটাকেই রেখে যাননি। তিনি ঈমানকে আমানত রেখে গেছেন, পাহাড়ও যেটাকে টলাতে সক্ষম ছিল না। পিতা এবং

মেয়ে উভয়েই বিশ্বাসের এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন যাতে অভাব এবং প্রাচুর্যের কোনো প্রভাব ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবারের সদস্যদেরকে অনেক বড় লক্ষ্য অর্জনে তৈরী করেছিলেন যাতে তারা দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসের আগ্রহী হয়ে না ওঠে। এভাবে তিনি এমন এক আদর্শ পরিবার গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন যার কোনো তুলনা ইতিহাসে নেই।

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তার বোনেরা তাদের অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও মক্কায় কিছুদিন ছিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু রাফিঈ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঁচ শত দিরহাম এবং দু-টি উট দিয়ে মক্কায় পাঠান। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই মেয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহু; তার স্ত্রী সওদা বিনতে যামআহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মা বারাকাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে (যিনি তার কুনিয়াহ উম্মে আইমান হিসেবে পরিচিত ছিলেন) নিয়ে মদীনায ফিরে আসেন। তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও ছিলেন। তারা মদীনায হারিসা ইবনে নোমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসায় ওঠেন।

৫। আবু বকর রা.-এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা রা.-এর ভূমিকা

অনেক মুসলিম দেশে মুসলমানরা বাড়িতে একজন গোলাম রাখে। এসব গোলামরা সাধারণত ভীনদেশী এবং অনেকে বিধর্মী। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বেশিরভাগ মুসলমান এসব গোলামদের ব্যাপারে উদাসীন। তাদের আত্মিক উন্নতি কিংবা জাগতিক উন্নতির জন্য কোনো ফিকির করে না। ইসলামে একজন মুসলমানকে তার পরিবারের সবার উপর একইভাবে দায়িত্বশীল বানিয়েছে। তার

ছেলে-মেয়ে, তার স্ত্রী এবং এমনকি তার গোলামের সব ধরনের উন্নতির জন্য বাড়ির কর্তা দায়ী। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দায়িত্বের কথা জানতেন। তিনি তার গোলামের প্রতি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কেবল কথাই বলে গিয়েছেন। শুধু কথার দ্বারা হয়তো আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারতেন না। এটা থেকে আরও বোঝা যায় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ঘরের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে আচার-ব্যবহারে, এমনকি তার দাসদের প্রতিও ভদ্র ও নম্র ব্যবহারের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ কারণে এটা বলাই যথেষ্ট যে, মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্বের কারণে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসতে শিখেছেন। এজন্য আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদেরকে প্রথমে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তারা যদি বিধর্মী হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার গোলামের প্রতি দরদ, ভালোবাসা ও সম্মানের আচরণ করা উচিত। স্বাধীন একজনকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার বেলায় যে নম্রতা অন্তরে থাকে, তার বেলায়ও একই অনুভূতি রাখা প্রয়োজন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গোলাম আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাজের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন। এজন্য তিনি তাকে দু-টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন; এক, আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বকরীগুলোকে যথারীতি চরানোর সময় খুব স্বাভাবিকভাবে গুহার পাশ দিয়ে যাবেন যাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কিছু দুধ এবং গোস্ত সরবরাহ করতে পারেন। দুই, তিনি তার বকরীগুলোকে নিয়ে সওর পাহাড়ের চারিদিকে এমনভাবে চরাবেন যাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুহা থেকে বের হওয়া এবং প্রবেশের কোনো পদচিহ্ন না থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুজনেই সফলভাবে হিজরতের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব কিছুই করেছিলেন। যা কিছু করেছেন, তাতে কোনো ফাঁক-ফোকড় রাখেননি। তাদের ঐকান্তিক পরিকল্পনা ও পৌনঃপুনিক বাস্তবায়ন এটাই শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি মুসলমানেরই শরীয়ত অনুযায়ী কোনো কিছু অর্জন করতে গেলে সঠিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন জরুরী। এর মানে এই না যে, সে সব কিছুইতেই সফলতা পাবে। কারণ সফলতা দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ। অতিরিক্ত এটাও বোঝা যায় যে, যদি কেউ বাস্তবে তার উদ্দেশ্য পূরণে চেষ্টা শুরু করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর উপরই পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। সফল হওয়ার জন্য দুটো কাজ : যুক্তিগত ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা। এ দুটোর যে কোনো একটি না থাকলে বা কম থাকলে, স্বাভাবিকভাবেই তার তাওয়াক্কুলের স্তর দুর্বল।

মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ হিসেবে যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব, তার সবটুকুই তিনি নিয়েছিলেন। অধিকন্তু তিনি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। তার কাছে দু‘আ করেছেন এবং সাহায্য চেয়েছেন যেন তার এই সফর সফল হয়। আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করেছেন। কাফেররা তাদেরকে গুহায় দেখতেই পায়নি, সুরাকা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আগে বাড়তে দেওয়া হয়নি এবং এরকম আরও অনেকভাবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন।

তিন। আবু বকর রা.-এর নিষ্ঠা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে যে দুর্লভ মহান আদর্শ শিক্ষা দিয়েছিলেন, কর্ম এবং চরিত্রে তার বাস্তব নমুনা ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘তাড়াহুড়া কর না। হয়তো আল্লাহ তোমার একজন সঙ্গী মিলিয়ে দিবেন।’ সামান্য এ কয়েকটি কথার কি প্রতিক্রিয়া ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর? দেখা যায় যে, এ কথা শোনার পর থেকেই তিনি নিরাপদে হিজরতের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি দু-টি উট কেনেন। সেগুলোকে নিজের বাসায় রাখেন। দীর্ঘ এবং কঠিন সফরের জন্য সেগুলোর ঠিকমত পরিচর্যা করেন। বুখারী শরীফে এসেছে, ‘তাঁর নিকট যে দু-টি উট ছিল, এ দু-টি উটকে চার মাস পর্যন্ত (ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা (ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকেন।’ তিনি তার দূরদর্শিতার^{৫৮} কারণে বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিজরত খুবই কঠিন একটি সফর হবে। তিনি এটাও জানতেন যে, তাকে যে কোনো সময় হিজরতের জন্য বলা হবে। এজন্য তিনি বিশেষ করে বাহন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যখন সত্যিই একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং মদীনায় হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতির কথা জানালেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন এত বেশি খুশি হলেন যে, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। পরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, এর আগে আমি কাউকে খুশিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো এত বেশি কাঁদতে দেখিনি।’ সব মানুষ খুশিতে কাঁদে না। প্রাপ্তির বিশালতায় খুশি যখন বাধ ভাঙ্গে, তখন সেটা কান্না হয়ে বেরিয়ে আসে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুশির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, কারণ তার জানা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় হিজরতের সময় সঙ্গী হিসেবে থাকতে পারা একটি পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। সব মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে সব সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র সঙ্গী হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

^{৫৮} আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাকে রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

অন্তত মক্কা থেকে মদীনায পৌঁছতে যে তের থেকে উনিশ দিন লেগেছিল, সে কয়েকটা দিন। তিনি এটাও জানতেন যে, এটা খুব বিপদজনক একটি সফর এবং প্রয়োজনে রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেতে পারেন। দুনিয়াতে এর থেকে বেশি সম্মানের আর কি আশা করা যেতে পারে?

যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সওর পাহাড়ের গুহায় থাকাকালীন শত্রুর ভয়ে ভীত হলেন, তখন তিনি আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য চরম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। কাফেররা তাদেরকে দেখে ফেলবে এই ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। তবে তিনি কখনো নিজের জীবনের জন্য ভয় পাননি, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন নাশের আশঙ্কায় ভয় পেয়েছিলেন। যদি তিনি নিজের জীবন নিয়েই ভয় পেতেন, তাহলে কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই বিপদজনক সফরে বের হতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত্রুরা ধরে ফেলবে, এ সফরে প্রতি পদে পদে এই আশঙ্কাই ছিল। আর যদি এটা বাস্তবে সম্ভব হতো, তাহলে কুরাইশ মুশরিকদের হাতে তার সর্বনিম্ন শাস্তি হতো মৃত্যু। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জীবনের জন্য মোটেও ভয় পাননি। বরং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন।

হিজরতের সময় আরও অনেক ঘটনায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চরম নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা এবং আনুগত্য দেখিয়েছেন। তারা হিজরতের পথে চলার সময় একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার সাথে কে?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দ্রুত জবাব দেন, ‘তিনি আমার পথপ্রদর্শক। তিনি আমাকে (আসল) পথের দিকে গাইড করছেন।’ প্রশ্নকারী অবশ্যই এ কথা ভেবেছে যে, হয়তো তিনি তাকে মরুভূমির অচেনা পথে গাইড করছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও বাহ্যিকভাবে তার কথা থেকে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনি বুঝিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

হেদায়েতের পথে গাইড করছেন। কথার এই লুকোচুরির মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিশ্চতভাবেই জানতেন মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজছে এবং ধরার জন্য মরিয়া হয়ে আছে। এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একই সাথে মিথ্যাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন। হেদায়েতের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই অবিশ্বাস্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন।

চার। নেতৃত্বে বিচক্ষণতা ও মানুষের সাথে আচরণের দীক্ষা

আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি পরিমাণ ভালোবাসতেন; একইভাবে অন্যান্য সব সাহাবীরাও তাকে ভালোবাসতেন। তারা তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসায় কোনো ধরনের মুনাফেকি ছিল না। দুনিয়ার কোনো লাভের জন্যও ছিল না। এ অপার্থিব ভালোবাসার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল তার ব্যক্তিগত মহান চরিত্র এবং নেতৃত্বের মহৎ গুণাবলী। তিনি নিজে জেগে থাকতেন যেন অন্যরা ঘুমাতে পারে। তিনি কাজ করতেন যেন অন্যরা বিশ্রাম নিতে পারে। তিনি ভূখা থাকতেন যেন অন্যরা খাবারের নিশ্চিত ভাগ পায়। যদি তাদের কোনো খুশির খবর শুনতেন, তিনি খুশি হতেন। যদি দুঃখের খবর শুনতেন, তাহলে তিনিও দুঃখিত হতেন। যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক অনুসরণে অন্যের সাথে আচরণ করে, তাহলে সে শুধু সুন্নাত অনুসরণেরই সওয়াব পাবে না, সাথে সাথে সকলের ভালোবাসাও পাবে। আর যদি তিনি মুসলিম উম্মাহর নেতা হন, তাহলে এ ভালোবাসার পরিমাণ আরও বাড়বে। একজন

নেতা মানে এই না যে, সে শুধু গায়ের জোরে তার ইচ্ছামত মানুষকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করবে। কিন্তু নেতা তো সেই ব্যক্তি যে অন্য কোনো কিছু করানোর আগে মানুষের অন্তরগুলোকে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে। এজন্য অনুসারীদের ভালো-মন্দ যিনি নেতৃত্ব দিবেন, তার ভালো-মন্দের সাথেই আনুপাতিক হারে ওঠা-নামা করে। আর নেতা যত বেশি তার অনুসারীদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন, তত বেশি ভালোবাসা পাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও সহমর্মী ছিলেন। বেশিরভাগ সাহাবী মদীনায হিজরত করার পরেই তিনি হিজরত করেছেন। যারা দুর্বল ছিলেন কেবল তারাই তখনো মক্কায ছিলেন এবং ইসলামের জন্য কঠিন পরীক্ষায় সবার করছিলেন। আর কিছু সাহাবী রয়ে গিয়েছিলেন যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এটা পার্থক্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মানুষকে কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা হচ্ছে এবং নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য আছে। এদিক দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসতেন। অন্যদিকে আবু তালিবও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি রাসূলকে একই কারণে ভালোবাসতেন না। আবু তালিবের ভালোবাসা ছিল ভাতিজার প্রতি সহজাত ভালোবাসা, নিজের বংশের সন্তান হিসেবে প্রচলিত ভালোবাসা। উল্লেখ্য যে, রাসূলের প্রতি আবু তালিবের ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ছিল না। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তার ভালোবাসাকে কবুল করেছিলেন এবং নিচের আয়াত নাযিল করেছেন,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
 مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ
 يَرْضَى ۝

এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে
 আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এবং তার
 উপর কারও কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তার
 মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত। সে সত্ত্বরই সন্তুষ্টি
 লাভ করবে।^{৫৯}

আর আবু তালিবের ভালোবাসাকে আল্লাহ কবুল করেননি। যেহেতু
 তিনি মুশরিক ছিলেন, এজন্য জান্নাতের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য
 জাহান্নামকে নির্ধারিত করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৃষ্টি
 জগতের কারও কাছে তার আমল ও ভালোবাসার প্রতিদান চাননি।
 এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেও নয়। বরং
 তিনি তার উপর ঈমান এনেছেন, তাকে ভালোবেসেছেন আল্লাহর
 জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তিনি তাকে সাহায্য
 করেছেন।

পাঁচ। মদীনায পৌঁছার পর আবু বকর রা.-এর অসুস্থতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের জন্য
 নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আরেক শহরে হিজরত করা নিশ্চিতভাবেই
 ছিল একটি বিরাট ত্যাগ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
 কথায় সেই গভীর বেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

আল্লাহর শপথ, তুমিই আল্লাহর সবচেয়ে পবিত্র ভূমি
এবং আল্লাহর জমিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে
সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের
করে দেওয়া না হতো, তাহলে আমি কখনই তোমাকে
ছেড়ে যেতাম না।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদ্ধৃতি দিয়ে বুখারী শরীফে এসেছে,
‘যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে
মদীনায পৌছেন, তখন তা ছিল আল্লাহর জমিনে সর্বাপেক্ষা অধিক
মহামারীর স্থান এবং মদীনার উপত্যকাগুলোতে যে বর্ণা ছিল, তা
থেকে বিকৃত বর্ণ, বিকৃত স্বাদের পানি প্রবাহিত হতো। এজন্য
যেসব সাহাবী মদীনায হিজরত করেছিলেন, তাদের প্রায় সবাই এ
মহামারীতে আক্রান্ত হন। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলকে এ বিপদ থেকে
রক্ষা করেছিলেন। এ সময় আবু বকর, আমির ইবনে ফুহাইরা এবং
বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু জ্বরে আক্রান্ত হন। তারা একই ঘরে
ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি
তাদেরকে দেখার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। আমি
তাদেরকে দেখতে গেলাম। তখনো পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। আর
জ্বরের প্রকোপে তাদের এমন অবস্থা হয়েছিল, যা আল্লাহ ছাড়া
কেউ জানে না। আমি আবু বকরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি,
‘আব্বা, আপনার কেমন লাগছে?’ তিনি উত্তর দিলেন,

كل امرأ مصبح في اهله والموت ادنى من شرك نعله

সকলেই স্বজনদের মধ্যে সকাল করে, আর মৃত্যু তো
জুতার ফিতারও কাছে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর কসম, আমার পিতা কি
যে বলছেন তা তিনি জানতেন না। এরপর আমি আমির ইবনে
ফুহাইরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমির! কেমন লাগছে?’
তিনি বললেন,

لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه

كل امرأ مجاهد بطوقه كالشور يحمى جلده بروقه

মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করার আগেই আমি মৃত্যু-যাতনা ভোগ করছি। আর ভীকুদের মৃত্যু তো আসে তার উপর থেকে। প্রতিটি ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে তার হিম্মত অনুযায়ী। যেমন ঘাঁড় নিজেকে প্রতিরোধ করে তার শিং দ্বারা।

তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, তিনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জ্বর হলে বিলাল ঘরের আগ্নিনায় শুয়ে থাকতেন। তখন তিনি ঘাড় উঁচু করে বললেন,

الليت شعري هل ابين ليلة بفتح وحولى اذخر وجيل

وهل اردن يوما مياه مجنه وهل يبدون لى شامة وطفيل

যদি জানতাম যে, ‘ফাখ’ নামক স্থানে আমি রাত্রে যাপন করব, আর আমার আশেপাশে থাকবে ইযখির ও জালীল ঘাস। আমি কি কখনো পান করব মাজান্না কুয়ার পানি? আমার সামনে কি প্রকাশ পাবে শামা ও তাফীল পর্বত!

তাদের জবাব শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেও খুব ব্যাথা অনুভব করছিলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের অসুস্থতার কথা জানান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু‘আ করেন, হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দাও যেমন মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় বা এর চেয়ে বেশী। হে আল্লাহ! আমাদের সা’ ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। স্থানান্তরিত করে দাও জুহফাতে এর জ্বরের প্রকোপ বা মহামারীকে।’

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আ কবুল করলেন। মুসলমানরা মদীনায় জ্বরের প্রকোপ থেকে নিস্তার পেলেন। যারাই মদীনায় হিজরত করেছে অথবা সফরে এসেছে,

সবার জন্য মদীনা সবচেয়ে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং রোগমুক্ত শহরে পরিণত হলো।

মদীনায় স্থির হওয়ার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের দিকে মনোযোগী হন। এ প্রেক্ষিতে তিনি মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করেন। মদীনার অসহায় এবং দরিদ্রদের সাহায্য-সহায়তা প্রদানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণ করেন। মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। কুরাইশদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিকার অর্থে একটি দেশ শাসন করেছেন। তিনি দেশটির আর্থিক ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। একই সাথে তিনি তার সাহাবীদেরকে দীন শিক্ষা ও আত্মিক উন্নতির দিকেও সমান মনযোগী ছিলেন। এত বিশাল দায়িত্ব পালন করা সহজ ছিল না। এ কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, সব ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল উপদেষ্টা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভর করা যায়। হয় মসজিদে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময় রাসূলের পাশে থেকে হয় শিখছেন, না হয় সাহায্য করেছেন অথবা কাজ করেছেন। সত্যিকার অর্থে তিনি এক মহান প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন যাতে তিনি পরে রাসূলের ইত্তেকালের পর মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দানে যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।



চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রা.

ঐতিহাসিকরা সবাই একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বদরসহ সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধের ভয়াবহতায় যখন সবাই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে রাসূলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তারুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতে একটি বড় কাল পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। এ পতাকা কোনো একটি ব্যাটালিয়ান কিংবা রেজিমেন্টের ছিল না, এটা ছিল পুরো মুসলিম বাহিনীর পতাকা। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো যুদ্ধেই অনুপস্থিত ছিলেন না। জামাখসারি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম চিরদিনের জন্য পাশাপাশি উচ্চারিত হবে। যখন তিনি যুবক ছিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আর যখন তিনি বয়োঃবৃদ্ধ হন, তখন তিনি তার সব সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খরচ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সময় উট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেছেন। যতই দিন যাচ্ছিল, ততই তিনি রাসূলের জন্য খরচ করে যাচ্ছিলেন এবং তিনি তার মেয়েকে রাসূলের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে থাকতেন অথবা মদীনায় অবস্থান করতেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

আনহু তার সোহবতে ছিলেন। আর মৃত্যুর পর রাসূলের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। যেমন করে সবচেয়ে প্রিয় পুরুষ ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু।’

এটা নিশ্চিত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সাহাবীদের চেয়ে সবদিকেই অগ্রগামী ছিলেন। তিনি বিশ্বস্ততায়, জ্ঞানে এবং আমলে তাদেরকে পেছনে ফেলেছিলেন। এজন্য এটা খুব স্বাভাবিক যে, তার অন্য সব যোগ্যতার কারণেই তিনি সাহসিকতায় যুদ্ধের ময়দানেও সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এজন্য অনেকে তাকে দেখে খুবই দুর্বল অথবা ভীর্ণ মনে করত। আসল সত্য ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। তিনি যুদ্ধে নামেমাত্র কেবল অংশগ্রহণ করতেন বা পেছনের সারিতে লুকিয়ে থাকতেন অথবা আক্রমণ এড়িয়ে চলতেন, এমন নয়। তিনি এমন সময় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন যখন অন্যেরা পালাচ্ছিলেন। বিপদজনক কোনো মিশনে এগিয়ে গিয়েছেন যখন কেউ যেতে রাজি হয়নি। তিনি যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিও ছিলেন। এজন্য সালামা ইবনে আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমি সাতটি যুদ্ধে রাসূলের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং রাসূল কর্তৃক প্রেরিত আরও নয়টি বাহিনীতে ছিলাম। ঐসব লড়াইয়ের একটিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। আরেকটিতে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের কমান্ডার ছিলেন।’

এ অধ্যায়ে আমরা রাসূলের জীবদশায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা করব। এ থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, তিনি কিভাবে তার সর্বস্ব - সময়, সম্পদ এবং নিজের জীবন - সবকিছুই ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এক। বদরের যুদ্ধে আবু বকর রা.

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অনেক নিষ্ঠাবান মুসলমান এ যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায়ে রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, এটা মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করা শত্রুপক্ষের কোনো কাফেলার উপর অভিযান পরিচালিত হবে। এটা যে একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের রূপ নিবে, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো চিন্তারও উদয় হয়নি। এ কারণে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাদেরকে তিরস্কার করা হয়নি। বরং যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এজন্য তারা আমৃত্যু সম্মানের পাত্র ছিলেন। কয়েক বছর পর, যখন কেউ কাউকে বদরী বলে সম্বোধন করত, তখন সবাই বুঝত যে, এই সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য সব সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষ গৌরবের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা এ সম্মান মাত্র ৩১৩ জন সাহাবীকে দিয়েছিলেন যার মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দলের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ক। সংকটময় যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নে তার পরামর্শ

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন যে, আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়িক কাফেলা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং কুরাইশ মুশরিক নেতারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প, তখন তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি জরুরী সভার আহ্বান করলেন। তিনি ইসলামের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে তাদের মনোবল এবং অভিব্যক্তি জানতে চেয়েছিলেন। সবার জন্যই কথা বলার সুযোগ ছিল। সর্বপ্রথম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি যুদ্ধ করার পক্ষে উত্তম পরামর্শ দিলেন। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বক্তব্য দিলেন এবং তিনিও উত্তম কথা বললেন।

খ। শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে রাসূল সা.-এর সহযোগী হিসেবে ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বের হন। কিছু দূর অগ্রসর হলে এক বৃদ্ধ বেদুঈনের সাথে তার দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধের নিকট জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কুরাইশ বাহিনী এবং মুহাম্মাদ ও তার সাহাবীদের অভিযান সম্পর্কে কোনো সংবাদ জান কি?’ বৃদ্ধ লোকটি জবাবে বলল, ‘তোমাদের পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত আমি কোনো সংবাদ জানাব না।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি আগে সংবাদ জানালে আমাদের পরিচয় দেব।’ বৃদ্ধ বলল, ‘তাহলে কি সংবাদের বিনিময়ে পরিচয়?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তখন বৃদ্ধ বলল, ‘আমি শুনেছি মুহাম্মাদ ও তার সাহাবীরা অমুক দিন রওনা হয়েছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আজ তারা অমুক জায়গায় থাকবেন। (বৃদ্ধটি ঐ জায়গার নাম উল্লেখ করে যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনী অবস্থান করছিল।) আমি আরও শুনেছি যে, কুরাইশরা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছে। আমার এ প্রাপ্ত সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে আজ তারা অমুক স্থানে আছে। (বৃদ্ধটি ঐ স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে যে স্থানটিতে তখন কুরাইশরা অবস্থান করছিল।)’ বৃদ্ধ তার কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনারা যা জানতে চেয়েছেন, আমি আপনাদেরকে তা জানিয়েছি। এবার বলুন, আপনারা দু-জন কোন গোত্র থেকে এসেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, ‘আমরা পানি থেকে এসেছি।’ এ কথা বলে তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বৃদ্ধ লোকটি পুরো বিষয়টি নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল, কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে নয় তো? ^{৬০}

গ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর তাঁবুতে তার প্রহরী হিসেবে ভূমিকা

মুসলিম তীরন্দাজরা যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন। এই তাঁবুটিই ছিল মুসলিম বাহিনীর কমান্ড সেন্টার। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পশমী চাদর দিয়ে তাঁবুটি নির্মাণ করেন এবং হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের পরামর্শে নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর তা স্থাপন করেন। এখান থেকে যুদ্ধের পুরো ময়দান নজরে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তাছাড়া সা'দ ইবনে মু'আযের নেতৃত্বে আরও কিছু যুবক আনসারী সাহাবী তাঁবুর পাহাডায় নিয়োজিত ছিলেন। কয়েক বছর পর মুসলমানদের আমীর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতার কথা স্মরণ করে এক খুতবায় বলেন, 'হে লোকসকল! কে সব মানুষের মধ্যে সাহসী?' ঐসময় যারা উপস্থিত ছিল, সবাই বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি।' আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'আমি কখনো দ্বৈত-যুদ্ধে পরাজিত হইনি। তবু সবার মধ্যে সাহসী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি কমান্ড সেন্টার তৈরী করলাম। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকবেন? তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কেউ স্বেচ্ছায় দাঁড়ায়নি। তিনি তার তরবারি কোষমুক্ত করে রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐদিন কাফেরদের যে কেউ রাসূলকে আক্রমণ করতে এসেছে, তিনি তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছেন। তিনিই সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী।

ঘ। আবু বকর রা.-কে বিজয়ের সুসংবাদ জানানো হয়েছে

কমান্ড সেন্টারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে মুসলমানদের জন্য দু'আ করছিলেন যেন আল্লাহ তা'আলা

তার প্রতিশ্রুতি সাহায্য প্রেরণ করেন। তিনি তার দু‘আয় বলছিলেন, ‘ইয়া আল্লাহ! এই যুদ্ধে আপনি আমাকে যে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা দান করুন। ‘ইয়া আল্লাহ! এই যুদ্ধে আপনি আমাকে যে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রেরণ করুন। ‘ইয়া আল্লাহ! মুসলিম যুজাহিদগণের এই ক্ষুদ্র বাহিনী যদি আজ এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে দুনিয়ার বুকে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-হাত প্রসারিত করে খুবই কাতর স্বরে দু‘আ করছিলেন। এক পর্যায়ে তার চাদর কাঁধ থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন, চাদরটা উঠালেন এবং পুনরায় রাসূলের কাঁধে তুলে দিয়ে বললেন, ‘আপনার এতটুকু দু‘আই যথেষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনাকে সাহায্য প্রদান করবেন।’^{৬১} অতঃপর কুরআন শরীফের এই আয়াত নাযিল হলো,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ

(স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রবের সাহায্যের জন্য দু‘আ করেছিলে তখন তিনি তা কবুল করেছেন।^{৬২}

বুখারী শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু‘আ করছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, ‘এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁবুর বাইরে এসে বললেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

কাফেরের দল শীঘ্রই পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।^{৬৩}

^{৬১} সহীহ, মুসলিম (১৭৬৩)।

^{৬২} সূরা আনফাল, ৮:৯।

^{৬৩} সূরা আল-কামার, ৫৪:৪৫।

বর্ণনায় এসেছে, তাঁবুতে অবস্থানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক মুহূর্ত সংজ্ঞাহীনের মতো ছিলেন। তারপর যখন চেতনা ফিরে পেলেন, তখন তিনি বললেন, ‘হে আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহর সাহায্য এসে পড়েছে। এই যে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম, ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটছেন। তিনি এত জোড়ে ঘোড়া চালাচ্ছিলেন যে, তার সামনের দাঁতে ধুলোর আস্তর পড়ে গেছে।’ তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবুর বাইরে এলেন এবং মুসলিম বাহিনীকে বীরত্ব ও ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা দিলেন।^{৬৪}

মুসলিম বাহিনীর সব সদস্য সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিল। কেবলমাত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন রাসূলের পাশে ছিলেন। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে সাথীদের প্রতি আচরণের মাধ্যমেই একজন প্রকৃত নেতাকে চেনা যায়। বদরের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসূলের বিচক্ষণতা ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা প্রতিভাত হয়েছে। একজন মানুষের পক্ষে বিজয়ের জন্য যত ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কখনই এটা ভুলে যাননি যে, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব গভীরভাবে কাছ থেকে দেখেছেন, রাসূল কিভাবে যুদ্ধের আগে আল্লাহর কাছে দু‘আ করেছেন। এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি ভালোবাসা আর মহব্বতের কারণে রাসূলকে থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ সেদিন তার দু‘আর প্রতিদান দিবেন।

এটা নিশ্চিত যে, বদরের যুদ্ধের প্রারম্ভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দু‘আ করার স্মৃতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়ে সারা জীবনের জন্য প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে তিনি

^{৬৪} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়া, ইবনে হিশাম (২/৪৫৭); তারিখ আদ-দাওয়া, পৃ. ১২৫।

আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই শিক্ষাকে তিনি তার বাকি জীবনের জন্য আঁকড়ে ছিলেন। এই উপলব্ধি তাকে মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনে এবং সে সময় উদ্ভূত বিভিন্ন জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছে।

যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে চলছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরু থেকে বের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে এলেন। তিনি মুসলিম সৈন্যদের সাহসিকতার সাথে লড়াই করার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন। এভাবে তিনি একজন আদর্শ এবং প্রকৃত নেতা হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে সামনের সারি থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময় তার পাশে ছিলেন। যে কেউ রাসূলের সামনে আসত, ব্যগ্রভাবে তার সাথে লড়াই করেছেন। এক্ষেত্রে নিজের ছেলেও যদি হতো, তবু তিনি কোনো ছাড় দিতেন না। বদরের যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুর রহমান কাফেরদের পক্ষে লড়াই করছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেদিন যুদ্ধের ময়দানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখেননি। পরে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মুসলমান হন, তখন তিনি তার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘আব্বাজান, বদরের যুদ্ধের দিন একবার আপনি আমার তরবারির আওতায় এসেছিলেন। কিন্তু আমি তরবারি সংবরণপূর্বক অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম।’ জবাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি আমি তোমাকে টার্গেট হিসেবে পেতাম, তাহলে তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না।’^{৬৫}

ঙ। বদরের বন্দীরা ও হযরত আবু বকর রা.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, যখন বদরের যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ঐ সব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পরামর্শ চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর নবী! তারা তো আমাদের চাচাতো ভাই এবং স্বগোত্রীয়। আমি মনে করি যে, তাদের নিকট থেকে আপনি মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। এতে কাফিরদের উপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। হতে পারে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিবেন।’ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে ইবনুল খাত্তাব! এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যাপারে আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি, আপনি তাদেরকে আমাদের হস্তগত করুন। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। আর আকিলকে আলীর হস্তগত করুন। তিনি তার শিরোচ্ছেদ করবেন। আর আমার বংশের অমুককে আমার কাছে অর্পণ করুন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। কেননা তারা হলো কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এর পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করেননি। পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকরের নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তারা উভয়েই কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা কাঁদছেন কেন? কারণটা জানতে পারলে যদি আমারও কান্না আসে, তবে আমিও কাঁদব। আর যদি কান্না না আসে, তবে আপনাদের দেখাদেখি কান্নার ভান করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ

عُرِضَ عَلَىٰ عَذَابِهِمْ أَذْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে তোমাদের সাথীকে^{৬৬} এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসছে এবং তা একেবারে নিকটতম্ব এই বৃক্ষের চেয়েও নিকটে এসে গেছে।

আর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ ١٧ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ ١٨ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٩

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করছ (অর্থাৎ মুক্তিপণ) সে জন্য তোমাদের উপর আপতিত হতো মহাশাস্তি। সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।^{৬৭}

এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মালে গনীমত হালাল করে দেন।^{৬৮}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{৬৬} ইঙ্গিত তার নিজের দিকে ছিল।

^{৬৭} সূরা আল-আনফাল, ৮:৬৭-৬৯।

^{৬৮} সহীহ, মুসলিম, জিহাদ এবং আস-সিয়ার (১৭৬৩)।

ওয়া সাল্লাম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এসব যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর নবী, তারা তো আপনার স্বগোত্রীয় এবং আত্মীয়-স্বজন। তাদেরকে মেরে ফেলবেন না এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করুন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন (আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিবেন)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তাদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি ওদের গর্দান উড়িয়ে দেই।’ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদেরকে একটা প্রান্তরে রেখে চারিদিকে প্রচুর কাঠ বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দিন।’ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু (তিনি তখনো ইসলাম কবুল করেননি এবং বন্দীদের একজন ছিলেন) চিৎকার করে বললেন, ‘তুমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করছ।’ এসব মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়েই নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

তখন অনেকে বললেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শকে গ্রহণ করবেন। কেউ কেউ বললেন যে, তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত গ্রহণ করবেন। অন্যরা বললেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে ফিরে এসে বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে নরম করেন এবং তা তুলা থেকেও নরম হয়ে যায়। আবার কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে কঠিন বানান এবং তা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। হে আবু বকর, তোমার দৃষ্টান্ত ঈসা আলাইহিস সালামের মতো। তিনি বলেছিলেন,

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{৬৯}

আর হে উমর! তোমার দৃষ্টান্ত নূহ আলাইহিস সালামের মতো। তিনি তার কওমকে বলেছিলেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَّارًا

হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না।^{৭০}

হে উমর! তোমার দৃষ্টান্ত মূসা আলাইহিস সালামের মতো। তিনি বলেছিলেন,

قَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফেরআউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ—হে আমার প্রতিপালক, এজন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার প্রতিপালক, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।^{৭১}

^{৬৯} সূরা আল-মায়দা, ৫:১১৮।

^{৭০} সূরা নূহ, ৭১:২৬।

^{৭১} মুসনাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল (১/৩৭৩); তাফসীর ইবনে কাসীর (১/৩২৫)।

এ থেকে বোঝা যায় যে, যখনই কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে কোনো পরামর্শ করেছেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম কথা বলতেন। তারপর যখন অন্যরা এ বিষয়ে ভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরামর্শ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শকেই বেশি গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয়। উহুদ এবং হামরা আল-আসাদ

উহুদের যুদ্ধে সাহাবীরা কঠিন শিক্ষা পেয়েছিলেন। যখন কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকে উপেক্ষা করেছিলেন, তখন যুদ্ধ চরম পরিণতির দিকে ঘুরে গিয়েছিল। মুসলমানরা যেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে শত্রু অবস্থানে ছিল, সেখানে একটু পরেই তারা নিজেদেরকে কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পেল এবং পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রত্যেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছিল। যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় একা হয়ে যান এবং সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণের আওতায় পড়ে যান। তখন একদল সাহাবী শত্রুদের সাথে বীর বিক্রমে লড়াই করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই এসব সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছেন। তারপর আবু উবাইদা ইবনে আল-জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, আস-সুন্মাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু দুযানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যরা পাশে এসে দাঁড়ান। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উহুদ পাহাড়ের এক নিরাপদ

চূড়ায় নিয়ে যান। তারা তখন অন্যদেরকেও এখানে জমা করতে চেয়েছেন যেন মুসলমান বাহিনীতে আবার একত্রিত করে পুনরায় যুদ্ধ করার মনোবল ও সাহস সঞ্চার করা সম্ভব হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক জখম হয়েছে এবং তার সম্মুখভাগের একটি দাঁত শহীদ হয়ে গিয়েছে; আরও দেখলেন যে, লৌহবর্মের দু-টি কড়া তার চেহারা বিদ্ধ হয়ে আছে। তখন আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের কাছে যাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইশারা করলেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বার জন্য তিনি রাসূলের পাশেই থাকলেন এবং তার চেহারা মোবারক থেকে লৌহবর্মের কড়া বের করার জন্য চেষ্টা করলেন। তখন আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু আগ্রহী হয়ে কড়া বের করার কাজটা নিজে করতে চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অনুরোধ রাখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ব্যথা না পান, এজন্য তিনি তার দাঁত দিয়ে কড়া দু-টি বের করতে চাইলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তার নিজের সম্মুখভাগের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়।

রাসূলের গুরুত্বা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজ করলেন। তারা তাকে একটি গর্তে পড়ে থাকতে দেখলেন। তারা তার শরীরে সত্তরটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন। এসব ছিল তীর, বল্লম আর তরবারির আঘাত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন উহুদ যুদ্ধের কথা আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, ‘উহুদের

দিনের পুরো কৃতিত্ব তালহার।’ এরপর তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন, ‘আমি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসি। দেখি এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। তখন আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি, তুমি তালহার মতো হয়ে যাও।’

উহুদের ময়দানে সম্ভবত আবু সুফিয়ানের আচরণই অন্যান্য বিষয় থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদাকে বেশি সমুন্নত করেছে। উহুদ পাহাড়ের যেকোনো মুসলমানরা আবার জড় হচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছে?’ এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেও সে কোনো জবাব পেল না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের কথা পরীক্ষার শুনেছেন এবং জবাব দিতে নিষেধ করেছেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাহ আছে?’ এবারও সে একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। কোনো জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের মধ্যে কি উমর ইবনে আল-খাত্তাব আছে?’ কোনো জবাব না পেয়ে সে তার নিজের গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, ‘মনে হয়, এরা সকলেই নিহত হয়েছে।’ আর যাই হোক আবু সুফিয়ান খুব বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নেতা ছিলেন। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সে খুব ভালো করে একটি বিষয় পরীক্ষার করেছে যে, মদীনার মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তিনজন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু।

কাফেররা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে মক্কার পথে রওনা হয়ে গেল। তাদের এই গতিবিধি দেখে মনে হয়েছে যে, তারা মক্কা ফিরে যাচ্ছে না। বরং তারা হয়তো আবার কোথাও সংঘঠিত হয়ে মদীনার মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনা ছিল

আরও অগ্রসর। তিনি এবার কাফেরদেরকে কিছুতেই মদীনায আসতে দিবেন না। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের আহত অবস্থা সত্ত্বেও কাফেরদের ধাওয়া করার জন্য বললেন। মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে মুসলমানরা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবুও তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় সাড়া দিলেন এবং নতুন করে শক্তি অর্জন করে শত্রুদের ধাওয়া করল। আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করলেন,

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।^{৭২}

উহুদ যুদ্ধের কয়েক বছর পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই আয়াত সম্পর্কে উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘হে আমার বোনের ছেলে, তোমার দু-জন পিতা, যুবায়ের এবং আবু বকর, এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাফেররা যখন মক্কার দিকে ফিরে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, ‘কাফের বাহিনী পুনরায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। এজন্য তাদের কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদনুসরণ করা আবশ্যিক। তোমাদের মধ্যে কে কে এই অভিযানে যেতে চাও?’ সত্তরজন সাহাবী এই অভিযানে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।’

তৃতীয়। বনু আন-নাদির, বনু আল-মুস্তালিক আল-খান্দাক এবং বনু কুরাইযার যুদ্ধ

হিজরতের পরে মদীনার শাসনকর্তা হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম একটি কাজ ছিল মদীনার ইহুদীদের তিনটি গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি করা। ইহুদী গোত্রগুলো হচ্ছে বনু নাযির, বনু কাইনুকা এবং বনু কুরাইযা। এই চুক্তি অনুসারে ইহুদীদেরকে নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে এবং ইহুদীরা মদীনার মুসলমানদের অনুগত থাকবে। চুক্তির একটি শর্ত এরকম ছিল যে, যদি কোনো মুসলমান মদীনার বাইরে কোনো গোত্রের কাউকে হত্যা করে তবে মুসলমানদের সাথে ইহুদীরা তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য রক্তপণ আদায়ে সহায়তা করবে। এজন্য যখন আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু আমির গোত্রের দু-জনকে হত্যা করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিবেশী বনু নাযির গোত্রের লোকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে রক্তপণ আদায়ে শরীক হতে বলেন।

একটি ভুলের শিকার হয়ে আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দু-জনকে হত্যা করেন। কিন্তু তাকে কোনোভাবেই দোষ দেওয়া যায় না। ক্ষমতালোভী বনু আমির গোত্রের একদল লোক মদীনার কিছু মুসলিম প্রতিনিধিকে বীরে মাউনাতে শহীদ করে। আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মুসলিম প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন এবং কোনো রকমে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায ফেরার পথে তিনি বনু আমির গোত্রের দু-জনের দেখা পান। আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা জানতেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনু আমির গোত্রের চুক্তি রয়েছে। যেহেতু বনু আমির গোত্রের লোকদের প্রতি আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘৃণা কাজ করছিল, এজন্য

তিনি এ দু-জন লোককে হত্যা করতে চেয়েছেন। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তিনি তাদেরকে হত্যা করেন।

সন্দেহজনক এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যেহেতু তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন, এজন্য তিনি মুসলিম প্রতিনিধিদের শহীদ করার ক্ষেত্রে পুরো বনু আমির গোত্রকে দায়ী করেননি। এটাকে তিনি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে মনে করেছেন যার জন্য একজন উদ্যত এবং সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিই দায়ী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও রক্তপাত এড়াতে আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিহত দুই ব্যক্তির পরিবারকে রক্তপণ দিতে চেয়েছেন। এ কারণে তিনি আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিবেশী ইহুদী বংশদ্ভূত বনু নাযির গোত্রের কাছে রক্তপণ আদায়ে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছেন। তাদের ও বনু আমিরের মাঝে মৈত্রী চুক্তি ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বনু নাযির গোত্রের কাছে গেলেন, তখন গোত্রপ্রধান এমন আন্তরিকতার সাথে সম্ভাষণ জানালেন যেন সে তার এক হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে রক্তপণ আদায়ে আর্থিক সহযোগিতার কথা বললেন, তখন গোত্র প্রধান বলল, ‘হ্যাঁ, হে আবু কাসিম, আপনি যেভাবে খুশি হন, সেভাবেই আমরা সহযোগিতা করব। কিন্তু তারা যেভাবে প্রকাশ্যে আনন্দ এবং খুশি প্রকাশ করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের প্রতি তাদের অন্তরে ছিল ঠিক এর বিপরীত ঘৃণা এবং অসন্তোষ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ইহুদী নেতা বনু নাযির গোত্রের পক্ষ থেকে মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহের জন্য গেল। এই সুযোগে সে তার স্বগোত্রের লোকজনের সাথে জরুরী মিটিং-এ বসল। তারা খুব দ্রুত তাদের

ইচ্ছার বাইরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের উপর আক্রমণ করার মতো জঘণ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা একে অন্যকে বলল, ‘আমরা কখনই মুসলমানদের এই নবীকে এরকম অসহায় অবস্থায় পাব না (আমাদের মধ্যে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্য মাত্র গুটিকয়েক সঙ্গীদের নিয়ে এসেছেন)। বাস্তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই নাজুক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তিনি ইহুদীদের এক বাড়ির দেয়ালের পাশে অপেক্ষা করছিলেন। সত্যিকার অর্থে তিনি নাজুক অবস্থায় ছিলেন না। যিনি স্বয়ং আল্লাহর নিরাপত্তায় আছেন, তিনি কখনই শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণে অরক্ষিত থাকতে পারেন না।

বনু নাযির গোত্রের নেতারা একে অন্যকে বলতে লাগল, ‘কে আছ যে এই দেয়ালের উপরে উঠে তার মাথার উপরে বড় একটি পাথর ছুঁড়ে মারবে? তাকে হত্যা করতে পারলে তার সাথে আমাদের আর কোনো চুক্তি বিষয়ক আলোচনা কখনো করতে হবে না, কোনো সমস্যাও থাকবে না।’ আমর ইবনে জাহস ইবনে কা’ব খুব দ্রুত এই জঘণ্য কাজ করতে রাজি হয়ে গেল। সে বলল, ‘আমিই এ কাজের জন্য উপযুক্ত।’ আমর ইবনে জাহস দেয়ালের উপর উঠল। আর দেয়ালের অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। তার সাথে কয়েকজন সাহাবীও ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। বনু নাযির গোত্রের নেতারা যে জঘণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানিয়ে দিলেন। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমর ইবনে জাহসের মিশন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ঐ জায়গা থেকে সরে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদে মদীনায় ফিরে এলেন। তখন সব সাহাবীরা এসে জড় হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বনু নাযির গোত্রের হীন চক্রান্তের

কথা জানালেন। এর আগে তারা অনেকবার এটা প্রমাণ করেছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের শত্রু। একাধিকবার তারা মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এবার তারা এত বেশি নির্লজ্জভাবে চক্রান্ত করেছে যে, তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বনু নাযির গোত্রের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং এই হুকুম জারি করতে বললেন যে, বনু নাযির গোত্রের সবাই যেন তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যায়।

এ ঘটনায় বনু নাযির গোত্রের নেতারা সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যায়। তারা তাদের মাতৃভূমির প্রতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল এবং যে কোনো উপায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা খুব ভালো করেই জানে যে, মুসলমান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার মতো তাদের শক্তি-সামর্থ্য নেই। তাদের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা বাড়ি-ঘর না ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একটিই আশা ছিল যে, মদীনার মুনাফিকরা তাদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওয়াদা করেছিল।

বনু নাযির গোত্রের নেতারা প্রথম বড় ভুল করেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। দ্বিতীয় আরেকটা বড় ভুল করে মদীনার মুনাফিকদের কথা বিশ্বাস করে। কারণ মুনাফিকদের পরিচয়ই হচ্ছে তারা কখনো ওয়াদা রক্ষা করে না। এজন্য তাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতার লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে এবং বড় গলায় বলতে থাকে তারা কখনই নিজেদের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করবে না।

ফলে যা হবার তাই হলো। মুসলমানরা বনু নাযির গোত্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং তাদেরকে পনের দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখল। এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, বনু নাযির গোত্রের মদীনায় থাকার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ এলাকার কিছু গাছ কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। আরেক দলকে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বললেন। মুনাফিকদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে বনু নাযিরের নেতারা চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং পরাজয় বরণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দয়াবশতঃ তাদের সামানা-পত্র নিয়ে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। তবে সঙ্গে কোনো ধরনের অস্ত্র বহন করতে নিষেধ করলেন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই সূরা হাশর নাযিল হয়।^{৭৩}

বনু আল-মুস্তালিক

বনু আল-মুস্তালিক গোত্র মদীনা আক্রমণের চক্রান্ত করেছিল। এই খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য রওনা হন যাতে তারা আগে বেড়ে রাসূল এবং সাহাবীদেরকে আক্রমণের কোনো সুযোগ না পায়। বনু মুস্তালিক গোত্রের এলাকায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের পতাকা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে দেন। তবে আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পতাকা আশ্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের পতাকা একজন আনসার সা'দ ইবনে উবাইদাহরাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে দেন। ঐদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু মুস্তালিক গোত্রের অধিবাসীদের ঈমান কবুল করার জন্য আহ্বান করেন; কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া। একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন, যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে। তারা এ আহ্বান অস্বীকার করল। ঈমান কবুল করার

^{৭৩} সহীহ, বুখারী (৫/২১৭); আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৪/৮৬)।

পরিবর্তে তারা তীর নিক্ষেপ করে এর জবাব দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সাহাবীদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বলেন। তিনি তাদেরকে এক সত্তা হিসেবে যুদ্ধ করতে বলেন (এক সত্তা বলতে তিনি সবার মধ্যে ঐক্য এবং আনুগত্য বুঝিয়েছেন)। সাহাবীরা রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ীই যুদ্ধ করলেন। সামান্য সময়ের মধ্যে শত্রুদের পরাজিত করলেন। মূলত বনু মুস্তালিক গোত্রের কেহই রেহাই পায়নি। তাদের দশজন মারা যায় এবং বাকিরা সবাই যুদ্ধবন্দী হয়ে মুসলমানদের অধীনে আসে। অপরদিকে কেবল একজন মুসলমান শহীদ হন।

খন্দক এবং বনু কুরাইষা

উভয় যুদ্ধেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলেন। যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের মতো খন্দকের পরিখা নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মদীনার উত্তর দিকে শহরের প্রবেশ পথে পরিখার জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ পথে শত্রুপক্ষ মক্কার কুরাইশ এবং আবু সুফিয়ানের দলের মদীনার অধিবাসীদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে শত্রুরা মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেছে। হাতে সময় বেশি ছিল না। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে পরিখা নির্মাণের জন্য পরিশ্রম করছিলেন যে, কাজের সময় তার হাতে শুধু ধূলোয় সিক্ত হয়নি, তার পকেটেও ধূলো জমে গিয়েছিল। তার ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সকল সাহাবীদের সম্মিলিত চেষ্টায় সময়মতই পরিখা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল এবং শত্রুদেরকে প্রতিহিত করা সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থ। হুদাইবিয়া

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফ যিয়ারত এবং উমরা করার নিয়ত করলেন।

এজন্য চৌদশ সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মক্কা শরীফ রওনা হন। সাথে কুরবানীর জন্তও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মীকাতে গিয়ে ইহরাম বাঁধলেন যেন মক্কার কুরাইশরা পরিকার বুঝিতে পারে যে, উমরা এবং আল্লাহর ঘর যিয়ারত করাই এ সফরের মূল উদ্দেশ্য। যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুযাহ গোত্রের একজন সাহাবীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আগে পাঠালেন। তিনি একটু পরেই একটি দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন; মক্কার কুরাইশরা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে এগিয়ে আসছে।

এই অনভিপ্রেত দুঃসংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, ‘হে লোকসকল, আমাকে পরামর্শ দাও।’ তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুদ্ধবিগ্রহ এবং খুন-খারাবি আপনার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আপনি কাবা শরীফের দিকে এগিয়ে চলুন। কেউ আমাদের পথে বাধা দিলে অথবা আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করলে আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেব।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ বিজ্ঞ পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমত পোষণ করেন। তিনি সবাইকে বললেন, ‘আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও।’

ইতিমধ্যে কুরাইশ নেতারা আক্রোশে ফেটে পড়ল। তারা ওয়াদা করল যে, কোনোভাবেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এমনিতে তাদের অবস্থা বেশি সুবিধের ছিল না। তদুপরি সমস্ত আরববাসীরা কুরাইশদেরকে পবিত্র মক্কা শহরের রক্ষক হিসেবে সম্মান করত। যে কেউ মক্কায় বেড়াতে এলে খুব আন্তরিকভাবে তার আতিথেয়তা করা হতো। এজন্য কুরাইশদের সুখ্যাতি দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে যারা খানায়ে কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসত, তাদেরকে আরও বেশি আপ্যায়ন করা হতো। মোটকথা আরবদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে
কেরামকে নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে না দেওয়ার কোনো
যৌক্তিক কারণ ছিল না। কিন্তু কুরাইশ নেতারা এত বেশি উত্তেজিত
ছিল যে, এ জঘন্য আচরণে অন্যান্য আরববাসীরা কি মনে করবে,
তাদের অন্তরে এরকম কোনো চিন্তা ছিল না। তারা কেবল একটি
বিষয়ে দৃঢ় ছিল যে, কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।

ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে কুরাইশ
নেতারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সাথে আলোচনা করে সমঝোতায় পৌঁছানো ছাড়া বিকল্প
কোনো পথ নেই।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

মক্কার কাছাকাছি হুদাইবিয়া (বর্তমানে এ স্থানকে শুমাইসিয়া বলা
হয়, হুদাইবিয়া নামটি এখন নেই) নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ফেলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে একটি
সমঝোতায় পৌঁছার কাজ ক্রমেই জটিল হয়ে যাচ্ছিল। কুরাইশদের
পক্ষে একের পর এক প্রতিনিধি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনা করতে থাকে। কুরাইশরা সর্বপ্রথম
প্রতিনিধি হিসেবে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা আল-খুযাইকে পাঠায়।
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝে
মক্কায় ফিরে যান। তারপর মুকরিয় ইবনে হাফয, তারপর আল-
হুলাইস ইবনে ইলকিমাহ এবং তারপর উরওয়া ইবনে মাসউদকে
প্রেরণ করে।

উরওয়া ইবনে মাসউদ মুসলমানদের তাঁবুর নিকট আসলে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুদাইল ইবনে
ওয়ারাকাকে যে কথা বলেছিলেন, তাকেও একই কথা বলেন। তখন
উরওয়া বলে, ‘হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আপনার স্বগোত্রের

লোকদেরকে নির্মূল করে ফেলতে চান, তবে আরবের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করে দেখুন তো, কোনো কালে আরবের কেহ তার নিজের গোত্রকে নির্মূল করেছে কিনা? আর আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে আপনার সঙ্গে আমি বিভিন্ন গোত্রের এমন সব লোক দেখতে পাচ্ছি যারা যুদ্ধের সময় আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে পলায়ন করবে।’ উরওয়ার বক্তব্য ছিল যে, একই গোত্রের মধ্যে বন্ধন অনেক দৃঢ় থাকে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে শেষ পর্যন্ত ঐক্য বজায় থাকে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা বিভিন্ন গোত্রের ছিলেন। এজন্য তাদের মধ্যে আনুগত্য বেশিক্ষণ টিকবে না। তারা যখন কুরাইশদের শক্তি-সামর্থ্য দেখবে, তখন পলায়ন করবে। কিন্তু উরওয়ার এ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই ছিল না যে, বিশ্বাসের বন্ধন স্বগোত্রে পারস্পরিক বন্ধন থেকে অনেক বেশি দৃঢ় এবং স্থায়ী।

উরওয়ার মিথ্যা প্রপাচনা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ‘যাও, তুমি গিয়ে লাত মূর্তির যোনাঙ্গ লেহন কর। কাপুরুষ! ভাগ এখান থেকে। নিজের পথ ধর। তুমি কি এই কল্পনা করছ যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পালিয়ে যাব?’ যারা ধর্মের অবমাননা করে, তাদের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য বিদ্রোপাত্মক কঠিন শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়া যায়। উরওয়া বলল, ‘এই ব্যক্তি কে?’ তখন অন্যরা বলল, ‘তিনি আবু বকর আস-সিদ্দীক।’ তখন উরওয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমার প্রতি আপনার বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে (ইসলাম পূর্ব যুগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার উরওয়ার ঋণ পরিশোধে সাহায্য করেছিলেন) আমি এখনই আপনার কথার উপযুক্ত উত্তর দিতাম।’

উরওয়া ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে সাহাবীগণ পলায়ন করবে বলে আসলে সে মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বিশেষ করে তার প্রচেষ্টা

ছিল মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সাধারণ মুসলমানদের বিরোধ সৃষ্টি করা। একদিকে সে কুরাইশদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা তুলে ধরতে চেয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি চরমভাবে অনুগত মনে না করে তারা পালিয়ে যাবে বলে প্রচার করেছে। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য মুসলমানদের না থাকার কথাই সে প্রবলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারে, মুসলমানদের বিশ্বাস এত মজবুত যে তার কথার কোনো প্রভাবই তাদের অন্তরে পড়েনি।

এই ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো সময় বিরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের গোপনাজ্ঞ নিয়ে কটুক্তি করা যায়। এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উরওয়ার কথার প্রতিউত্তরে তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য এমন কঠিন কথা ব্যবহার করেছেন। ঈমানের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই তিনি উরওয়ার বিরুদ্ধে এমন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কর না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।^{৭৪}

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আবু বকর রা.-এর ভূমিকা

কুরাইশদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ প্রতিনিধি হিসেবে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠানো হয়। তার মধ্যস্থতায়ই শেষ পর্যন্ত একটি সর্বসম্মত সন্ধি করা সম্ভব হয়। সন্ধির শর্তগুলোতে বাহ্যিকভাবে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। সন্ধির

^{৭৪} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৬৯।

একটি শর্ত এমন ছিল যে, এ বছর মুসলমানরা উমরা পালন না করে ফিরে যাবে। অবশ্য তারা চাইলে পরের বছর উমরা করতে পারবে। আরেকটা শর্ত ছিল, যদি কোনো মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করে, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই সেই মুসলমানকে ফেরত দিবেন। অন্যদিকে যদি কোনো মুসলমান কাফের হয়ে মদীনা থেকে মক্কায ফিরে আসে, তবে কুরাইশরা তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে এবং তাদেরকে মক্কার সমাজে বসবাস করতে দিতে পারবে। এসব শর্ত মুসলমানদের জন্য অপমানকর মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষমেষ এসব শর্ত মুসলমানদেরই উপকারে আসে এবং কুরাইশ নেতাদের জন্য বিপদের কারণ হয়।

সন্ধিতে এমন কিছু শর্তের জন্য বাহ্যিকভাবে এটা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর এবং অনৈতিক মনে হয়েছিল। এজন্য শুরুতে কিছু মুসলমান এর প্রতিবাদও করেছেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এরকম একজন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর প্রতিবাদ করার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘আপনি কি সত্য নবী নন?’ এ প্রশ্নে জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হ্যাঁ। আমি আল্লাহর নবী।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমরা কি মুসলমান নই?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হ্যাঁ। তোমরা মুসলমান।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তারা কি কাফের নয়?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হ্যাঁ (তারা কাফের)।’ উমর বলেন, ‘তাহলে কেন আমরা (এরকম একটি অপমানজনক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে) আমাদের ধর্মকে অপমান করছি?’ বস্তুত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্ধির যৌক্তিকতা নির্ধারণে এবং তা উপস্থাপনে সঠিক ছিলেন না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাকে অমান্য করি না।’ আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আমি আল্লাহর গোলাম এবং তার রাসূল। আমি তার নির্দেশের বাইরে কিছু করব না এবং তিনি আমাকে অপমান করবেন

না (অথবা আমাকে ধ্বংস করবেন না)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেকমতপূর্ণ এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টি বুঝতে পারছিলেন না, সেটুকু কেবল জানতে চেয়েছেন। আর তিনি যা বুঝতে পারেননি, সেটি হচ্ছে এ সন্ধির পেছনে লুকানো হেকমত যেটাকে বাহ্যিকভাবে কুরাইশদের অনুকূলে মনে হচ্ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বললেন, ‘আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আমরা খানায়ে কাবায় গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ। তবে আমি কি এ বছর করব বলেছি?’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘অবশ্যই তুমি মক্কায় বাইতুল্লাহ যিয়ারতে আসবে এবং এর তাওয়াফও করবে।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই সন্ধির ব্যাপারে দু-টি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, তিনি এই সন্ধিতে রাজি হওয়ার পেছনে কি হেকমত আছে, তা বুঝতে না পারা। দ্বিতীয়ত, এ সন্ধি করে কাফেরদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে হেয় করার দুশ্চিন্তা। এজন্য তার এ মানসিক অবস্থা সঠিক ছিল এবং তা ছিল মুসলমানদের ভালোর জন্যই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, ‘হে আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ। তিনি আল্লাহর রাসূল।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমরা কি মুসলমান না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ (আমরা মুসলমান)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তারা কি কাফের নয়?’ আবু বকর জবাবে বললেন, ‘হ্যাঁ (তারা কাফের)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে কেন আমরা এরকম অপমানজনক একটি সন্ধি মেনে নিচ্ছি?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব নীতিবান। এজন্য তিনিও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিজেকে সেরকমভাবে উপস্থাপন করতে চাইলেন এবং তাকে ভালো উপদেশ দিতে চেষ্টা করলেন। এজন্য তিনি উমর

রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মেনে নাও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সত্য সেটাই যা তিনি আদেশ দেন। তিনি কখনই আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কাজ করেন না এবং আল্লাহ তাকে অপমান করবেন না (অথবা আমাকে ধ্বংস করবেন না)।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জবাব দিয়েছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও ঠিক একই জবাব দিলেন। এটাই প্রমাণ করে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বাস, প্রজ্ঞা এবং ধীশক্তিতে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। যেখানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সন্ধির পেছনে বিশাল হেকমত সম্পর্কে বুঝতে পারছিলেন না, সেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিকই তা হৃদয়াঙ্গম করেছেন। যদি ধরে নেওয়া হয়, হয়তো তিনি পুরো হেকমত বুঝতে পারেননি, তবে তিনি এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার নিজের জন্য, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এবং সব সাহাবীদের জন্য সবচেয়ে সহজ এবং একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে মেনে নেওয়া। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন। নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না।

হুদাইবিয়ার সন্ধি শুরুতে মুসলমানদের জন্য বিপরীত মনে হলেও পরবর্তী সময়ে এটা ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য বিরাট বিজয়ের কারণ হয়ে ওঠে। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার বিজয় (এখানে নোট করার বিষয় হচ্ছে, তিনি ‘সন্ধি’ শব্দের পরিবর্তে ‘বিজয়’ শব্দ ব্যবহার করেছেন) থেকে বড় কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি। এ সন্ধি স্বাক্ষরের দিন অনেকে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। তারা মোটেও খেয়াল করেনি যে, আল্লাহ এবং তার রাসূলের মধ্যে কি বোঝাপড়া হচ্ছে। বান্দা খুব দ্রুততার সাথে ফলাফল পেতে চায়। আল্লাহর বিধান এর বিপরীত। তিনি তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না। তিনি একটি নির্দিষ্ট

সময় পর্যন্ত সব বিষয়ে ছাড় দিয়ে থাকেন। তারপর তিনি তার ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও বলেন, ‘বিদায় হজে আমি সুহাইল ইবনে আমরকে পশু কুরবানি দেওয়ার স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি আরও দেখলাম, তিনি একটি একটি করে পশু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, আর সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কুরবানি দিচ্ছেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপিতকে ডাকলেন। নাপিত এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুল কামিয়ে দিল। তারপর আমি দেখলাম, সুহাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুলগুলো কুড়িয়ে নিজের চোখে (বরকতের জন্য) লাগাচ্ছে। আমার তখন হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনের কথা মনে হলো যেদিন সুহাইল ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম -মহাকরুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু...’ এই কথাটা লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারপর আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম যে মহান সত্তা সুহাইলকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দিয়েছেন।’^{৭৫} মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সঠিক রায়ের অধিকারী এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

পঞ্চম। খায়বারের যুদ্ধ, নাজদ অভিযান এবং বনু ফাযারাহ মিশন

খায়বার যুদ্ধের একটি সরাসরি ফলাফল ছিল খায়বার বিজয়। খায়বার ছিল মূলত ইহুদী জনবসতীপূর্ণ একটি শহর। বনু নাযীরের দলপতিরা মদীনা থেকে দেশান্তরিত হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করে। আশেপাশের অন্যান্য দলপতিদের (যারা খায়বারের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল) আর্থিক সাহায্যে তারা এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

^{৭৫} কানযুল উম্মাল (৩০১৩৬); খুতাব আবু বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ আহমাদ আশুর, পৃ. ১১৭।

খায়বার পৌছার পর মুসলমান বাহিনী সাথে সাথে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। খায়বারের লোকজন মুসলিম বাহিনীর আসন্ন আক্রমণের ভয়ে দুর্গের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করে। খায়বার, দুর্গের জন্য যেমন বিখ্যাত ছিল, তেমনি খেজুর বাগানের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। দুর্গগুলো শহরের বিভিন্ন অংশে তৈরি করা হয়েছিল। আর মুসলিম বাহিনীর কাছে এ দুর্গগুলো অবরোধ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। তারা একেকটি দুর্গ জয় করে আরেকটির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। প্রথম কয়েকটি দুর্গ জয় করা কঠিন মনে হচ্ছিল। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের একটি দলকে এ কাজে নিয়োগ করেন। আর এ দলের সেনাপতি ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথীদেরকে নিয়ে সারাদিন যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অভিযানে সফল হতে পারেননি। পরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আরেকটি দল পাঠালেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও দুর্গ জয় না করেই ফিরে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, ‘আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে নেতৃত্ব দেব (যার মাধ্যমে আল্লাহ বিজয় দান করবেন) সে আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালোবাসে (আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসে)।’ এই ব্যক্তিটি ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি পরের দিন একদল সাহাবীসহ যুদ্ধ পরিচালনা করলেন এবং বিজয়ী হলেন।

খায়বারের দুর্গগুলো অবরোধ করে রাখার সময় কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলার হুকুম দেন যেন কাফেরদের মন দুর্বল হয়ে যায়। তারা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পরামর্শে সম্মত দেখলেন, তখন কয়েকজন সাহাবী দ্রুত কিছু গাছ কেটে ফেলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাছ কাটার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন যে, খায়বারের গাছ কাটা সার্বিকভাবে মুসলমানদের

স্বার্থবিরোধী কাজ হবে যদি তারা খায়বার জয় করে (যুদ্ধ করে হোক অথবা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই পরামর্শ খুবই যৌক্তিক মনে করে তখনই গাছ কাটতে নিষেধ করলেন এবং সাহাবীরা রাসূলের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই এ কাজ থেকে বিরত হলেন।

ইবনে সা'দ ইয়াস ইবনে সালামা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নাজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা রাতে হাওয়াযেন গোত্রের কয়েক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করি। আমি নিজ হাতে তাদের আট ব্যক্তিকে হত্যা করি। সেদিন আমাদের সাংকেতিক শব্দ ছিল আমিত আমিত (أَمِثُ أَمِثُ)।

বনু ফাযারাহ সম্পর্কে

বনু ফুযারাহ অভিযান সম্পর্কে সালামাহ ইবনে আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘বনু ফাযারাহ গোত্রের বিরুদ্ধে আমরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করি। এক পর্যায়ে আমরা তাদের জলাশয়ের নিকট পৌঁছে যাই। সেখান আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে তাঁর গাড়িতে বললেন। ফজরের নামাযের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে আমরা পুনরায় যুদ্ধ শুরু করি। এ জলাশয়ের কাছাকাছি যারাই আক্রমণ করতে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াই করেছি। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেকে নিহত হলো। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালাতে লাগল। আমি নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে নারী এবং শিশুদের একটি দল দেখতে পাই। আমি সেদিকে একটি তীর নিক্ষেপ করি। সেটা তাদের এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি গিয়ে পড়ে। তীর দেখে তারা থেমে গেল। তাদেরকে পাকড়াও করে আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে আসি। তাদের মধ্যে একজন মহিলা গায়ে চামড়ার তৈরি ‘কাসা’ (এক ধরনের পোষাক) পরিধান করে ছিলেন। তার সাথে

একজন যুবতী মেয়ে ছিল। সে ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে অন্যতম সেরা সুন্দরী। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মহিলাকে আমার ভাগে দিলেন। মদীনা পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমি তার সাথে কোনো সম্পর্ক করিনি। আমি তার সাথে এক রাত অতিবাহিত করি। কিন্তু তখনো তার সাথে আমার কোনো দৈহিক সম্পর্ক হয়নি।

পরদিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার বাজারে দেখা হয়। তখন তিনি আমাকে বলেন, ‘হে সালামাহ! এই মহিলাকে আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দাও।’ আমি এর জবাবে বললাম, ‘আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েটিকে আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি এখনও তার সাথে কোনো দৈহিক সম্পর্ক করিনি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু না বলে চলে গেলেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে আবার একই কথা বললেন। আমি তখন মহিলাকে হাদিয়া হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে দিলাম। মক্কায কিছু মুসলমান বন্দী অবস্থায় আটক ছিল। তাদের মুক্তির বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরমা সুন্দরী মহিলাকে মুক্তিপণস্বরূপ মক্কার কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন।

ছয়। উমরাতুল কাযা এবং আস-সালাসিল অভিযান

ক। উমরাতুল কাযা

হুদাইবিয়া সন্ধির এক বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীরা উমরা করার জন্য মক্কা শরীফে এলেন। এ সময় কুরাইশরা মুসলমানদের বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তিন দিনের জন্য মক্কা শহর প্রায় খালি করে দিল। এতে মুসলমানরা শান্তিতে উমরার যাবতীয় আহকাম পালন করেন। অবশ্যই অন্যান্য

সাহাবীদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বছর উমরা পালন করেন।

খ। আস-সালাসিল অভিযান

এই অভিযান সম্পর্কে রাফে' ইবনে আমর আত-তাঈ বলেন, 'যাত আস-সালাসিল অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োজিত করেন। যাত আস-সালাসিল আল-কুরস উপত্যকার বিপরীত দিকে অবস্থিত; মদীনা থেকে দশ দিনের পথ। তার অধীনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনেক বড় বড় সাহাবী প্রেরণ করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা যখন তাঈ পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এমন একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে যে কিনা এই দুর্গম পথে আমাদেরকে গাইড করতে পারে।' তখন তার সৈন্যরা বলল, 'এ কাজে আমরা একমাত্র রাফে' ইবনে আমরকে যোগ্য মনে করি। তিনি ইসলাম পূর্ব যুগে এসব এলাকায় একাকী ডাকাতি করতেন (এজন্য তার এসব পথ চেনা ছিল)।

রাফে' বলেন, আমরা যখন অভিযান শেষ করে আবার একই জায়গায় ফিরে এলাম, আমার তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে নজর গেল। তিনি 'ফাদাকি' নামে এক ধরনের পোষাক পড়েছিলেন (ফাদাক এলাকার পোষাক; খায়বর এলাকার একটি গ্রামের নাম ফাদাক)। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সওয়ারীর উপর উঠছিলেন, তখন তিনি কাপড়ের দুই প্রান্ত এক ধরনের খিলাল বা কাঠি দ্বারা আটকে রাখতেন। আবার যখন সওয়ারী থেকে নামতেন, তখন কাপড়ের দুই প্রান্ত ছেড়ে দিতেন। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হে খিলালওয়ালা, সব সাহাবীদের মধ্যে আপনি আলাদা। আপনি আমাকে কিছু নসিহত করুন। যদি সেগুলো মনে রাখতে পারি এবং আমল করতে পারি, তাহলে আমি আপনাদের

মতো হতে পারব। দীর্ঘ নসিহত করবেন না। সম্ভবত আমি মনে রাখতে পারব না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি পাঁচ আঙ্গুল মনে রাখতে পার?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি এই স্বাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, যাকাত (ফরয হলে) আদায় করবে, হজ (ফরয হলে) আদায় করবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখবে। তুমি কি এগুলো মনে রাখতে পারবে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় আছে। কখনো দু-জনের নেতা হতে যেও না।' আমি বললাম, 'তাহলে নেতৃত্ব কি তোমাদের মতো শহরবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে?' তিনি বললেন, 'সময় আসছে যখন নেতৃত্ব ছড়িয়ে পড়বে। তুমিও নেতার মর্যাদায় উপনীত হবে। তোমার থেকে যারা মর্যাদায় এখন নিচে, তারাও একদিন নেতা হবে। যখন কেউ কোনো জনগোষ্ঠীর নেতা হবে, তখন যদি তার অধীনস্থ লোকেরা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় এবং সে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার উপর প্রতিশোধ নিবেন...।'

এই গল্পের শিক্ষা এবং উপদেশ

১। এ গল্প থেকে যে কেউ ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ই উল্লেখ করছেন। আর এই পাঁচটি বিষয়ই ইসলামের মূল শিক্ষা। প্রথমে ঈমানের কথা বলার পর তিনি নামায, যাকাত, রোযা এবং হজের কথা বলেছেন।

২। নেতা হওয়ার জন্য কারও কখনো আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। কেউ নেতা হলে একদিন তার আমলের সাথে তার অধীনস্থ লোকদেরও হিসেব দিতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একবার বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নেতৃত্ব একটি আমানত এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করে যারা এ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে

আদায় করবে না, তাদের জন্য তা আখেরাতে অপমান, লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সত্য খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি কেউ নেতা হয়, তাহলে তার হিসেব দীর্ঘ হবে। আর শাস্তিও অন্যান্যদের থেকে কঠিন হবে। আর যদি কেউ নেতা না হয়, তাহলে তার হিসেব তাড়াতাড়ি হবে এবং শাস্তিও অন্যদের চেয়ে কম পাবে।' নেতৃত্ব সম্পর্কে এই প্রজ্ঞাই তিনি লালন করতেন এবং খলীফা হওয়ার পরও এই ধারণাই তার মধ্যে সক্রিয় ছিল। খেলাফতের সময় অধিনস্থদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য তিনি দিন-রাত পরিশ্রম করতেন।

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের উপর যুলুম করাকে হারাম করেছেন। বান্দাদেরকে পরস্পরের উপর যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। কেননা একটি যুলুম কিয়ামতের দিন অনেক যুলুমের আকার ধারণ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের উপর যুলুমকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ أَذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে ব্যক্তি আমার কোনো অলী (প্রিয়জন)-কে কষ্ট দিবে,
আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।

মুমিনগণ আল্লাহর প্রতিবেশী। তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তার প্রতিবেশীর জন্য ক্রুদ্ধ হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

৪। আস-সালাসিল অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এই অভিযানের নেতা হওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমার ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নেতা মনোনীত করলেন, তখন তিনি না কোনো অভিযোগ করলেন, না তার যোগ্যতার প্রতি অবিচার করা

হয়েছে বলে মনে করলেন। অন্যদিকে তিনি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে শিরোধার্য করে নেননি, বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক যোগ্যতার বিচারেই আমার ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ অভিযানের নেতা নির্বাচন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় পাওয়া যায়, মুসলিম সৈন্যরা যখন গন্তব্যে পৌঁছল, তখন আমার ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ফরমান জারি করলেন। তিনি সবাইকে রাতে আগুন জ্বালাতে নিষেধ করলেন। এটা অনেকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। তখন শীতের রাত ছিল। আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু চাইলেন, আগুন দেখে শত্রুরা মুসলমান বাহিনীর উপস্থিতি যেন টের না পেয়ে যায়। তারা জানতে পারলে অতর্কিতে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে পারে। অথচ তিনি রাতে গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রত্যুষে কাফের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একক সিদ্ধান্তের পেছনে হেকমত বিবেচনা না করে এবং সৈন্যদের অবর্ণনীয় শীতের কষ্ট সহ্য করতে হবে ভেবে উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব উত্তেজিত হয়ে গেলেন। তিনি এ সিদ্ধান্ত না মেনে আমার ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু কড়া কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এটা করতে নিষেধ করলেন। বিজ্ঞপ্তি কঠে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘যুদ্ধের রণকৌশলে অভিজ্ঞ হওয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ইবনে আসকে তোমাদের নেতা বানিয়েছেন।’ এ কথা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নরম হয়ে গেলেন। তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা থেকে বিরত থাকলেন।

সাত। মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযান

ক। মক্কাবিজয় (অষ্টম হিজরী)

যে ঘটনাপ্রবাহ মক্কা বিজয়ে ভূমিকা রেখেছে, এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় একটি শর্ত এমন ছিল যে, কোনো তৃতীয় পক্ষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে। এ শর্ত মোতাবেক বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে এবং বনু খুযাআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিত্রতার ঘোষণা করে। এ ঘোষণার ফলে মুসলমান অথবা খুযাআ গোত্রকে বনু বকর অথবা কুরাইশদের আক্রমণ করার অধিকার রহিত হয়। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, কুরাইশ এবং মদীনার মুসলমানরা পরস্পর শত্রু। একইভাবে বনু বকর এবং বনু খুযাআ একে অন্যের শত্রু ছিল।

সব দল এই মৈত্রী চুক্তি আনুমানিক সতের অথবা আঠার মাস মেনে চলে। কিন্তু হঠাৎ করেই বনু বকরের লোকেরা মক্কার নিকটবর্তী ওয়াতীর ঝর্ণার কাছে খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। মক্কার কুরাইশরা আরও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করা হয়েছিল, তারা মদীনার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করেই বনু বকরকে সে রাতেই অস্ত্র নিয়ে সহায়তা করে। তারা শুধু অস্ত্র দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কুরাইশদের অনেকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে নির্মমভাবে খুযায়ীদের উপর আক্রমণ করেছে। কুরাইশরা ভেবেছিল মুহাম্মাদ জানতে পারবে না, আমাদের কেউ দেখবেও না।

হতাশাগ্রস্ত কুরাইশদের আক্রমণের পরে খুযাআ গোত্রের একজন মদীনায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার নাম আমর ইবনে সালাম। তিনি মদীনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে

মক্কার কুরাইশদের নির্মম আক্রমণের কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ‘হে আমর, তোমাকে সাহায্য করা হবে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করা শুরু করলেন। মক্কা অভিযানের বিষয়টি গোপন রাখলেন। মুসলিম সৈন্যদের কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি। তিনি আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! কুরাইশদের থেকে আমাদের প্রস্তুতির যাবতীয় খবর গোপন রাখুন যাতে আমরা তাদের উপর আকস্মিকভাবে চড়াও হতে পারি।’

আমর ইবনে সালেমের মদীনা গমনের সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা মারাত্মকভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ানের মধ্যে একই সাথে রাগ এবং ভীতি কাজ করছিল। তার গোত্রের লোকেরা এমন একটি নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে যার জন্য তিনি রাগান্বিত হলেন। আবার এ ঘটনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীরা প্রতিশোধ নিতে পারেন, এ ভয়ে ভীত হলেন। এরকম একটি অস্থিরতার মধ্যে তিনি সরাসরি মদীনায় গমন করলেন এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আমাদের চুক্তিকে দৃঢ় করুন এবং এর মেয়াদ বৃদ্ধি করুন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, ‘এই কারণেই কি আপনি এসেছেন? আপনি কি এমন কিছু করেছেন যেজন্য আপনাকে অস্থির মনে হচ্ছে?’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমরা আমাদের চুক্তির মধ্যেই আছি এবং চুক্তির যাবতীয় শর্তসমূহ অনুসরণ করছি। আমরা চুক্তিতে কোনো কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিনি।’ আবু সুফিয়ান এ কথার কোনো জবাব পেলেন না। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কাছে যান। তার আশা ছিল হয়তো তিনি কারও সহমর্মিতা পাবেন এবং এভাবে তার জাতিকে সমূহ ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।

আবু বকর রা. এবং আবু সুফিয়ান

আবু সুফিয়ান প্রথমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। সেখানে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী সহমর্মিতার পরিবর্তে রাগ এবং গোস্বা তার ভাগ্যে জুটল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনস্থির করেন, আমিও তার বিরুদ্ধে লড়ব। আমি যদি একটি পিঁপড়াকেও তোমার বিরুদ্ধে লড়তে দেখি, তাহলে আমি পিঁপড়াকে তোমার বিপরীতে সাহায্য করব।’

আয়েশা রা. এবং আবু বকর রা.-এর মধ্যে আলোচনা

মুসলিম সৈন্যবাহিনী সফরে বের হওয়ার আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে গেলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন চালনি দিয়ে যবের ছাতু চালছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মক্কা অভিযানের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করতে বলেছিলেন এবং বিষয়টি অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখতে বলেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কাজ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আয়েশা, তুমি কেন এ খাবার তৈরি করছ?’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কিছু বললেন না। চুপ থাকলেন। তার এ নিরবতায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কাউকে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন?’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আগের মতোই নিশ্চুপ থাকলেন। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নসিহতের ভঙ্গিতে বললেন, ‘সম্ভবত তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।’ এবারও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনো জবাব দিলেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার বললেন, ‘সম্ভবত তিনি নাযদ গোত্রের উপর আক্রমণ করবেন!’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার নিরবতায় অটল রইলেন। সম্ভবত তিনি কুরাইশদের উপর আক্রমণ করবেন,’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন। তারপরেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনো কথা বললেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করলেন, হয়তো আয়েশা এ ব্যাপারে কিছু

জানেন না। অথবা তিনি বিষয়টি গোপন রাখতে চাচ্ছেন। যা হোক, বিষয়টি তার কাছে বেশিক্ষণ গোপন থাকেনি। একটু পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি কোনো সফরে বের হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন (যেন এ সফর সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই), ‘সম্ভবত আপনি রোমানদের উপর আক্রমণ করবেন!’ রাসূলুল্লাহ বললেন, ‘না।’ তাহলে কি আপনি নাযদ গোত্রের উপর আক্রমণ করবেন?’ ‘না।’ তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এবং অন্য কোনো ধারণা মনে না আসাতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে নিশ্চয়ই আপনি মক্কার কুরাইশদের উপর আক্রমণ করবেন!’ এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাদের সাথে কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা চুক্তিবদ্ধ নই?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, ‘তোমার কাছে কি এ সংবাদ পৌঁছেনি যে, তারা বনু খুযাআ গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছে?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তাদের প্রাপ্য পাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী মক্কা অভিযানে বের হলো। এ অভিযানে শুধু মদীনাবাসীরাই शामिल ছিলেন না, আশেপাশের অনেক গোত্র-উপগোত্রের মুসলমানরাও যোগ দিয়েছিলেন। মুহাজির এবং আনসারদের সবাই এ অভিযানে যোগদান করেছিলেন। মদীনা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়।

আবু বকর রা.-এর মক্কায় প্রবেশ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘কাদা’ এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। কাদা মক্কা শরীফের সবচেয়ে উঁচু এলাকা। এখান দিয়ে প্রবেশ করে তিনি হাসসান ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওয়াদা পূরণ করেন। কবি হাসসান ইবনে

সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোপাত্মক কবিতা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লেখেন যে, আল্লাহর বাহিনী মক্কা শরীফে কাদা দিয়ে প্রবেশ করবে। তিনি আরও লেখেন যে, মুসলমানদের ঘোড়াগুলো ধূলি উড়িয়ে প্রবেশ করবে। আর শহরের মহিলারা এসব ঘোড়াগুলোর মুখে নিজেদের ওড়নার আঁচল বুলিয়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করার সময় একই দৃশ্য দেখতে পেলেন, তখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘হে আবু বকর! হাসসান কি কবিতা লিখেছিল?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাসসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধ

মুসলমানরা হুনাইনের যুদ্ধে একটি বিস্ময়কর শিক্ষা লাভ করেন। এ যুদ্ধের প্রথম দিকে তারা পরাজয় এবং চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। কাফেরদের অকস্মাৎ আক্রমণ এত ভয়াবহ ছিল যে, প্রায় সব মুসলমান যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে শুরু করল। এটা ছিল এক চরম দুঃসময়। নিজের জান বাঁচানো ছাড়া কারও আর অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে যেখানে ছিলেন, সেখানেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘হে লোকসকল! তোমরা কোথায়? আমার দিকে ফিরে আস। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। হে আনসারেরা! আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই তার চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর গলার আওয়াজ বড় ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘হে আব্বাস! চিৎকার করে সবাইকে ডাকুন। হে আনসারেরা, হে সামুরার লোকসকল (সামুরা একটি

গাছের নাম যেখানে মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মেনে চলার এবং তাকে অনুসরণ করার শপথ করেছিল।’

যুদ্ধের শুরু দিকে অবস্থা এমনই কঠিন ছিল। কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার গুটিকয়েক সাহাবীদের একটি দল ছাড়া সবাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছিল। আর যারা রাসূলের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম। কিছুক্ষণ পরেই মুসলমানদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হলো। যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে এল। আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

রাসূল সা.-এর উপস্থিতিতে আবু বকর রা. শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করলেন

হুনাইনের যুদ্ধের সময় আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন মুসলমানকে দেখলেন শত্রুপক্ষের একজন সৈন্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছে। একই সময় আরেকজন মুশরিককে দেখলেন যে, সে মুসলমানকে হত্যার উদ্দেশ্যে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। আবু কাতাদাহ ঘটনার আকস্মিকতায় যথাসম্ভব দ্রুত ঐ মুশরিককে আক্রমণ করলেন। মুশরিক সৈন্যটি আবু কাতাদাহকে তার উপর আক্রমণ করতে দেখে সে তার তরবারি উঠাল। কিন্তু আবু কাতাদাহ ছিলেন খুবই ক্ষীপ্র। তিনি আগে আঘাত করে মুশরিকের এক হাত কেটে ফেললেন। তখন সে অন্য হাত দিয়ে আবু কাতাদাহকে ঝাপটে ধরল। সে এমনভাবে আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঝাপটে ধরল যে, তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কায় তার মনে হলো, আজই জীবনের শেষ দিন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অধিক রক্তপাতের কারণে দুর্বল হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। তখন আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ মুশরিককে হত্যা করেন।

পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে এবং এর পক্ষে প্রমাণ দিতে পারবে, তার যাবতীয় জিনিস হত্যাকারী পাবে।’ আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু উপরের ঘটনার সত্যতার জন্য সবার দিকে তাকালেন। কেউ তার পক্ষে স্বাক্ষর দিল না। তখন তিনি বসে পড়লেন। তবে তিনি আশা ছাড়লেন না। তিনি আবার দাঁড়ালেন এবং সবিস্তারে তার ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলেন। তখন কুরাইশ বংশের একজন বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু কাতাদাহর কথা সত্য। ঐ নিহত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিসপত্র আমার কাছে আছে। এগুলোর ব্যাপারে তাকে আমার সাথে আপোষ করিয়ে দেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘কক্ষণো না। এগুলো আল্লাহর সিংহগুলোর একটি সিংহকে বাদ দিয়ে কুরাইশ বংশের কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে না (আবু কাতাদাহ আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য লড়াই করেছে)।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়ালেন এবং সমুদয় জিনিসপত্রের আবু কাতাদাহকে দিয়ে দিলেন। এগুলো দিয়ে আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি বাগান কিনেছিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন, ‘এটাই ছিল আমার জীবনে আমার মালিকানাভুক্ত প্রথম সম্পদ।’

এই গল্প দু-জন সাহাবীর মহান গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমত, আবু কাতাদাহ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে আরেকজন মুসলমানকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এত বেশি স্বচ্ছ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, তিনি নিজের বংশের লোকের বিরুদ্ধে একজন আনসারের জন্য তর্ক করেছেন। কারণ তিনি গোত্রপ্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্য এবং ন্যায়ের মূর্তমান প্রতীক।

আব্বাস ইবনে মিরদাসের কবিতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাগ্মী ছিলেন। তিনি কবি ছিলেন না। তার কাব্য প্রতিভা

অন্যান্য আরব কবিদের চেয়ে দুর্বল ছিল। তার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ এই ছিল যে, মক্কার কুরাইশরা তাকে নবী হিসেবে মানত না। বরং তাকে কবি বলে আখ্যায়িত করত। নিচের ঘটনা দিয়ে এর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল বন্টন করার পর আল-আব্বাস ইবনে মিরদাস নামে এক ব্যক্তি একটি কবিতা রচনা করে। এতে তিনি শুধু প্রতিবাদই করেননি, বরং তাকে কম গণিমতের মাল দেওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দোষারোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কবিতার কথা জানতে পেরে সাহাবীদেরকে আদেশ দিলেন, ‘যাও, তার জিব কেটে আমার কাছে নিয়ে আস।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে যা বলেছেন, তা বোঝাননি। বস্তুত তাকে বেশি করে গণিমতের মাল দিয়ে তার মুখকে বন্ধ করতে বলেছেন। সাহাবীরা তাই করেছিলেন। তাকে এত বেশি গণিমতের মাল দেওয়া হলো যে, সে তখন আর প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পেল না। পরে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

فَأَصْبَحَ فَهْبِي وَلَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعَيْنِيهِ —এটা কি তোমার কবিতা?

কবিতাটি পড়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করে তার কবিতার শেষ দু-টি শব্দ আগে-পিছে বললেন। এই ভুল বুঝতে পেরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কবিতাটি ঠিক করে আবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবিতাটি এভাবে হবে,

بَيْنَ عَيْنِيهِ وَالْأَقْرَعِ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ভুল ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি যা বলেছ আর আমি যা বলেছি—দু-টিতেই একই অর্থ প্রকাশ করে।’ (এখান থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা

ধরতে পারেননি যে, কবিতার শব্দ এদিক-সেদিক করলে কবিতার ছন্দ ঠিক থাকে না।) কাব্য প্রতিভার এ প্রকাশ দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বয় প্রকাশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি তা-ই আল্লাহ যা আপনার ব্যাপারে বলেছেন।’ তারপর তিনি কুরআন মাজীদে এই আয়াত তিলওয়াত করেন,

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

আমরা রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো একটি উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন।^{৭৬}

আত-তায়েফ

মুসলমানরা যেভাবে বনু নাযির এবং খায়বার অধিবাসীদেরকে অবরুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল, তেমনভাবে তারা তায়েফকে দীর্ঘ অবরোধ করেও সহজে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারছিল না। মুসলমান বাহিনী বিভিন্নভাবে অনেকবার তায়েফের দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ দুর্গ কখনই ভেদ করা যাবে না। বেশ কিছু মুসলিম সৈন্য দুর্গের গেটে ঢোকার চেষ্টা করে আহত হয়েছেন এবং অনেকে শহীদও হয়েছেন। এ যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন। তীরের আঘাতে আহত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা ফিরে আসতে সক্ষম হন। তবে ক্ষত আর ভালো হয়নি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের কিছুদিন পরই শাহাদত বরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু-টি পথ খোলা ছিল। হয় তিনি এ অবরোধকে আরও দীর্ঘায়িত করতে

পারেন যাতে তারা বাধ্য হয়েই একদিন আত্মসমর্পণ করবে। কারণ তাদেরকে বাইরের জগত হতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। কোনো ধরনের রসদ সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা ছিল না। অথবা তিনি তায়েফবাসীকে ছেড়ে দিয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিতে পারেন। এটা হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। কিন্তু এর অনেক যৌক্তিক কারণ ছিল। যখন তায়েফ অবরোধ করা হয়েছিল, তখন এটা ছিল ইসলামের সমুদ্রে অবিশ্বাসীদের একটি দ্বীপ। মক্কা কেবল বিজিত হয়েছে। কুরাইশরা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে। আশেপাশের অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও ইসলাম কবুল করছে। এ হিসেবে তায়েফবাসীরা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ছিল না এবং কোনোভাবেই ইসলামের জন্য বড় কোনো হুমকি ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন, যদি তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা খুব শীঘ্রই এ সত্যতা স্বীকার করবে যে, ইসলামই এখন আরবে একমাত্র প্রভাবশালী ধর্ম। এবং সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। অল্প কিছু দিন পরেই তায়েফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায গমন করে এবং নিজেদেরকে ইসলামে দাখিলের ঘোষণা দেয়।

যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল মদীনার কাছাকাছি এল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-মুগিরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে দেখে তাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একটি অনুমান করলেন। তারপর দু-জনের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হলো কে আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই খুশির সংবাদ দিবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই আগে রাসূলের কাছে পৌঁছলেন এবং তায়েফ থেকে আগত কাফেলার সুসংবাদ দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই তায়েফ প্রতিনিধিদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়। তারা বেশ কিছুদিন মদীনায অবস্থান করে ইসলামের আহকাম যতটুকু সম্ভব শেখার চেষ্টা করে। তাদের যখন ফেরার সময় হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি

অফিসিয়াল চিঠি দিতে চাইলেন যাতে তিনি সাকিব গোত্রের জন্য একজন নেতার নাম উল্লেখ করবেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নেতা হিসেবে উসমান ইবনে আবুল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম প্রস্তাব করেন। তিনি ছিলেন বয়সে নবীন এবং তায়েফ প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে কম অভিজ্ঞ। এটা খুব অবাক করা একটি প্রস্তাব ছিল। তবু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইসলামের জন্য তাকেই বেশি কর্মঠ এবং আন্তরিক মনে হয়েছে। অন্যরা দুপুরে যখন বিশ্রামে ছিল, তখন এই উসমান ইবনে আবুল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুই সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে ইসলাম, কুরআন এবং শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। আর যদি কোনোদিন তিনি দেখতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দীন শেখার জন্য যেতেন। তার এই শেখার আগ্রহ এবং চেষ্টা আবু বকর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-জনকেই সন্তুষ্ট করে। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহূর্তেই একমত পোষণ করেন এবং উসমান ইবনে আবুল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তায়েফের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তায়েফ থেকে আরেকটি প্রতিনিধিদল মদীনায গমন করে। তাদের এ আসাটাও আনন্দের ছিল। তবে তাদেরকে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলের শহীদ হওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার ঘটনা কষ্টের, তবু এখানে তায়েফ প্রতিনিধিদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবহার অপূর্ব। আল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তায়েফ যুদ্ধের সময় একটি তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। তিনি এ আঘাতের যত্ননায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের চলিশ দিন পর শাহাদত বরণ করেন। তার ইন্তেকালের পরেই তায়েফ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মদীনা সফর করে। আবু

বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তখনো ঐ তীরটি মজুদ ছিল যেটা তার ছেলেকে যখম করেছিল। তিনি সেটা বের করে প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই তীরটি সনাক্ত করতে পারবে?’ সাঈদ ইবনে উবাইদ (বনু আজলানের ভাই) বললেন, ‘হ্যাঁ, আমিই এটাকে তৈরি করেছি, তার মাথায় পেখম লাগিয়েছি. . . এবং ঐদিন তীরটি ছুড়ে মেরেছি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে ফিরে বললেন, ‘অবশ্যই এই তীর আব্দুল্লাহকে শহীদ করেছে। সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে তোমার হাতের উসিলায় সম্মানিত করেছেন এবং যে তার হাতে তোমাকে অপমানিত করেনি (যিনি আব্দুল্লাহকে তায়েফ অবরোধের সময় তোমাকে হত্যা করার সুযোগ দেননি, বরং তোমাদেরকে এক দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা ইসলাম কবুল কর)। বস্তুত তিনি তোমাদের উভয়ের জন্য বিষয়টিকে প্রশস্ত করেছেন এবং সহজ করেছেন।’

তাবুক যুদ্ধ, নবম হিজরীতে হজ্জ এবং বিদায় হজ্জ

সমগ্র আরব উপত্যকা যখন মুসলমানদের প্রায় দখলে, তখন সবচেয়ে নিকটে এবং আতঙ্কের হুমকি ছিল মদীনার উত্তরে রোমান সাম্রাজ্য। রোমানরা মুসলমানদের চিহ্নিত শত্রু। অনেকবার তারা নিকটতম মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে। রোমানদের বংশদ্ভূত পরিচিত বা অপরিচিত কেউ খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলে তার উপর নির্যাতন, এমনকি হত্যাও করেছে।

রোমানরা মুসলমানদের জন্য একটি নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়াল। তারা বহিঃশত্রু হিসেবে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার তৎপরতা শুরু করল। বস্তুত রোমানরা ঐসময়কার দু-টি পরাশক্তির একটি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরিস্থিতিতে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের একটি বিশাল বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রেরণ করলেন। যদিও সমগ্র আরব মুসলমানদের আয়ত্বে চলে এসেছে, তবু বিশ্বামের কোনো সুযোগ ছিল না। মদীনার উত্তরে

মুসলমানদের চিরশত্রু রোমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে যদি তারা রোমানদের মনে মুসলমানদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ভীতি সঞ্চার করার আশা করে। আর সত্যের বাহক হিসেবে মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী ছিল যে, আরবের বাইরে এ সত্যকে প্রচার-প্রসার করা।

অন্যান্য যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যখন মুসলিম সেনাবাহিনী সানিয়াতুল ওয়াদা নামক স্থানে পৌঁছল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য বেশ কয়েকজন সেনাপতি নির্বাচন করলেন। তাদেরকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। সবচেয়ে বড় পতাকাটা তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দিলেন। এতে এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু।

এই যুদ্ধে অনেক ঘটনাতেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কিছু ঘটনা তার উন্নত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে সমুন্নীত করেছে। আর অন্যান্য সব ঘটনাও তার নেতৃত্ব, উপদেশ এবং পরম বন্ধু হিসেবে সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে অবস্থানকে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করে। উদাহরণ হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তাবুকের যুদ্ধে কোনো এক দিন আমি মধ্য রাতে জেগে উঠি। বাইরে বের হয়ে আমি দূরে আগুন জ্বলতে দেখতে পাই। সেদিকে অগ্রসর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পাই। সেখানে আরেকটা মৃতদেহ দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ যুল-বিযাদাইন আল-মুযানি। রাসূলুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) বললেন, ‘তোমার ভাইকে আরও কাছে নিয়ে আস।’ তারা তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কবরের এক পাশে শোয়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তার উপর সন্তুষ্ট, আপনিও তার উপর রাজি হয়ে যান!’

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলে উঠলেন, ‘আহ! আমি যদি এই কবরের বাসিন্দা হতাম!’ ঘটনাক্রমে হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো মুসলমান ভাইকে কবরে রাখতেন, তখন তিনি বলতেন, ‘আল্লাহর নামে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত ইসলামের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমি তাকে কবরে রাখলাম।’

এই যুদ্ধের সময় একবার পানির সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। সাহাবীদের মনে হচ্ছিল, পানির অভাবে গলা ফেটে যাবে। এ সময় একজন তার উটকে জবাই করল যেন তার পেটে জমানো পানি পান করতে পারে। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সুন্দর ভাষায় দু‘আ করতে শিখিয়েছেন। আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দু‘আ করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, ‘সত্যিই তুমি এটা ভালোবাস যে আমি দু‘আ করি?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ।’

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-হাত তুলে দু‘আ করলেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাত নামালেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আকাশের রং পরিবর্তন হয়েছে। তখন আকাশে একখণ্ড মেঘ এসে মুসলমানদের উপর ছায়া দিল। আর ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। সব সাহাবীরা তৃপ্তিসহ পানি পান করল এবং যার যা ছিল পানিতে ভরে নিল। কয়েকজন সাহাবী মুসলমানদের বেষ্টনীর সীমানায় হাঁটছিলেন। তারা বেষ্টনীর বাইরে বৃষ্টি না দেখে অবাক হলো।

তাবুকের যুদ্ধে বিশাল অর্থের প্রয়োজন ছিল। ত্রিশ হাজার সৈন্য বহরের দীর্ঘ দিন ধরে মরভূমির পথে চলার জন্য বিশাল পরিমাণ রসদ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এর মধ্যে

ছিল খাদ্য, পানীয়, ঘোড়া, গাধা, উট, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ। আর এর জন্য সাহাবীদের সামান্য অনুদান যথেষ্ট ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে যত বেশি সম্ভব আল্লাহর পথে সাহায্য করতে বললেন। সাহাবীরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে যথোপযুক্ত সাড়া দিয়েছিলেন। তাদের সাধ্যমতো তারা মুক্তহস্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সময় সকলের চেয়ে বেশি দান করেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। এ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি তার সম্পদের অর্ধেক দান করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বেশি দিতে পেরেছেন বলে মনে করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরে বলেছেন, ‘তারুক যুদ্ধের আগে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দান করতে বললেন। আর এ সময় আমার সম্পদের পরিমাণও ছিল বেশি। আমি মনে করলাম, যদি আবু বকর থেকে বেশি কিছু করার সুযোগ থাকে, তবে আজ সেদিন। আমি তখন আমার সম্পদের অর্ধেকই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি আপনার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন?’ আমি বললাম, ‘একই পরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তার সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন?’ তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে এসেছি।’ আমি তখন তাকে বললাম, ‘আমি কখনো আপনাকে পেছনে ফেলতে পারব না।’

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বীনি কাজে যে ইর্ষা করেছেন এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ

হয়েছেন, তা বৈধ ছিল। পক্ষান্তরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ছিল এর চেয়ে উত্তম। তিনি যা করেছিলেন, তা নিজ থেকেই করেছিলেন। তার দৃষ্টি অন্য কারও দিকে ছিল না।

নবম হিজরীতে আমীরুল হজ আবু বকর রা.

বিগত বছরগুলোতে মুসলমানরা হজ করতে পারেনি। মক্কার লোকেরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি। মক্কা বিজয়ের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। অষ্টম হিজরীতে আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হজ কাফেলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের হজ করার বিধানের সাথে মুশরিকদের বিধানের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না।

নবম হিজরীতে হজ করার সময় যখন এল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরে হজ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ হিসেবে বললেন, ‘এখনও কাবা শরীফে মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন না হয়, আমি সেখানে হজ করতে যেতে চাই না।’ যদিও মক্কায় মুসলমানদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল, তথাপি বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে তখনো মুসলমানগণ সন্ধিতে আবদ্ধ ছিল। আর এর সুযোগ তখনো মুশরিকরা ভোগ করছিল।

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি উলঙ্গ মুশরিকদের পাশাপাশি হজ করবেন। এজন্য তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সে বছর হজ কাফেলা পরিচালনা করতে বললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমীর হিসেবে বিরাট সংখ্যক সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হলেন। তিনি সাথে কুরবানীর পশুও নিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা শরীফ থেকে রওনা হওয়ার অনতিকাল পরেই সূরায়ে বারাত (সূরা তওবা) নাযিল হয়। উক্ত

সূরায় কাফেরদের বিষয়ে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এক কথায় এই দুই গ্রন্থের মধ্যে সব চূড়ান্ত সমাপ্তির কথা রয়েছে। যেহেতু হজে সব কাফের এবং মুসলমানরা সমগ্র আরব উপত্যকা থেকে আসবে, এজন্য এ আহকামগুলো বর্ণনা করে দেওয়া জরুরী ছিল। তাহলে যারা হজে আসবে, তারা তাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের এ ব্যাপারে অবহিত করতে পারবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে মক্কার পথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মিলিত হতে আদেশ দিলেন।

হজ কাফেলা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যুল-হুলাইফা নামক স্থানে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ অবস্থায় আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমীর হয়ে এসেছেন না আজ্জাবহ হয়ে এসেছেন?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আসার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, এ জামাতের আমীর কে হবে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘আমি আজ্জাবহ হয়ে এসেছি।’

তারপর তারা একই কাফেলায় হজের জন্য মক্কার পথে এগুতে থাকেন। ইসলাম পূর্ব যুগে তারা যে পথে হজের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কার যেতেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই পথ অবলম্বন করলেন। হজ ঐ বছর যিলহজ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেকে যিলকদ মাসের কথা বলেন যা সঠিক নয়।

এই হজে বিভিন্ন সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুতবা দিতে হয়েছে। এসব খুতবায় তিনি হাজীদেরকে হজের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। এ সময় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পাশেই থাকতেন এবং অনেক সময় তিনিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খুতবার সাথে আরও কিছু কথা যোগ করতেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজীদের উদ্দেশ্যে সূরা বারআতের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন। অবশেষে তিনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন:

১। ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

২। উলঙ্গ অবস্থায় এখন থেকে আর কেউ কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদের যে সন্ধি আছে, তা চুক্তির নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এ চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না।

৪। এ বছর থেকে আর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না।

এ ঘোষণা দেওয়া আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্ব ছিল। হাজার হাজার হাজীদের জন্য তার কথাগুলো শোনা সহজ ছিল না। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি দল গঠন করেন। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাগুলো সবার কানে পৌঁছে দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হজ কাফেলার আমীর হিসেবে পাঠাননি। তাকে এই ঘোষণাগুলো দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছিলেন। যেসব আরব গোত্র এ হজে শরীক হয়েছিল, তাদের জন্য এ ঘোষণা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্যান্য গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি প্রসঙ্গে যা আর বর্ধিত করা হবে না। তখন আরবে চুক্তি বাতিল অথবা বর্ধিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোত্রপ্রধান অথবা তার পক্ষে তার কোনো নিকটাত্মীয় এ ঘোষণা দিত। এটা যেহেতু ইসলামের সাথে বিরোধী কোনো বিষয় ছিল না, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এখান থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। শিয়ারা এখানে বাড়াবাড়ি করে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ ঘোষণা দিতে

পাঠিয়েছিলেন, এজন্য তারই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর প্রথম খলীফা হওয়ার অগ্রাধিকার ছিল। তারপরেও, আমি জানি না কিভাবে তারা এটা পাশ কাটিয়ে যায় যে, যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পরিকারভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি আমীর হয়ে এসছেন না আজ্জাবহ হয়ে এসেছেন? আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে আজ্জাবহ হয়ে এসেছেন বলে জানান। এটা আমার বোধগম্য নয় যে, কিভাবে একজন আজ্জাবহ খলীফা হওয়ার জন্য একজন নেতা থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে! এখানে মনে রাখতে হবে, এই নেতা অন্য কেউ নিয়োগ করেননি। এটা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং।

বিদায় হজ্জ

ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজের জন্য রওনা হলাম। আমরা যখন ‘আরাজ’ উপত্যকায় পৌঁছলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনজিল করার জন্য সওয়ারী থেকে নামলেন। আয়েশা রাসূলের পাশে বসল। আর আমি বসলাম আবুর পাশে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর রসদের বোঝা একটি ছিল, যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলামের সাথে ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গোলামের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে সে আসল, কিন্তু তার সাথে তার উট ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার উট কোথায়?’ সে বলল, ‘গত রাতে আমি তা হারিয়ে ফেলেছি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘একটি মাত্র উট, তাও আবার হারিয়ে ফেলেছ?’ এ কথা বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রহার করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম মুচকি হাসছিলেন এবং বললেন, ‘দেখ, দেখ, এ মুহারিম ব্যক্তিকে—সে ইহরাম অবস্থায় কী করছে!’”

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হজ পরবর্তী বছরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজের পথকে সুগম করে দেয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হজের সময় এটা সর্বত্র ঘোষণা করা হয় যে, এবছর থেকে আর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ হজ করতে পারবে না। আরব উপত্যকায় মুশরিকদের জন্য কেবল দু-টি পথ খোলা ছিল। হয় তারা মুসলমান হবে অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ঐ বছর যেসব গোত্রপ্রধান হজ করতে এসেছিল, তারা তাদের গোত্রের লোকদেরকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘোষণা শুনিয়ে দেয়। তখন তারা এটা ধরে নেয় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই শক্তিশালী এবং মুশরিকদের যুগ ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। এজন্য বিষয়টি নিয়ে গভীর কোনো চিন্তার অবকাশ ছিল না। গোত্রপ্রধানরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে খুব ভালো করেই বুঝতে পারল। তারা তখন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে নিজেদেরকে ইসলামে দাখিল করে নিল। এজন্য ঐবছরকে বলা হয়, ‘প্রতিনিধিদলের বছর।’



পঞ্চম অধ্যায়

মদীনায়ে আবু বকর রা.-এর জীবন এবং তার কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী

এক। এক নজরে তার মদীনার জীবন

ক। মদীনার এক ইহুদী ধর্মযাজক ফিনহাসের সাথে তার বিরোধ

একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিরদাসে প্রবেশ করলেন। মিরদাস ইহুদীদের একটি উপাসনালয়। এখানে মূলত তাওরাত তিলাওয়াত করা হতো। মিরদাসে ঢুকেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল ফিনহাস, ইহুদীদের একজন বড় পণ্ডিত। আর ফিনহাসের পাশে আরেক ইহুদী পণ্ডিত আসইয়া বসে ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিনহাসের দিকে অগ্রসর হলেন। উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোমাদের জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় কর। ইসলাম করুল কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই জান যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য সহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। আর এ সত্যের কথা তোমাদের পবিত্র কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জিলে লেখা আছে।’ ফিনহাস তখন জবাব দিল, ‘আল্লাহর কসম, হে আবু বকর! আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং আমাদেরকে আল্লাহর প্রয়োজন। আমরা তার কাছে কিছু চাই না তিনি যেভাবে আমাদের কাছে চান। তার মানে আমাদের জন্য আল্লাহর দরকার নেই। বরং আল্লাহর জন্য আমাদের প্রয়োজন। যদি আমাদেরকে তার প্রয়োজন

না হতো, তাহলে তিনি আমাদের কাছে করযে হাসানা চাইতেন না যা তোমার সঙ্গী-সাথীরা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুদের কাজ-কারবার নিষিদ্ধ করেছেন, আর তিনি আমাদেরকে তা দান করেছেন। তিনি যদি সত্যিই ধনী হতেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে সুদের কাজ-কারবার করার অনুমতি দিতেন না।' ফিনহাসের কথায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ড গোস্বা হলেন এবং চরম কষে তার গালে একটি থাপ্পর মেরে বললেন, 'আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন, হে ইসলামের দুশমন! যদি তোদের সাথে কোনো চুক্তি না থাকত, তাহলে আজ আমি তোরা কল্লা উড়িয়ে দিতাম।' ফিনহাস এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে নালিশ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি তোমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে?' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'অবশ্যই এই আল্লাহর শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে কথা বলেছে। সে বলে, আল্লাহ গরিব এবং তারা ধনী। সে যখন এ জঘণ্য কথা বলেছে, আমি তখন রেগে গিয়ে তার গালে থাপ্পর মেরেছি।' ফিনহাস মিথ্যা বলল। সে এ ধরনের কোনো কথা বলেনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানাল। আল্লাহ তা'আলা তখন কুরআন শরীফের আয়াত নাযিল করলেন যেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সততা এবং ফিনহাসের মিথ্যুক চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়,

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا

عَذَابَ الْحَرِيقِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি

তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আশ্বাদন কর জুলন্ত আগুনের আযাব।^{৭৭}

আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে ফিনহাসের সাথে রাগ প্রকাশ করেছেন, এজন্য আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন,

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۖ وَإِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

‘অবশ্য ধন-সম্পদ এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেয়গারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।’^{৭৮}

খ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর গোপন তথ্যের হেফাজত

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিধবা হয়ে গেলে আবার বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজ হচ্ছে। তার প্রথম স্বামীর নাম ছিল খুনাইস ইবনে হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বদরী ছিলেন। হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইদতকাল শেষ হয়েছে। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ‘আমি একুট চিন্তা-ভাবনা করি।’ আবার যখন দু-জনের দেখা হলো, তখন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমি এখন বিয়ে করব না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একই প্রস্তাব দিলেন। তিনি চুপ

^{৭৭} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৮১।

^{৭৮} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৮৬।

থাকলেন। হ্যাঁ অথবা না কিছুই বললেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরে বলেছেন, আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিরবতায় বেশি কষ্ট পেয়েছি।’ তারপর তিনি বলেন, ‘কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তখন হাফসাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে দেই। এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে দেখা করে বলে, ‘সম্ভবত তুমি আমার নিরবতায় কষ্ট পেয়েছ।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তখন তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমার মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুনেছি। এজন্য আমি চুপ ছিলাম। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি হাফসাকে বিয়ে না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি বিয়ে করতাম।’

আবু বকর রা. এবং জুমু‘আর নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন খাদ্য-শয্য নিয়ে একটি কাফেলা মদীনায় আগমন করে। তখন সাহাবীরা খুতবা শোনা ছেড়ে কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়। মাত্র বারো জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। এ ঘটনায় আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِلًا قُلْ مَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

‘তারা যখন কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।’^{৭৯}

যাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এই বারো জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু।’

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের ব্যাপারে আবু বকর রা. সম্পর্কে রাসূল সা.-এর ঘোষণা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেউ যদি অহংকারবশতঃ টাখনুর নিচে কাপড় পড়ে জমিনে ছেঁচড়িয়ে চলে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।’ এই হাদীস শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি যদি সারাক্ষণ পায়জামা ধরে না রাখি, তাহলে এটা টাখনুর নিচে নেমে যায়। (এর জন্য কি আমাকে পাকড়াও করা হবে?)’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আপনি তো সেটা অহংকারবশতঃ করেন না।’

হালাল রিষিকের ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর সতর্কতা

প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত হারাম থেকে বেঁচে থাকা। এরকম সব মুসলমানেরই সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকাও জরুরী। প্রথম যুগের মুসলমানরা এমন হালাল জিনিস থেকেও বেঁচে থাকতেন যেগুলোর দ্বারা হারাম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। এ ধরনের মুসলমানদেরকে বলা হতো ‘ওয়ারা।’ আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ওয়ারার শীর্ষ ব্যক্তি।

একটি ঘটনা তার এই ব্যক্তিত্বকে আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলে। কাইস ইবনে আবু হাযিম বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একজন দাস ছিল। যখনই সে কোনো খাবার নিয়ে আসত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ খাবারের উৎস না জেনে খেতেন না। তার মানে হালাল হলেই কেবল খাবার খেতেন। আর যদি হারাম

হওয়ার ব্যাপারে কোনো রকমের একটু সন্দেহ হতো, সেটা খেতেন না। একদিন রাতে গোলাম যে খাবার দিয়েছে, কিছু জিজ্ঞেস না করেই খেতে শুরু করেছেন। কয়েক লোকমা খাওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গোলামকে খাবারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। (এ খাবার ছিল সদকার খাবার যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য হালাল ছিল না)। গোলামের জবাব শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব আহত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন। এ চেষ্টা ততক্ষণ পর্যন্ত করে গেলেন যে পর্যন্ত না তার একিন হয় যে, পেটে আর কোনো হারাম দানা নেই। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীসের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, হালাল খাবার খেলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন। নতুবা দু'আ কবুল হয় না।

আমাকে আপনাদের সন্ধির মধ্যে বসার অনুমতি দিন, যেভাবে আমাকে আপনাদের বিবাদের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়েছেন

একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়িতে গেলেন। মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন একটু উচ্চ স্বরে কথা বলছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা শুনতে পেয়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তাড়াতাড়ি ধরতে যান। এ সময় তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলতে দেখছি।' এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মারতে উদ্যত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-জনের মাঝখানে গিয়ে আড়াল হয়ে দাঁড়ালেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'দেখলে, আমি কিভাবে তোমাকে তার হাত থেকে বাঁচালাম?' এ ঘটনার কয়েকদিন পর আবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়িতে গেলেন। এবার গিয়ে তিনি শান্ত পরিবেশ পেলেন। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে আপনাদের সন্ধির মধ্যে বসার

অনুমতি দিন, যেভাবে আমাকে আপনাদের বিবাদের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, 'আমরা তাই করলাম।'

সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ

একবার ঈদের দিনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখতে গেলেন। তখন তার সাথে আরও দু-জন অল্পবয়সী আনসারী মেয়ে ছিল। তারা গান গাচ্ছিল। এটা দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে শয়তানের বাঁশী কেন বাজানো হচ্ছে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঘরেই ছিলেন। তিনি মেয়েদের থেকে দৃষ্টি আড়াল করে দেয়ালের দিকে ফেরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'তাদের ছেড়ে দাও। প্রতিটি জাতিরই একটি খুশির দিন থাকে। আজ আমাদের ঈদের দিন।'

এ হাদীস থেকে পরীক্ষার জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের এরূপ করার অভ্যাস ছিল না। তাদের মধ্যে গান গাওয়া এবং শোনা হতো না। এজন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের গান গাওয়াকে শয়তানের বাঁশী বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন হিসেবে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ ঈদের দিনে ছোট শিশুদের খেলাধুলা ও আনন্দ করতে দেওয়া উচিত। অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি কারণ বলেছেন, 'মুশরিকরা জানুক যে, ইসলামেও আনন্দ-উৎসবের উদারতা (একটি পর্যায় পর্যন্ত) আছে।'

হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কিছু খেলনা ছিল। তিনি তার মতো অল্পবয়সী বালিকাদের সাথে সেগুলো দিয়ে খেলতেন। আলোচ্য দুই বালিকার হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গান শোনার চেষ্টা করেছেন, এ কথা

নেই। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা মনোযোগ বা ইচ্ছাকৃত গান শোনার ব্যাপারে। শুধুমাত্র কানে আওয়াজ পৌঁছার সাথে নিষেধের সম্পর্ক নেই। এখান থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা এই যে, যারা খেলাধুলার উপযুক্ত, যেমন আনসারী ছোট বালিকারা, তাদের জন্য ঈদ ও উৎসবে একটি পর্যায় পর্যন্ত খেলাধুলা করার অনুমতি আছে।

অতিথিদের সম্মান

মদীনায় আসার পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হন। অনেক মুসলমান তখন হিজরত করে মদীনায় আসা শুরু করেছে এবং তাদের বেশিরভাগই ছিল নিঃস্ব। এটা সত্যি যে, তাদের অনেকে খুব সম্পদশালী ছিল। কিন্তু মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে তারা যে অবস্থায় হিজরত করেছে, তাতে কোনো কিছুই সাথে আনা সম্ভব হয়নি। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু পদক্ষেপ নিলেন। যখনই কোনো মুহাজির মদীনায় আসত, তখনই একজন আনসারকে তার মেজবান বানিয়ে দেওয়া হতো। এই আনসার সাহাবী তার মুহাজির ভাইয়ের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু যখন মুহাজিরদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল এবং আনসারদের পক্ষে সবাইকে সাহায্য করা কষ্টকর হয়ে উঠল, তখন ভিন্ন কোনো সমাধানের প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে মসজিদে নববীর পেছনে জায়গা করে দিলেন। তাদের রোজগারের কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা এখানেই থাকতে লাগলেন। এ ধরনের সাহাবীদেরকে আসহাবে সুফফাহ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের রাতে আপ্যায়নের জন্য অন্যান্য সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করতেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাদের কাছে দু-জনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার আছে, সে যেন তৃতীয়

আরেকজনকে সাথে নেয়। আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম একজনকে সাথে নেয়।’ এ ঘোষণার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসহাবে সুফফা থেকে তিনজনকে রাতের খাবারের জন্য দাওয়াত দেন। তিনি, তার স্ত্রী এবং ছেলে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মেহমানদের আপ্যায়নের দায়িত্ব দেন। আর তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাতের খাবার খান। পরবর্তীতে তিনি বাসায় ফিরে যান। তখন তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কেন মেহমানদের রেখে দেবী করে আসলেন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি মেহমানদের কি খাইয়েছ?’ তার স্ত্রী জবাব দিলেন, ‘আপনি না আসা পর্যন্ত মেহমানরা খেতে রাজি হননি। তাদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা খাননি।’ এ সময় আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা-মার কথা শুনছিলেন। মেহমানদের আপ্যায়ন না করতে পারায় পিতা হয়তো তাকেই দোষী সাব্যস্ত করবে, এ ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে ফেললেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে মূর্খ!’ তারপর আরও কিছু শক্ত কথা বললেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তার মেহমানরা এখনও কিছু খাননি। তিনি তার ছেলের উপর শুধু নাখোশ হননি, বরং তিনি নিজের উপরও বিরক্ত হলেন এবং মেহমানদের উপরও বিরক্ত হলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মেহমানদেরকে খাবার খেতে বললেন। আর তিনি এ ঘটনায় এতই দুঃখ পেলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এ খাবার তিনি কখনই মেহমানদের সাথে খাবেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মেহমানরা বলে উঠল, ‘আমরাও এ খাবার খাব না যতক্ষণ না আবু বকর এখান থেকে খাবে।’

এ সময় হঠাৎ করেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভুল বুঝতে পারেন। নিজের অভিমানের জন্য অনুতপ্ত হন। তার শপথ সম্পর্কে বলেন যে, এটা শয়তানের কাজ। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, ‘এরকম অন্যায় শপথ করা আমার ভুল হয়েছে।’ তারপর তিনি

খেতে বসেন। তার সাথে মেহমানরাও খাওয়া শুরু করে। আর এভাবেই মেহমানরা একটি আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে যান। এ ঘটনা সম্পর্কে পরে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, যখনই আমরা এক লোকমা খাবার খেতাম, তার নিচে এর চেয়ে বড় খাবারের লোকমা এসে জমা হতো। সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্লেটে আগের চেয়ে বেশি খাবার পরে থাকে। শুরুতে যতটুকু খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল এর চেয়ে বেশি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও খুব অবাক হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে বনু ফিরাসের কন্যা, এর রহস্য কি?’ তিনি বললেন, ‘আমি এর কিছু জানি না। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এখানে শুরুতে যা দিয়েছিলাম, তার তিনগুণ খাবার রয়ে গেছে।’

অবশিষ্ট খাবারগুলো নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। ঐ খাবারগুলো তখন বারটা দলকে খাওয়ানো হলো। বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রতিটি গ্রুপে অনেক মানুষ ছিল। সবাই তৃপ্তির সাথে এই বরকতময় খাবার গ্রহণ করেন।

ঘটনা প্রবাহে এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ব্যতিক্রম কাজ করেছেন। তিনি প্রথমবারের মতো নিজের শপথ ভেঙ্গেছেন যা তিনি এর আগে কখনো করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো কোনো শপথ ভঙ্গ করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ ঐ বিষয়ে কোনো আয়াত নাযিল করেছেন যাতে শপথ ভাঙতে হয়।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরে বলেছেন, আমি যদি কখনো কোনো ওয়াদা করেছি (কিছু করার অথবা কিছু না করার) এবং পরবর্তী সময়ে এর চেয়ে ভালো কোনো কাজের সন্ধান পেয়েছি, আমি তখন ভালোটাই গ্রহণ করতাম এবং ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলতাম।’ এক্ষেত্রে তিনি মেহমানকে যে খাবার দেওয়া হয়েছে তা না খাওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। পরে তিনি অনুধাবন করেছেন যে, মেহমানদের সম্মানার্থে তার খাওয়াটাই

বেশি উত্তম। তিনি তৎক্ষণাৎ খেতে গেলেন এবং ওয়াদার কাফফারা আদায় করলেন।

এই গল্প থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও একজন মুহাজির এবং তিনিও মক্কায় তার সহায়-সম্পত্তি ফেলে এসেছেন। তিনি অন্যকে মেহমানদারী করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তবু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আসহাবে সুফফার পক্ষে রাতে খাওয়ানোর জন্য বলছিলেন, এজন্য তিনি তাদের তিনজনকে দাওয়াত করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন মহান ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা হয়তো খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। আল্লাহ তা‘আলা তার নিবেদিত বান্দাগণের প্রতি এরকম বরকতের ফায়সালা করেন।

‘হে আবু বকরের পরিবার, তোমাদের প্রতি এটাই প্রথম অনুগ্রহ নয়’

একবার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা একটি সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা বাইদা অথবা যাতুল জাইশে পৌঁছলাম। আমার একটি হার হারিয়ে গেল। সেটা খোঁজার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থানকে দীর্ঘ করলেন। অন্য লোকেরাও তার সাথে সেখানে অবস্থান করল। সেখানে কোনো পানির ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি সাহাবীগণের সাথেও কোনো পানি ছিল না। লোকেরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল, ‘আপনি কি জানেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কি করেছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সেই সাথে সব লোককে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। লোকদের কাছে পানি নেই এবং তারা পানি বিহীন স্থানে অবস্থান করছে।’ এ কথা শুনে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে

রওনা হলেন। তিনি সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার রানে মাথা রেখে ঘুমাতে দেখতে পেলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, ‘তুমি রাসূলসহ আমাদেরকে এমন জায়গায় থামতে বাধ্য করেছ যেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। আরও মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কাছে মজুদ পানিও শেষ হয়ে গেছে।’ এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তিরস্কার করছিলেন। এমনকি তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কোমরে খোঁচা দিচ্ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পরে বলেছেন, ‘যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার রানে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন, এজন্য আমি আবার খোঁচা খেয়েও নড়তে পারছিলাম না (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমালেন। ঘুম থেকে উঠেই অযু করতে চাইলেন। কিন্তু অযু করার মতো কোনো পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। এটা পানি না থাকলে পবিত্র হওয়ার জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন,

فَتَيَسَّرُ لَكُمْ اِذَا طَيَّبًا

পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর।^{৮০}

এ আয়াত মুসলমানদের জন্য এক বিরাট অনুগ্রহ। যেখানে পানি নেই, সেখানে অযু করার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন। এ অনুগ্রহের দিকে ইশারা করেই উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘হে আবু বকরের পরিবার, তোমাদের প্রতি এটাই প্রথম অনুগ্রহ নয়।’ অর্থাৎ তোমার পরিবারের মাধ্যমে আমরা আগেও বরকত পেয়েছি। সেগুলোর সাথে এটা যুক্ত হলো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

আনহা পরে বলেছেন, ‘তারপর আমরা আবার আমাদের গন্তব্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উটের উপর চড়ে বসলাম। আর যখন উট উঠে দাঁড়াল, তখন তার নিচেই গলার হারটি পাওয়া গেল।’

আবু বকর রা.-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষ্য

নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে এবং তাকে কোনো ধরনের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু-হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমাদের এ সাথী এই মাত্র কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।’ তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমার এবং উমর ইবনে খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, হে আবু বকর!’ এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

অতঃপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবু বকর কি বাড়িতে আছেন?’ তারা বলল, ‘না।’ তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি।’ এ কথাটি তিনি দু-বার বললেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবু বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তার জান-মাল সবকিছু দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথীকে অব্যাহতি দিবে?

এ কথাটি তিনি দু-বার বললেন। অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আর কখনো কষ্ট দেওয়া হয়নি।^{৮১}

এ ঘটনা থেকে বর্তমান প্রজন্মের সাথে সাহাবীদের যুগের একটি প্রধান পার্থক্য খুব সহজে বোঝা যায়। আমরা যেখানে অন্যের সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর বজায় রাখি, সেখানে সাহাবীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কত দ্রুত মীমাংসা করে ফেলেছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কঠিন শব্দ প্রয়োগ করে কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন এবং এজন্য মাফ চেয়েছেন। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মিটমাটের জন্য ছুটে গিয়েছেন।

এ ঘটনায় বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে :

- ✓ সাহাবায়ে কেরাম মানবীয় স্বাভাবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন না।
- ✓ তাদের মাঝে কখনো তর্ক-বিতর্ক হতো।

- ✓ যিনি ভুল করতেন, দ্রুতই সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করতেন।
- ✓ ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতেন।
- ✓ এক ভাই অন্য ভাইকে ক্ষমা করে দিতেন।
- ✓ তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর হৃদয়তা-ভালোবাসা ছিল।
- ✓ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা অনেক বেশি ছিল।

বলো, ‘হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।’

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাবিয়াহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটি জমি বরাদ্দ দিলেন। আর তার জমির পাশের জমিটি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিলেন। কয়েকদিন পর সীমানার মধ্যে একটি খেজুর গাছের মালিকানা নিয়ে দু-জনের মধ্যে বিরোধ হলো। দু-জনেই মালিকানা দাবী করছিলেন। যুক্তিতর্কেও এক পর্যায়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন কিছু বলে ফেললেন যেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হলেন। তখন তিনি রাবেয়াহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘হে রাবেয়াহ! তুমিও আমাকে একইরকম কিছু বলো যেন এর প্রতিশোধ হয়ে যায়।’ রাবেয়াহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি এ কাজ করব না।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে বললেন, ‘হয় তুমি আমাকে এ কথা বলবে (আমি যা বলেছি তা) নতুবা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তোমার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করব।’ কিন্তু তিনি কিছুতেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে রাজি হলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, ‘আমি এ কাজ করব না।’

তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন যে, তিনি এই খেজুর গাছের উপর তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাকে অনুসরণ করলেন।

এদিকে এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল। তখন রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের লোকেরা এসে তাকে বলতে লাগল, ‘আল্লাহ আবু বকরকে মাফ করুন। তিনি তোমাকে অনুচিত কিছু কথা বলেছেন। তাহলে কেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমার বিরুদ্ধে সাহায্য করতে বলবেন?’ তখন রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গোত্রের লোকদেরকে জবাব দিলেন, ‘তোমরা জান তিনি কে? তিনি আবু বকর আস-সিদ্দীক। তিনি হলেন দু-জনের একজন (সওর গুহায়) এবং মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি। সুতরাং খুব সাবধান। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন এটা দেখে না ফেলে যে তোমরা তার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ নিচ্ছ। তাহলে তিনি রাগ করবেন। আর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রাগান্বিত হবেন। আর তখন এ দু-জনের রাগের কারণে আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে। ফলে রাবিয়াহ ধ্বংস হয়ে যাবে।’ রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের লোকেরা বলল, ‘তাহলে তুমি আমাদেরকে কি করতে বলো?’ রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘তোমরা ফিরে যাও।’

তারপর রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু একাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথী হলেন। যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘটনার বিবরণ দিলেন। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা শেষ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘তোমার আর আস-সিদ্দীকের মধ্যে কি হয়েছে?’ রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাগুলোই বলে বললেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে এমন কিছু বলেছে যেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছেন। তারপর আমাকে একইরকম শব্দ বলার জন্য তিনি বলেন। আমি তা করতে অস্বীকার করি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘অবশ্যই তুমি তা বলবে না। বরং বলো, হে আবু বকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা

করুন।' রাবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তারপর বলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ঐ স্থান ত্যাগ করেন এবং ফেরার পথে তিনি কান্না করছিলেন।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এমন বলেছিলেন যে, যার জন্য তাকে এভাবে অনুতপ্ত হতে হয়েছে? অবশ্যই তিনি কোনো অভিশম্পাত করেননি অথবা কোনো গালিগালাজ করেননি। তার চরিত্র ছিল অনেক সুন্দর। তার মুখ দিয়ে কোনো বাজে কথা কখনো কেউ শোনেনি। এমনকি ইসলাম পূর্ব যুগেও তিনি কখনো কোনো অশালীন ভাষায় কথা বলেননি। এজন্য আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, খুব বেশি হলে তিনি হয়তো একটু রেগে গিয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকের চেয়ে একটু উচ্চস্বরে কথা বলেছিলেন। এজন্যও তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতটাই ভীত ছিলেন যে, আখেরাতে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে দুনিয়াতেই এর কাফফারা দিতে চেয়েছেন। রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একইভাবে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। যখন রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা করার জন্য অস্বীকার করেছে, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছেন। যখন রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেছে, তখনো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একইরকম অপরাধবোধ তার মধ্যে কাজ করছিল। যেজন্য তিনি ফেরার পথেও কাঁদছিলেন। বেশিরভাগ মানুষ তাদের মারাত্মক সব অপরাধ ভুলে যায়। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই সামান্য ভুলও ভুলতে পারছিলেন না। এতটাই তিনি বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি অমীমাংসিত সম্পত্তির উপর নিজের দাবী ছেড়ে দিলেন এবং একটিই চিন্তা তাকে অস্থির করে রেখেছিল যেন রাবেয়াহ তাকে মাফ করে দেয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা খুব ভালো করেই জানতেন

যে, যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয়, তাহলে যাকে কষ্ট দেওয়া হলো তার কাছ থেকেই মাফ নিতে হয়।

এ ঘটনা শুধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর ঈমানের স্বাক্ষর দেয় না, রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুরও একনিষ্ঠ ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুরোধ এ কারণে প্রত্যাখান করেছেন কারণ তিনি তাকে সম্মান করেন। তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই তাকে তার বিরুদ্ধে মন্দ কিছু বলা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। অধিকন্তু তিনি তার স্বজাতিকে তার পক্ষ নিতে নিষেধ করেছেন। তিনি খুব ভালো করেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি শুধু সম্মান এবং ভালোবাসারই পাত্র।

এটা ঠিক যে, সাহাবীরা একে অন্যের সাথে কখনো কখনো তর্কে লিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু তারা কখনো আরেকজনের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করেননি। আরেকজনের বিরুদ্ধে মন্দ কোনো চিন্তা লালন করেননি। তারা খুব দ্রুত এবং সুন্দরভাবে নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়েছেন। আল্লাহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাবেয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ সকল সাহাবীদের উপর রাজি হয়ে যান!

ভালো কাজে প্রতিযোগিতা

জীবন আসলেই ছোট। একজনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার সময়। আজ যে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে, আগামীকাল সেটা সম্ভব নাও হতে পারে। এটা প্রতিটি মানুষই উপলব্ধি করে। কিন্তু সবাই সময়কে নিজের জন্য নিশ্চিত মনে করে। তারা বলে যে, এই কয়েকদিন পরেই ভালো হয়ে যাব! তখন অনেক নেক কাজ করব! অনেকে বুড়ো হলে পুরো দীনদার হবে বলে আশা করে! কিন্তু এর কি নিশ্চয়তা আছে যে তাকে এতটুকু সময় দেওয়া হবে এবং আগামীতে সে ভালো কাজ করতে পারবে? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

আনহু জীবনের কদর বুঝতেন। প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি নেক কাজ করার জন্য আশ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সদ্যবহার করেছেন। কোনো একটি মুহূর্তও নেক কাজ ছাড়া কাটাননি। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকেই বোঝা যায়। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন, ‘আজ সকালে কে রোযার নিয়ত করে ঘুম থেকে উঠেছে? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘আমি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে আছ এমন যে জানাযার পেছনে পেছনে গিয়েছ (এবং দাফন করার কাজে নিয়োজিত ছিলে)?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জবাব দিলেন, ‘আমি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে আছ এমন যে আজ কোনো গরিবকে আহার করিয়েছ?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে আছ এমন যে আজ কোনো রোগীকে দেখতে গিয়েছিল?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি।’ অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যার মধ্যে এ কাজগুলো পাওয়া যাবে, সে জান্নাতে যাবে।’

কিভাবে তিনি রাগকে সংবরণ করতেন

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একবার এক মজলিসে এক ব্যক্তি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিল। সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। লোকটি যখন গালি দিয়েই যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় অদ্ভুত খুশির আভা দেখা যাচ্ছিল। যখন লোকটি সীমার বাইরে গালি দিচ্ছিল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটি যা বলেছে তার কিছু কথার জবাব দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ

করলেন এবং চলে গেলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যখন লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল, তখন আপনি বসে ছিলেন। আর যখন সে বেশি গালি দিচ্ছিল, আর আমি তাকে তারই কিছু কথার জবাব দিলাম, তখন আপনি রাগ করলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يُرَدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَّدَتْ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ , فَلَمْ أَكُنْ لِأُقْعِدَ مَعَ الشَّيْطَانِ , ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ! ثَلَاثُ كُلِّهِنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُفْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ , وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ , يُرِيدُ بِهَا صَلَاةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً , وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً .

অবশ্যই তোমার পক্ষে একজন ফেরেশতা তার কথার জবাব দিচ্ছিল। যখন তুমি তাকে জবাব দিলে, তখন শয়তান এসে তার স্থান দখল করল। আর আমার জন্য শোভনীয় নয় শয়তানের পাশে বসে থাকা। হে আবু বকর! আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ে বলছি যার সবগুলোই সত্য : যদি কেউ কারও প্রতি কোনো অন্যায় করে, সে যদি এটা দেখেও না দেখে (এবং মাফ করে দেয়), তাহলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে সম্মানিত করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। আর যদি কেউ দানে উৎসাহিত করে, পরিবারের সম্পর্ক উন্নয়নে সহযোগিতা করে, তবে আল্লাহ তার রিযিক বাড়িয়ে দিবেন। যদি কেউ রিযিকের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ায়, তাহলে আল্লাহ তার রিযিক সংকুচিত করে দিবেন।

অপমানের জবাব না দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ধৈর্য্য এবং চরিত্রের উৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখন লোকটি অস্বাভাবিক মাত্রায় গালি দিচ্ছিল, কেবল তখন তিনি তাকে

থামানোর জন্য তার কথার জবাব দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বুঝিয়েছেন যে, চুপ থাকাই তার জন্য ভালো ছিল। কারণ রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে সবর করলে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বাড়ে।

সারাজীবন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিনয়, ধৈর্য্য এবং অমায়িকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এ থেকে তিনি কখনো রাগ করেননি, এটা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কিন্তু যখন তিনি রাগ করেছেন, সেটা নিজের স্বার্থে করেননি। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। যদি তিনি কাউকে আল্লাহর হুকুমের সরাসরি অমান্য করতে দেখতেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে রাগ করতেন। রাগ এবং সদাচরণের জন্য তিনি কুরআন মাজীদে একটি আয়াতের শিক্ষাকে অনুসরণ করতেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٧٧﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ
الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧٨﴾

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও জমিন বরাবর, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন।^{৮২}

আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবার প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে বিশেষ করে তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তা ছিল সীমাহীন।

মিসতাহ ইবনে উসাসাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এরকম একজন নিকটাত্মীয় ছিলেন। তার আয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়মিত আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে মদীনার মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন রটনা ছড়াল, তখন তাদের এই সম্পর্কে ফাটল দেখা দিল। এ রটনায় মদীনার অন্যান্য মুনাফিকরাও সামিল হলো। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে কিছু সত্যিকার মুসলমান সাহাবীও তাদেরকে সমর্থন দিল। মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দলে ছিলেন। যখন আল্লাহ তা‘আলা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল করলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে মনঃক্ষুব্ধ হলেন। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন যে, তিনি ভবিষ্যতে আর মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করলেন,

وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَ
 الْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا
 تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম করণাময়।^{৮৩}

এ আয়াত শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি।’ তিনি শুধু মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষমাই

করেননি, বরং পূর্বের মতো আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করেন। তিনি এটাও বলেন, ‘আল্লাহর কসম, এ সাহায্য কোনোদিন বন্ধ হবে না।

মদীনা থেকে শামে (সিরিয়া এবং আশেপাশের এলাকা) ব্যবসা করার জন্য গমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরায় গিয়েছিলেন। বসরার অবস্থান শাম দেশে (সিরিয়া এবং আশেপাশের এলাকা)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তার সোহবতে থাকার চেয়ে মূল্যবান কিছু ছিল না। তারপরেও তিনি ব্যবসার স্বার্থে শাম দেশে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোবাসতেন। অন্য কোনো সাহাবীর সঙ্গে থেকে তার সান্নিধ্য বেশি পছন্দ করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাকে মদীনা ছেড়ে যেতে নিষেধ করেননি। এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, জীবিকার অন্বেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অন্যের উপর নির্ভরতা বা দান-সদকার উপর জীবনযাপন করার চেয়ে আয়-রোজগার করে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, গরিব-দুঃখীকে দান করা অনেক বেশি উত্তম।

আবু বকর রা.-এর আত্মমর্যাদাবোধ এবং রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক তার জীবন পবিত্রতার ঘোষণা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘বনু হাশেম গোত্রের একদল লোক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের সাথে দেখা করতে আসে। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে আসমার সাথে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি পুরো ব্যাপারটিকে খুব ঘৃণা করলেন।’ একটু পরেই তিনি এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তখন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিস্বরে গিয়ে খুতবা দিয়ে ঘোষণা করেন,

لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

এখন থেকে কোনো পুরুষ একাকী কোনো মহিলার ঘরে স্বামী না থাকলে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়, তবে তার সাথে আরেকজন অথবা আরও দু-জন পুরুষ সঙ্গে নিতে হবে।

আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে একটি খুতবা দিলেন। এমন খুতবা আমি কখনো শুনিনি। ভাষণে তিনি বলেন, যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাদের চেহারা কাপড় দ্বারা ঢেকে নেন এবং প্রচুর কান্না করেন। তাদের কান্নার আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভয়-শঙ্কা ও আশার সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সকলের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। চাই তিনি শাসক হোন অথবা শাসিত, নেতা অথবা সৈনিক যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চান তার জন্য।

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো খোদাভীতি ছিল না।’ কায়েস বলেন, ‘আমি একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার জিহবা ধরে এ কথা বলতে শুনলাম, এটাই সেই জিনিস যা আমাকে বিভিন্ন সমস্যায় ফেলেছে।’ একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খোদাভীতি সম্পর্কে বলেন, ‘কাঁদ। যদি কাঁদতে না পার তাহলে অন্তত কান্নার অভিনয় কর।’

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি আমি এ গাছ হতাম, তাহলে হয়তো কেউ খেয়ে ফেলত অথবা কেটে দিত।’ আরও বলতেন, ‘যদি আমি কোনো মুমিনের দেহের লোম হতাম’ ইত্যাদি।

দুই। আবু বকর রা.-এর স্বতন্ত্র গুণাবলী

ইসলাম পূর্ব যুগেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যক্তি হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তার নশ্র-ভদ্র ব্যবহার, সততা এবং দৃঢ় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সবার কাছেই তিনি অতুলনীয় ছিলেন। ইসলাম আবির্ভাবের পর তিনি তার পূর্বের সব যোগ্যতার সঙ্গে আরও স্বতন্ত্র কিছু গুণাবলীতে ভূষিত হন। একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে দিনের পর দিন উন্নতির শিখরে উঠতে থাকেন এবং নতুন নতুন দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হতে থাকে।

আমরা যদি তার চরিত্রের সব দিকগুলো আলোচনা করতে যাই, তাহলে এ আলোচনার ভূমিকার জন্যই কয়েকশ’ পৃষ্ঠা লিখতে হবে। সঠিক বিশ্বাস, দৃঢ় ঈমান, ইসলামে গভীর জ্ঞান, আল্লাহর উপর বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, শালীনতা, অনুগ্রহ, মহানুভবতা, ত্যাগের প্রতি আকুষ্ঠ ভালোবাসা, ইসলামের মাপকাঠি অনুযায়ী সঠিক বৈরাগ্য, আশ্চর্যজনক নেতৃত্বের যোগ্যতা, বিনয়, আত্মসংযম, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়তা, উঁচু ব্যক্তিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, কঠিন সমস্যা সমাধানের বিশেষ যোগ্যতা - এগুলো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনেক স্বতন্ত্র গুণাবলীর কয়েকটি মাত্র। যেহেতু এই কিতাবে এত বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, আমি এর মধ্যে মাত্র তিনটি গুণের কথা আলোচনা করব। আমি মনে করি, এ কয়েকটি গুণ তাকে সব মুসলমান থেকে আলাদা মর্যাদায় ভূষিত করেছে যেহেতু এ গুণগুলো তার মধ্যে অন্যদের চেয়ে খুব বেশি

ছিল)। আল্লাহর উপর আকুষ্ঠ বিশ্বাস, তার গভীর জ্ঞান এবং আল্লাহর উপর চরম নির্ভরতার সাথে সাহায্য এবং হেদায়েতের জন্য দু‘আ করার যোগ্যতা।

আল্লাহর উপর মজবুত বিশ্বাস

ধরুন, মুসলিম ছাত্রদের কোনো ক্লাসরুমে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, কোন যোগ্যতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সকল মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে? আমার ধারণা, মুসলমান ছাত্ররা ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিবে। কেউ হয়তো বলবে, তিনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি ইসলামের একেবারে শুরুতে ঈমান এনেছিলেন। এটাই একমাত্র সত্য নয়। কারণ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগে অনেকেই ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু মর্যাদা ও যোগ্যতায় তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরেই দ্বিতীয়। অন্য অনেকে হয়তো বলবে, তিনি সবার থেকে বেশি নামায পড়তেন এবং রোযা রাখতেন। এটা সত্যি হতেও পারে (আল্লাহই ভালো জানেন)। যদিও অনেক কম মর্যাদার সাহাবীরাও খুব বেশি নামায পড়তেন, বেশিরভাগ দিনই রোযা রাখতেন। আমরা এভাবে একের পর এক যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করে যেতে পারি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি গভীর এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বাসই তাকে অন্য সব মুসলমান থেকে উচ্চ আসনে বসিয়েছে। আবু বকর ইবনে আইয়্যাম বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায-রোযার আধিক্যের কারণে অন্য সবার থেকে বেশি মর্যাদাবান ছিলেন না। বরং তার অন্তরের গভীরে প্রোথিত ঈমানের কারণেই তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।’ এ কারণেই বলা হয় যে, ‘কেউ যদি ঈমানের ওজন করতে চায়, তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষের ঈমান এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান রাখলে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানই বেশি হবে।’

এক হাদীসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস

করলেন, ‘কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ?’ তখন একজন সাহাবী বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম, আকাশ থেকে একটি পাল্লা নেমে এসেছে। মিজানের পাল্লায় আমল ওজন করা হচ্ছে। প্রথমে আপনি এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান মাপা হলো। আপনার ওজন বেশি হলো। তারপর আবু বকর এবং উমরের ঈমান মাপা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওজন বেশি হলো। তারপর উমর এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান মাপা হলো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওজন বেশি হলো। তারপর পাল্লা উঠিয়ে নেওয়া হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্বপ্ন শুনে খুশি হননি। তিনি বললেন, ‘এটা ছিল নবীর খলীফাদের যুগ সম্পর্কে। তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার হাতে রাজ্যভার দিবেন।’

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায শেষে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, সে গরু চড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে একটি গরুর উপর উঠে বসে এবং চলার জন্য গরুকে বেত দিয়ে আঘাত করে। তখন গরুটি বলে উঠে, ‘আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই আমাদেরকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি। বস্তুত আমাদেরকে জমি চাষ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।’ উপস্থিত সাহাবীরা বলে উঠল, ‘আল্লাহ অতি মহান, এমন কোনো গরু আছে কি যে কথা বলতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আমি এটা (ঘটনা) নিশ্চিত বিশ্বাস করি। আমার মতো আবু বকর এবং উমরও বিশ্বাস করে যদিও তারা এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না।’ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, সে মেষ চড়াচ্ছিল। এমন সময় একটি বাঘ এসে মেষপালকে আক্রমণ করে একটি মেষকে নিয়ে যায়। তখন লোকটা বাঘের পেছনে ছুটতে ছুটতে মেষটাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তখন বাঘ বলে ওঠে, ‘আজ তুমি এটাকে আমার হাত থেকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু হিংস্রপ্রাণীদের দিন (যখন কোনো মেষপালক থাকবে না) এটাকে কে বাঁচাবে? উপস্থিত সাহাবীরা বলে উঠল,

‘আল্লাহ অতি মহান, এমন কোনো বাঘ আছে কি যে কথা বলতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আমি এটা (ঘটনা) নিশ্চিত বিশ্বাস করি। আমার মতো আবু বকর এবং উমরও বিশ্বাস করে যদিও তারা এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না।’

এটা এজন্য যে, দৃঢ় এবং অবিচল ঈমানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোবাসতেন। বস্তুত তাকে সব সাহাবী থেকে বেশি ভালোবাসতেন। আমরা ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, ‘আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা।’ তারপর তাকে আবার জিজ্ঞেস করি, ‘পুরুষদের মধ্যে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, ‘তার পিতা।’ ‘তারপর কে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব।’ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে একে আরও অনেক সাহাবীর নাম বলেন।

সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হওয়ার কারণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহান ঈমান এবং শাশ্বত শরীয়তের উপর দৃঢ়তা এবং দ্বীনের সাহায্য করার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা। তার বলিষ্ঠ ঈমানের জন্যই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। তাকে জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে প্রবেশ করতে বলা হবে। আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার বাড়ি থেকে অযু করে বের হয়ে এসে বলেন, ‘আজকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকব।’ তিনি মসজিদে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, এ দিকে গিয়েছেন। আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু

আনহু লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বীরে আরীসে গিয়ে পৌঁছলেন।

আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি দরজায় বসলাম। এর দরজাটি ছিল খেজুরের ডালের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে অযু করলে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আরীস কূপের উপর বসা ছিলেন অর্থাৎ তার কিনারের মধ্যে তাঁর পা দু-টি নলা পর্যন্ত খোলা এবং কূপের ভেতর ঝুলন্ত ছিল। আমি তাকে সালাম দিয়ে দরজার কাছে চলে গেলাম। বললাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দারোয়ান হব। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে দরজায় ডাক দিলে আমি বললাম, ‘কে?’ বললেন, ‘আবু বকর।’ আমি বললাম, ‘দাঁড়ান!’ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসেছেন এবং প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন।’ বললেন, ‘তাকে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।’ আমি এগিয়ে গিয়ে আবু বকরকে বললাম, ‘প্রবেশ করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানদিকে কূপের কিনারায় কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন আর পা দু-টি নলা পর্যন্ত খোলা রাখলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। তারপর আবু মূসা আশ আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমনের কথাও বর্ণনা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হবে : হে আল্লাহর বান্দা, এ কাজ উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে ‘বাবুস সালাত’ থেকে আহ্বান

জানান হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে ‘বাবুল জিহাদ’—থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে ‘বাবুস সাদাকা’—থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী তাকে ‘বাব-উর-রায়্যান’ থেকে আহবান জানান হবে। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর সকল দরজা থেকে কাউকে আহবান করা তো দরকার হবে না। তবে এমন কি কেউ হবে যাকে এ সকল দরজা থেকেই আহবান জানান হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ এবং আমি আশা করি তুমি তাঁদের একজন হবে।’^{৮৪}

তার প্রজ্ঞা

সকল সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং আল্লাহর ভয়ে সবচেয়ে বেশি ভীত ছিলেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত সবাই একমত। এ বিষয়ে ইজমা তথা সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে অনেকে বর্ণনা করেছেন।^{৮৫}

তার এত বেশি জ্ঞানী হয়ে ওঠা মোটেও অবান্তর নয়। কারণ তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবত সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন। দিনে অথবা রাতে, মদীনায়ে অথবা দূর-দূরান্তের কোনো সফরে নিজের ব্যবসায়িক ব্যস্ততার সামান্য কিছু সময় ছাড়া তিনি সবসময় রাসূলের পাশেই থাকতেন। এমনকি এশার পর সবাই চলে যাওয়ার পর অনেক সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একাই রাসূলের কাছে থাকতেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ঐশী জ্ঞানের উৎস। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি সেই জ্ঞান শেখার জন্য ছিলেন উদগ্রীব।

^{৮৪} সহীহ, বুখারী (৩৬৬৬)।

^{৮৫} আল-ফাতওয়া (১৩/১২৭)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই গভীর জ্ঞানের জন্যই তিনি ছিলেন রাসূলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইলে সর্বপ্রথম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই কথা বলতেন। রাসূলের সঙ্গী হিসেবে তিনি এর জন্য যথোপযুক্তও ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো পরামর্শ দিতেন, রাসূল সেটা মেনে নিতেন এবং সে অনুযায়ী নির্দেশনা দিতেন। যদি কেউ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীতে কোনো পরামর্শ দিতেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে যেতেন।

নবম হিজরীতে মদীনার মুসলমানরা প্রথম হজ করেন। এ হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাননি। এজন্য এ হজ কাফেলার জন্য একজন আমীর নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এটা একটি কঠিন দায়িত্ব ছিল। হজের আহকামগুলো সঠিকভাবে বর্ণনা করা সহজ কাজ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ঠিকই জানতেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই হজের আহকাম সম্পর্কে ভালো জানেন এবং এ কাজের জন্য অধিক উপযুক্ত। তিনি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে এ হজ কাফেলাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। একইভাবে জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সাহাবীদের নামায পড়ানোর জন্য তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন। যাকাতের আহকাম সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘কিতাবুস সাদাকা’ যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।^{৮৬} ইসলামের ইতিহাসে ফিকহবীদের

এসব বর্ণনা থেকে কেবল যাকাতের বিষয়েই মাসআলা বের করেননি, বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রদকরণ মানসুখ মাসায়েল সম্পর্কে আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উদ্ধৃত জটিল পরিস্থিতিতে শরীয়তের আলোকে বিভিন্ন ফতোয়া জারি করেছেন। এগুলোর একটিও নাযিলকৃত ওহীর সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেনি। মোটকথা তার জারিকৃত বিধি-বিধানের মধ্যে কোনো ভুল হয়েছে, এরকম কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যান্য সাহাবীদের বেলায় এটা একই রকম সত্য নয়। তারা ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুলের উর্ধ্বে ছিল না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই অনেক সময় সিদ্ধান্ত দিতেন। এ থেকে যোগ্য হাকীম হিসেবে তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ভরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এরূপ সিদ্ধান্তের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমত পোষণ করতেন এবং তার সত্যতার নিশ্চয়তা দিতেন। হুনাইনের যুদ্ধে আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গণিমতের মালের হিস্যা প্রদানের ব্যাপারে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির জন্য একজন প্রজ্ঞাবান হিসেবে আবির্ভূত হন। উদ্ধৃত যে কোনো জটিল বিষয়ের সমাধানে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তখনকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সবচেয়ে বেশি সজাগ ছিলেন। একই সাথে তিনি সব সাহাবীদেরকে সেই বাস্তব এবং সত্য অনুভূতিতে জাগ্রত করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে আয়াতসমূহ

তীলাওয়াত করে রাসূলের মৃত্যুর অবশ্যস্তাবীতা সম্পর্কে বয়ান করেছেন। তাদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রয়োজনে তা বর্ণনা করেছেন। আবার খেলাফতের শুরুর দিকে অন্ততপক্ষে তিনি দু-টি বড় সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন : ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কি করবেন না; রাসূলের ইন্তেকালের ঠিক আগে উসামার নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান আবার পাঠাবেন কি পাঠাবেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভীতও ছিলেন না, দোদুল্যমানও ছিলেন না। তিনি পরিকার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাই করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোথায় কবর দিতে হবে, এ ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদেরকে অবহিত করেছিলেন। খেলাফতের দায়িত্বের ব্যাপারে এবং রাসূলের সম্পত্তির বিষয়েও তিনি সঠিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমাকে একটি বড় গ্লাস ভর্তি দুধ পান করতে দেওয়া হয়। আমি সেখান থেকে পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পান করি। তখন আমি দেখলাম, এই দুধ আমার চামড়া এবং গোশতের মধ্যে ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। গ্লাসে তখনো কিছু দুধ অবশিষ্ট ছিল। আমি সেখান থেকে আবু বকরকে পান করতে দেই।’ তখন সাহাবীরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এটা হচ্ছে জ্ঞান যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনি যখন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়েছেন, তখন অবশিষ্ট যা ছিল, তা আবু বকরকে দেওয়া হয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমরা ঠিকই বলেছ (স্বপ্নের ব্যাপারে তোমরা সঠিক ব্যাখ্যা করেছ)।’^{৮৭}

সুনির্দিষ্টভাবে একটি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তা হলো স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান। তিনি মনে করতেন, স্বপ্ন সত্য হয়ে

^{৮৭} আল-ইহসান ফী তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (১৫/২৬৯)

থাকে। প্রত্যহ সকালে তিনি তার সাথীদেরকে বলতেন, ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভালো কোনো স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলে সে আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুক।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বাস করতেন, ভালো মানুষের স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো এবং অর্থবহ কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার তিনি বলেছেন, ‘অযু সহ যে ঘুমাল এবং স্বপ্ন দেখল, সেটা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিস থেকে বেশি প্রিয়।’

ইবনে আক্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদিন এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘আমি গতকাল রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ থেকে ঘি এবং মধুর বৃষ্টি হচ্ছে। আমি লোকজনকে তাদের হাতে সেগুলোকে জমা করতে দেখলাম। কেউ কেউ অনেক বেশি নিল, আবার কেউ খুব সামান্যই নিল। তারপর একটি রশি আবির্ভূত হলো। সেটা জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি দেখলাম, আপনি সে রশি বেয়ে উপরে উঠছেন। তারপর আরেকজন সে রশিটা ধরল এবং সেটা ছিঁড়ে গেল। একটু পর সেটা আবার জোড়া লাগল। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি কি আমাকে এই স্বপ্নের তাবির করার সুযোগ দিবেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘মেঘ হচ্ছে ইসলাম। আর যে ঘি এবং মধু বৃষ্টি হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে, কুরআন এবং তার মিষ্টতা। কেউ কেউ কুরআন থেকে অনেক বেশি নিচ্ছিল, আবার কেউ খুব সামান্যই নিচ্ছিল। আর রশিটি হচ্ছে সত্যের প্রতীক যার উপর আপনি আছেন। আপনি রশিটি ধরেছেন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আপনার ইন্তেকালের পর আরেকজন এই রশিটি ধরবে এবং এটা বেয়ে উপরে উঠে যাবে। তারপর আরেকজন রশিটি ধরবে এবং উপরে উঠে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমি কি এ স্বপ্নে ঠিক ব্যাখ্যা করেছি না ভুল করেছি?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আপনি কিছু অংশের ঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। আর কিছু অংশে ভুল করেছেন।’ তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আপনি কি আমার ভুল শুধরিয়ে দিবেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘কসম কর না (আমি জানাব অথবা জানাব না, এজন্য কসম কর না)।’^{৮৮}

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, একবার আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, তিনটি চাঁদ তার ঘরে এসে পড়েছে। তিনি এ স্বপ্নের কথা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমার স্বপ্ন শীঘ্রই সত্য হবে। এ পৃথিবীর জমিনে সর্বোত্তম তিনজন ব্যক্তিকে তোমার ঘরে দাফন করা হবে।’ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘হে আয়েশা, এই হচ্ছে তোমার তিনটি চাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম চাঁদ।’^{৮৯} তার এই স্বপ্ন পুরোপুরি সত্যে পরিণত হয় যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হয় এবং তার ঘরেই তাদেরকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সমগ্র মুসলিম জাতির মধ্যে স্বপ্নের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।

যদিও তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, তবুও তিনি লৌকিকতা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না জানলে অনুমান নির্ভর হয়ে কিছু বলতেন না। ইবরাহীম আন-নাখাঈ বর্ণনা করেছেন, একবার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি নিচের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

^{৮৮} সহীহ, বুখারী (৭০৪৬)।

^{৮৯} তারীখ আল-খুলাফা, আস-সুয়ুতী, পৃষ্ঠা ১৩৯।

কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে ‘আব্বা’ বলতে কি বোঝানো হয়েছে?’ অনেকে এটার ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘অবশ্যই না জেনে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা অহংকারের আলামত। কোনো যমীন আমাকে আশ্রয় দিবে এবং আকাশ আমাকে কি ছায়া দিবে যদি আমি না জেনে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কোনো কিছু বলি?’^{৯১}

তার দু‘আ ও প্রচণ্ড বিনয়-কাতরতা

দু‘আর মাধ্যমেই অনেক ভালোর দ্বার উন্মোচিত হয়। যদি কোনো বান্দা দু‘আ করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে অনেক কল্যাণ দান করেন। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই আল্লাহর কাছে দু‘আ করতেন এবং এভাবে তার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক কায়েম করেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমার প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে।^{৯২}

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

^{৯০} সূরা আবাসা, ৮০:৩১।

^{৯১} ফতহুল বারী (১৩/২৮৫). উল্লেখ্য যে, আবরাহীম আন-নাখী এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনার সূত্রে রাবীর যোগসূত্র নেই।

^{৯২} সূরা আল-মুমিন, ৪০:৬০।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে, আমি তার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।^{৯৩}

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতীত এবং ভবিষ্যতের সব ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাতে আল্লাহর সাহায্য চাইতেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু সারাক্ষণ রাসূলের পাশেই থাকতেন, এ ঘটনা তাকে সমান প্রভাবিত করে। দু'আ করার গুরুত্ব তার অন্তরে বসে যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল আল্লাহর কাছে দু'আ করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অপূর্ব ভাষায় এবং ভঙ্গিতে দু'আ করতে শুনতেন, সেভাবে দু'আ করতেন। এটা সত্য যে, যে কেউ নিজস্ব ভাষায় সঠিক চাহিদা অনুযায়ী দু'আ করতে পারেন। আবার এটা একইরকম সত্য যে, সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত দু'আ সমূহ এবং উম্মতের জন্য ঐ একই ভাষায় দু'আ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো শব্দ ও বাক্য দিয়ে দু'আ তৈরি করার সাধ্য দুনিয়ার বুকে কারও নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই ভালো জানতেন আল্লাহর কাছে কি চাওয়া উচিত এবং তা কিভাবে চাওয়া উচিত। প্রত্যেকের উচিত যতটুকু পারা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আগুলোকেই আবৃত্তি করা। এজন্য একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর

রাসূল! আমাকে এমন একটি দু‘আ শেখান যা নামাযের মধ্যে পড়তে পারি।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এই দু‘আর কথা বললেন,

قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলো, হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, এবং আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করার নেই। সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দেন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।^{৯৪}

আরেকবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দু‘আ শেখান যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়তে পারি।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة

رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر

نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء

أو أجراه إلى مسلم قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت

مضجك

বলো, হে আল্লাহ, আসমান এবং জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য এবং অদৃশ্যের জ্ঞানী, সব কিছুর পালনকর্তা ও একচ্ছত্র অধিপতি, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আমার অন্তরের কুমন্ত্রণা, বিতাড়িত শয়তান এবং শিরক থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমি আমার উপর এবং অন্যের উপর যুলুম করা থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় চাই।’ এটা তুমি

সকালে, বিকালে এবং যখন বিছানায় শুতে যাও, তখন পড়বে।^{৯৫}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা ভালোভাবেই জানতেন যে, কেউই তওবা-ইস্তেগফার থেকে মুক্ত নয় এবং সবাইকে আল্লাহর কাছে অনবরত ক্ষমা চেয়েই যেতে হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا﴾

আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ। পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{৯৬}

মানুষ সবসময়ই আল্লাহর রহমতের কাঙ্গাল। এজন্য প্রত্যেকের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে হেদায়েত, সাহায্য, রহমত এবং ক্ষমার জন্য দু'আ করা। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ

^{৯৫} সুনান, আবু দাউদ (৫০৬৭); সুনান, তিরমিযী (৩৫২৯)।

^{৯৬} সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৭২-৭৩।

কেউ তার আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

সাহাবীরা তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনিও না, হে আল্লাহর রাসূল!’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

আমিও না, যদি না আমাকে তার অনুগ্রহ আবৃত করে না নেয়।^{৯৭}

এই হাদীসের সাথে কুরআনের কথার কোনো বৈপরিত্য নেই। আল্লাহ বলেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে, পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।^{৯৮}

এই আয়াতে আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার আমল এবং তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক এবং কার্যকারিতা বর্ণনা করেছেন। আর উপরোক্ত হাদীসে এটা পরিস্কার যে, বান্দার আমলের বদলা হিসেবে জান্নাত অনেক উঁচু স্তরের প্রাপ্তি। এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমত ও করুণা না হলে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার নেয়ামতও ভোগ করতে পারবে না।

সৌভাগ্যবশত এই কথা, ‘যদি আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তাহলে ঐ বান্দার পাপসমূহ তার কোনো ক্ষতি করবে না’—এটা বোঝায় যে, আল্লাহ তা‘আলা যাকে ভালোবাসেন, তাকে তার অপরাধের জন্য তওবা করার তাওফিক দেন এবং বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করেন। এ ধরনের মানুষ অপরাধের উপর দৃঢ় থাকে না। এজন্য এটা ধারণা করা ঠিক নয় যে, যদি কেউ অপরাধ করতেই থাকে, তাহলে তাকে সেটা ক্ষতি করবে না। সহজ

^{৯৭} সহীহ, বুখারী (৬৪৬৩)।

^{৯৮} সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:২৪।

কথা এই যে, যদি কেউ অনু পরিমাণ সৎ কাজ করে, তাহলে আখেরাতে সে তার বদলা পাবে। আবার যদি কেউ অনু পরিমাণ গোনাহ করে, আখেরাতে সেও তা দেখতে পাবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরোপুরিভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি জীবনের অনুক্ষণ তার কাছে সাহায্য, ক্ষমা এবং হেদায়েত চাইতেন। নিচে কয়েকটি দু‘আ উল্লেখ করা হলো যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত পড়তেন,

১।

أَسْأَلُكَ تَبَامَ النِّعَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى
تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَاءِ وَالْخَيْرَةَ فِي جَمِيعِ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ الْخَيْرَةُ
بِجَمِيعِ مَيْسُورِ الْأُمُورِ كُلِّهَا لَا يَبْعُسُورُهَا يَا كَرِيمُ

(হে আল্লাহ) আমি সব কিছুতে তোমার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ চাই, যেমন আমি চাই আপনি আমাকে এমন বানিয়ে দেন যেন যেসব অনুগ্রহ আমাকে পছন্দ করে দান করেছেন, তাতে শোকর করতে পারি এবং আপনি আমার উপর রাজি হয়ে যান এবং আপনার রাজি হওয়ার পরও (যেন শোকর করতে পারি) আর যে সকল বিষয়ে কল্যাণ আছে, সেসব কল্যাণ চাই। সকল বিষয়ে আসানী চাই, এর কষ্ট থেকে পরিত্রাণ চাই। হে কারীম!*

২।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عَاقِبَةِ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ
اخِرَ مَا تُعْطِينِي مِنَ الْخَيْرِ ضَوَائِكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّاتِ
النَّعِيمِ

* আশ-শোকর, ইবনে আবী আদ-দুনইয়া (১০৯); খুতাব আবু বকর, পৃ. ৩৯।

হে আল্লাহ, আমি আমার জন্য উত্তম পরিণতি চাই। হে আল্লাহ, সর্বশেষ যা আপনি আমাকে দান করবেন তা যেন আপনার সন্তুষ্টি এবং সর্বোচ্চ বরকতময় অনুগ্রহ হয়।^{১০০}

৩।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِيْ اٰخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ زَخِيْرًا اَيَّامِيْ يَوْمِ الْقَاٰكِ

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উত্তম পরিণতি দেন, শেষ আমলকে সর্বোত্তম বানিয়ে দেন এবং সর্বোত্তম দিনে আপনার সাক্ষাৎ নসীব করুন।^{১০১}

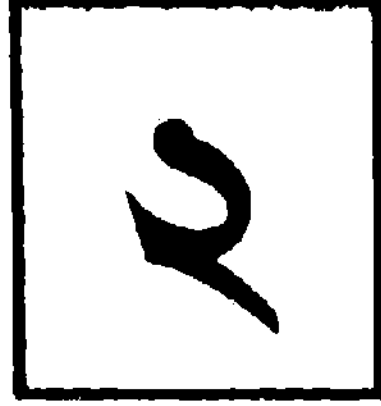
৪। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি কাউকে নিজের প্রশংসা করতে শুনতেন, তাহলে বলতেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার চেয়ে আমার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত এবং আমি অন্যদের চেয়ে নিজের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ, তা যা ভালো ধারণা করে, আমাকে সেরকম বানিয়ে দেন, আমার সেসব গোনাহ মাফ করে দেন যা তারা জানে না এবং তারা যা আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, এজন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না।’^{১০২}

অতি সংক্ষেপে এই হচ্ছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকটি গুণের বর্ণনা। এসব গুণাবলীর সাথে তার অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর জন্যই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর ইসলামের জাহাজকে প্রচণ্ড ঝড়, উত্তাল ঢেউ এবং কঠিন পরীক্ষা মোকাবেলা করে এগিয়ে নিয়ে তীরে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

^{১০০} খুতাব আবু বকর আস-সিদ্দীক, পৃ. ১৩৯।

^{১০১} কানযুল-আমাল (৫০৩০); খুতাব আবু বকর, পৃ. ৩৯।

^{১০২} আসাদুল-মাবাহ (৩/৩২৪)



রাসূল সা.-এর ইশ্তেকাল, বনু সাঈদা
গাত্রে চতুরে গগজমায়েত এবং উসামার
সেনাবাহিনী



প্রথম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল এবং বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে গণজমায়েত

প্রথম। রাসূল সা.-এর ইন্তেকাল

আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে কিছু কিছু পবিত্র আত্মা জাগতিক পর্দার ঐ পাশে এমন সব নেয়ামত দেখতে পান যাতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের বিচ্ছেদ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পবিত্র আত্মাগণ মাঝে মাঝে বিজ্ঞ ভবিষ্যৎবাণীও করতে পারেন। যাদের অন্তর বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত, তারা এমনভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হন যে, তাদের চারিদিকে যেসব ঘটনা ঘটে এবং জগতের প্রাত্যহিক প্রতিটি কাজ যা দ্বারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক এ জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার হেকমত তাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং তা অন্যদের জানার সুযোগ হয় না। এসব যোগ্যতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল।^{১০৩}

কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নবীদের মতোই একজন মানুষ এবং তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবনের শেষ দিকে নাযিলকৃত কিছু আয়াত থেকে তিনি এটা পরীকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। কিছু কিছু হাদীস থেকে এ ব্যাপারে তার পরীকার বর্ণনাও পাওয়া

^{১০৩} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ, আবু শোহবাহ (২/৫৮৭)।

যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো প্রকাশ্যে, কখনো ঘুরিয়ে তার আসন্ন মৃত্যুর কথা বলেছেন। যখন তিনি হেকমতপূর্ণ ভাষায় তার মৃত্যুর কথা ইঙ্গিত করতেন, এটা কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী যেমন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর অন্তিম অসুস্থতা

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের সফর থেকে ফিরে যিলহজ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো, মুহাররম ও সফর মাস মদীনায়েই অবস্থান করেন। তারপর দ্রুত তিনি একটি বিশাল বাহিনী উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আল-বালকা এবং ফিলিস্তিনে রওনা হওয়ার আদেশ জারি করেন।

মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে অনেক বিখ্যাত বড় বড় সাহাবী উসামার সৈন্য বাহিনীর সদস্য ছিলেন। মাত্র আঠার বছরের যুবক উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় অনেক সাহাবীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। মুহাজির ও আনসারগণের অনেক বড় বড় সাহাবীদেরকে সাধারণ সৈনিকের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে এরকম একজন আযাদকৃত গোলামের ছেলে, কম বয়সী ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া বিশেষ করে নতুন মুসলমানদের জন্য একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াল। তাদের আপত্তির একটি বড় কারণ ছিল, এ জামাতে সাধারণ সৈন্য হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের যুক্তিকে গ্রহণ করেননি। বরং তাদের যুক্তি যে অসার, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি তারা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করে থাকে, তবে জেনে রাখ, ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা প্রশ্ন

করেছিলে। অথচ তিনি নেতা হওয়ার জন্য ছিলেন সবচেয়ে বেশি ভালো এবং যোগ্য। আর তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। তার ইন্তেকালের পর তার ছেলে এখন আমার সবচেয়ে প্রিয়দের একজন।' আসন্ন অভিযানের জন্য উসামার আর্মি যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এ অসুস্থতাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবর যিয়ারত করেন এবং তাদের জন্য দু'আ করেন; তিনি এই ফরমান জারি করেন যে, এখন থেকে আরব উপত্যকায় কোনো মুশরিক বসবাস করতে পারবে না; একই সাথে এ ঘোষণাও দিলেন যে, তবে তাদের প্রতিনিধিদল কেবল সাক্ষাতের জন্য আসতে পারবে; তিনি মুসলমানদেরকে কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেন। যখন তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে গেল, তখন তিনি তাকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে শুশ্রূষার জন্য নিতে অনুরোধ করেন। তিনি শেষ দিকে যেসব নসিহত করেন, তার মধ্যে তিনি আল্লাহর উপর ভালো ধারণা রাখার উপদেশ দেন, নামায দৃঢ়ভাবে, নিয়মিত ও সময়মতো পড়ার আদেশ দেন এবং মদীনার আনসারদের সাথে খুব সম্মান ও মর্যাদার সহিত ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। সবশেষে তিনি বললেন যে, নবুওতের একটি মাত্র জিনিসই বাকি আছে। সেটা হচ্ছে সত্য স্বপ্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওতের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ওহী নাযিল হওয়া। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সত্য স্বপ্ন দেখা। এখান থেকে এটাই বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এখনও সত্য স্বপ্ন দেখবে। এমন স্বপ্ন যা পরে বাস্তব জীবনে সত্য পরিগণিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় দেওয়া এক খুতবা প্রসঙ্গে আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এ খুতবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তার কোনো এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলেছেন। ঐ বান্দা আখেরাতকেই পছন্দ করেছে।’ মজলিসের প্রায় সবাই এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই করতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি নিজের দিকে ইশারা করেই বলছেন। তিনি নিজেই এ গল্পের উদ্দিষ্ট বান্দা। আমি ‘মজলিসের প্রায় সবাই’ কথাটা এজন্য বলেছি যে, কেবলমাত্র একজন এ গল্পের হেকমত বুঝতে পেরেছিলেন। আর তিনি ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা বললেন যে, ‘ঐ বান্দা আখেরাতকেই পছন্দ করেছে’—তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। আর এ ঘটনায় তার চারিদিকের সাহাবীরা খুব বিস্মিত হলেন যে, কি এমন হয়েছে যে আবু বকর হঠাৎ করে এত আবেগী হয়ে উঠলেন? পরে আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সেই ব্যক্তি যাকে যে কোনো একটি পছন্দ করে নিতে বলা হয়েছে এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।’^{১০৪}

অন্তিম অসুস্থতার দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। একদিন নামাযের সময় হয়ে গেলে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আবু বকরকে নামাযে ইমামতি করতে বল।’ তখন তাকে বলা হলো, ‘আবু বকর একজন কোমলপ্রাণ মানুষ। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে সমর্থ্য হবেন না।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় একই আদেশ দিলেন। আর

^{১০৪} সহীহ, বুখারী (৩৬৫৪); সহীহ, মুসলিম (২৩৮২)।

তারাও একই জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বার যখন একই আদেশ দিলেন, লোকেরা একই জবাব দিল। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জবাব দিচ্ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মহিলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তোমরা ইউসূফ আলাইহিস সালামের সাথে আচরণকারী মহিলাদের মতো।’^{১০৫} যাও, আবু বকরকে নামাযে ইমামতি করতে বলো।’ .

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামাযে ইমামতির জন্য বের হলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু সুস্বতাবোধ করলে তিনিও জামাতে নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ডান এবং বাম দিকে দু-জন সাহাবীর কাঁধে ভর করে তিনি মসজিদে গেলেন। এ ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমি দেখলাম চরম অসুস্থতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পা দু-টিকে যেন মাটিতে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে চাইলেন যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নামায পড়াতে পারেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইশারা করে সরতে নিষেধ করলেন। অনেক কষ্টে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো দু-জনের সহায়তায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে গিয়ে বসলেন। এ ঘটনার আরেকজন বর্ণনাকারী আল-আমাশকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তাহলে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে অনুসরণ করছিলেন এবং লোকজন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুসরণ করে নামায পড়ছিল?’ আল-আমাশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন যে, হ্যাঁ। ঘটনাটি এমনই ঘটেছিল।

^{১০৫} ইউসূফ আ.-এর সহচরী অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর চা-চক্রে আহবানে আগত শহরের সম্ভ্রান্ত নারীগণ যেভাবে উচ্চ প্রশংসার জালে আবদ্ধ করে ইউসূফ আ.-কে সঠিক পন্থা হতে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আমার যথার্থ করণীয় হতে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট হচ্ছে। - অনুবাদক

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সোমবার পর্যন্ত নামাযে ইমামতি করেন। ঐদিন ফজরের নামাযে মুসলমানরা যখন জামাতের কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়েছিলেন। সাহাবীদের নামায পড়ার দৃশ্য তিনি শূয়ে শূয়ে দেখছিলেন এবং বিগত কয়েক বছরে মুসলমানদের উন্নতি সম্পর্কে ভাবছিলেন। কাঠমিস্ত্রি যেমন তার বানানো জিনিসের দিকে শেষ দৃষ্টি দেয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক বছরের কষ্ট ও ত্যাগে নিজ হাতে গড়া মুসলমানদের দেখছিলেন! তিনি যা দেখলেন, তা তাকে খুব খুশি করল। তিনি দেখলেন, তার তদারকি ছাড়াই মুসলমানরা আন্তরিকতার সাথে মসজিদে জামাতে ফরয নামায আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরে খুব প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি যা অর্জন করেছেন, ইতিপূর্বে কোনো নবী তা অর্জন করতে পারেননি।

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত হলেন যে, তিনি সাহাবীদেরকে যেখানে রেখে যাচ্ছেন, সেখান থেকে তার ইন্তেকালের পরেও তারা ইসলামের মিশন অব্যাহত রাখবে। এ অনুভূতির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর আনন্দে উদ্ভাসিত হলো, চেহারা মোবারকে উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হতে লাগল এবং আনন্দে কারও সাহায্য ছাড়া একাই দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগল, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।’ তারা আরও দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসছেন! ভালোবাসার আতিশয্যে অনেকে ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো সুস্থ হয়ে উঠছেন। তারা মনে করলেন যে, তিনি হয়তো নামায পড়াতে আসবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করে তাদের নামায শেষ করতে বললেন। তারপর তিনি পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন এবং পর্দা নামিয়ে দিলেন।^{১০৬}

নামায শেষ করে অনেক সাহাবী তাদের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ফিরে গেলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ‘আমি নিশ্চিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা ভালো হয়ে গেছে।’^{১০৭} রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন, কিন্তু তার এ ধারণা সঠিক ছিল না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো মৃত্যু যন্ত্রণা উপলব্ধি করবেন এবং শীঘ্রই তার মহান পালনকর্তার সান্নিধ্যে রওনা হয়ে যাবেন।

মৃত্যুযন্ত্রণা খুব কঠিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কঠিন কষ্টের কিছু অংশ অনুভব করা শুরু করলেন, তখন উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলতে সমর্থ্য ছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে হাত ওঠালেন। তারপর হাত দু-টি উসামার কাঁধের উপর রাখলেন। উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু‘আ করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধরলেন এবং নিজের কোলের উপর রাসূলের মাথা রাখলেন। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাতে একটি মিসওয়াক নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, মনে হলো তিনি সেটা চাচ্ছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আমি কি মিসওয়াকটা আপনাকে দেব?’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার ভাইয়ের

^{১০৭} আস-সিরাহ আন নবুওওয়াহ, আবু শুহবাহ (২/৫৯৩)।

কাছ থেকে মিসওয়াকটা নরম করার জন্য নিজের দাঁত দিয়ে চিবাতে লাগলেন। তারপর সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ এবং সুন্দরভাবে মিসওয়াক দিয়ে তার দাঁত পরিষ্কার করলেন এবং এ কথাগুলো বার বার বলতে থাকলেন, ‘হে আল্লাহ, হে শ্রেষ্ঠ বন্ধু।’^{১০৮}

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে নিজের চেহারা মোবারক মুছে নিলেন। এ সময় তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। মৃত্যুর কষ্ট আছে।’ তারপর তিনি হাত উঠিয়ে দু‘আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! হে শ্রেষ্ঠ বন্ধু।’ তারপর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।^{১০৯} অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় দু‘আ করেছেন, ‘হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য্য নসীব করুন।’^{১১০}

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় শেষ কথা শোনার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ‘হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর রহম করুন এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্য নসীব করুন।’

আরেক বর্ণনায় ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘আহ! আমার পিতার মৃত্যুর কষ্ট!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, ‘আজকের দিনের পরে তোমার পিতা আর কোনো কষ্টের সম্মুখীন হবে না।’ আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবর দেওয়া হচ্ছিল, তখন ফাতিমা আনাস

^{১০৮} সহীহ, বুখারী (৪৪৩৭)।

^{১০৯} সহীহ, বুখারী (৪৪৩৭)

^{১১০} সুনান, আত-তিরমিযি, হাদীস নং ৯৭৮।

রাখিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘তোমরা সবাই কেমন করে রাসূলের কবরের উপর মাটি ফেলবে!’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় পুরো আরব উপত্যকার শাসক ছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশের শাসকরা তাকে ভয় পেত। সাহাবীরা, যাদের সংখ্যা লাখের উপরে, তার জন্য (সর্বোপরি ইসলামের জন্য) নিজেদের জীবন, ছেলে-মেয়ে এবং সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছেন যেগুলো তার উত্তরসূরীর কাছে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু সত্য পুরোপুরি ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি দিনার কিংবা দিরহামও রেখে যাননি। তিনি কোনো পুরুষ অথবা মহিলা গোলামও রেখে যাননি। বস্তুত তার রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল অনেক কম যা হচ্ছে : একটি সাদা রং-এর খচ্চর, ব্যবহারের কয়েকটি অস্ত্র এবং মুসলিম সাধারণের কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করা কিছু জমি।^{১১১} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বর্ম (যাতুল ফযুল নামক বর্মটি) ত্রিশ সা’ পরিমাণ গমের পরিবর্তে এক বছরের জন্য জনৈক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। এক সা’ মানে হচ্ছে প্রায় পৌনে তিন সের গম। এটাও বাধ্য হয়ে পরিবারের ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনে করেছিলেন।^{১১২} এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছিলেন। যদি তিনি চাইতেন, তাহলে বিশাল বিশাল অট্টালিকা বানাতে পারতেন, কোষাগার থেকে বিরাট পরিমাণ টাকা-পয়সা নিতে পারতেন! যদি তিনি কোনো কারণে এসব চাইতেন, তাহলে তার সাহাবীরাও দিতে পেরে আনন্দ বোধ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়ার কোনো কিছুই চাননি। বরং তিনি তো কেবলই আখেরাতকে চেয়েছেন।

^{১১১} সহীহ, বুখারী (৪৪৬১)।

^{১১২} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ, আন-নদভী, পৃ. ৪০৩।

সোমবার দুপুরে সূর্য হেলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিল ১২ রবিউল আওয়াল ১১ হিজরী। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল তেষটি বছর। তার মৃত্যুর দিনটি ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দুঃখজনক দিন। বলা যায়, পুরো মানবতার জন্য বড় কষ্টের দিন। আর তার জন্মের দিনটি ছিল পৃথিবীতে সূর্য আলো দেওয়ার পর থেকে সবচেয়ে আনন্দঘন দিন।^{১১৩}

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে আগমন করেছিলেন, সেদিন মদীনার সবকিছুই বর্ণিল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন, সেদিন সবকিছু বিবর্ণ হয়ে গেল।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর উম্মে আইমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন। কেউ একজন তাকে কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমি অবশ্যই জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু আমি কাঁদছি এজন্য যে, রাসূলের ইন্তেকালের সাথে সাথে ওহী নাযিল হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।’^{১১৪}

দ্বিতীয়। ভয়ানক পরিবেশ এবং আবু বকর

রা.-এর অবস্থান

ইবনে রযব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন মুসলমানরা ব্যথিত হলো, নির্বাক এবং বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কেউ কেউ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল এবং হতবুদ্ধি হয়ে গেল; অনেকে বসে পড়ল এবং

^{১১৩} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ, আন-নদভী, পৃ. ৪০৪।

^{১১৪} মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৪৫৪।

এমনকি তারা দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল; অনেকে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল; আর এক দল (মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে) রাসূলের মৃত্যুকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে লাগল (এবং শেষ দলের মধ্যে ছিলেন উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু)।^{১১৫}

ইমাম-আল-কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘মানুষ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ সহ্য করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কোনো দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তখন তার উচিত আমার মৃত্যুর সময়ের অবস্থা চিন্তা করা। কারণ আমার মৃত্যু দুনিয়ার সব কষ্টের চেয়ে বেশি।’ বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কোনো মুসলমানই এর চেয়ে বেশি কষ্টের মুখোমুখি হবে না। দুনিয়ার বুকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। নবীর সিলিসিলাও বন্ধ হয়ে গেছে (দুনিয়াতে আর কোনো নবী প্রেরণ করা হবে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরই সবচেয়ে বড় ফেতনা হয়ে ওঠে ভণ্ড নবীর দাবীদাররা। তারা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা ইসলামের পিরামিডের চূড়া থেকে নিচের দিকে নামার প্রথম ফেৎনা হয়ে ওঠে (এটা এমন হওয়ারই কথা ছিল যেমন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘যখন কোনো কিছু তার পরিপূর্ণতার চূড়ায় পৌঁছে যায়, তখন সেটার নিচে ছাড়া আর কোনো দিকে যাওয়ার থাকে না।’)।^{১১৬}

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন, ‘পুরো পরিস্থিতি বেসামান হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু তাদের পিঠ ভেঙ্গে দিল। এটা ছিল জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুসিবত। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে আত্মগোপন করলেন। উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্বাক হয়ে গেলেন। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবোল-তাবোল বলা শুরু করলেন।’

^{১১৫} লাতাইফ আল-মাআরিফ, পৃ. ১১৪।

^{১১৬} তাফসীর আল-কুরতুবী (২/১৭৬)।

সম্ভবত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুকে এত বেশি অস্বীকার করেনি। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করার কথা বলছিল, তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে শাসাচ্ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাননি। বরং তিনি মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালামের মতো সাময়িকভাবে আল্লাহর কাছে গিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিনের জন্য আল্লাহর কাছে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহর কসম, মূসা আলাইহিস সালামের মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার ফিরে আসবেন। এখন যারা বলছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন, তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে।’^{১১৭}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দ্রুত তার ঘোড়ায় উঠে বসেন এবং তার বাড়ি থেকে সোজা মসজিদে নববীতে এসে থামেন। কারও সাথে কোনো কথা না বলে তিনি সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত দেহের কাছে যান। তাকে একটি চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু দেন এবং কাঁদতে শুরু করেন। তারপর তিনি বললেন, ‘আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে দু-বার মৃত্যু দিবেন না। তিনি আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছিলেন, এর স্বাদ আপনি আস্বাদন করেছেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইরে বের হয়ে দেখেন যে, তখনো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই কথা বলছে। তিনি বললেন, ‘হে উমর, তুমি বস।’ তারপর তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি

^{১১৭} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ, আবু শুহবাহ (২/৫৯৪)।

ভাষণ দিলেন। আল্লাহর হামদ ও নাত পড়ার পর তিনি বললেন, ‘হে জনমণ্ডলী, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব ও অবিদ্যমান। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ
قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ
اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বৈ আর কিছুই নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে? যেফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কৃতজ্ঞ লোকদের আল্লাহ যথোচিত পুরস্কার দিবেন।^{১১৮}

পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, আবু বকরের মুখে এ আয়াত শোনার পর আমি হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমি তখনই অনুভব করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।’^{১১৯}

ইমাম আল-কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘এই আয়াত (সাথে সাথে এ ঘটনাটাও) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব ও সাহসিকতার বিরাট প্রমাণ বহন করে, যদি সাহসিকতাকে কঠিন দুঃখজনক পরিস্থিতিতে দৃঢ় এবং স্থির অন্তঃকরণের সাথে বিচার করা হয়। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ঘটনার চেয়ে আর কোনো কঠিন দুঃখজনক পরিস্থিতি ছিল

^{১১৮} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪৪।

^{১১৯} সহীহ, বুখারী (৪৪৫৪)।

না।...অনেকে বলেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি এবং এ দলের মধ্যে ছিলেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন। চারিদিকে একটি চরম হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তিলাওয়াত করে পরিস্থিতি সামলেছিলেন।^{১২০} আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘পরিস্থিতি এতই জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তিলাওয়াত করার আগে লোকজন যেন জানতই না আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেছিলেন!’^{১২১}

আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর তার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন যিনি মুসলিম জাতিকে এরকম অনেক জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছেন, অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছেন যা মুসলিম জাতিকে বিপর্যস্ত করেছিল এবং যখন কেউ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি, তিনি তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন (যা এমনকি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও পারেননি)। মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে হবে এবং তাকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাকে ঘৃণা করা মুনাফিকের লক্ষণ।^{১২২}

^{১২০} তাফসীর আল-কুরতুবী (৪/২২২)।

^{১২১} সহীহ, বুখারী (১২৪১, ১২৪২)।

^{১২২} মারাদুন নবী সা. ওয়া-ওয়াফাতিহি, পৃ. ২৪।

তৃতীয়। বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ব্যাপারে সব সাহাবীরা নিশ্চিত হওয়ার পর ঐদিনই আনসারী সাহাবীদের একটি দল বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে জমায়েত হয়। ঐদিন ছিল ১২ রবিউল আওয়াল, সোমবার, ১১ হিজরী। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতির জন্য প্রথম খলীফা হিসেবে কাউকে নির্বাচন করা।^{১২৩}

খায়রায গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদাহর নেতৃত্বে আনসার সাহাবীরা জমায়েত হয়েছিল। এ সময় মুহাজিরগণও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অন্য এক জায়গায় একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন। মুহাজিরগণ তাদের মধ্য থেকেই একজনকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই তারা তাদের আনসার ভাইদের কথা স্মরণ করে এক অন্যকে বলতে লাগল, 'চলুন আমরা আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই। হয়তো তারা আমাদেরকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা আনসার ভাইদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম, তখন আমাদের সঙ্গে তাদের দু-জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। তারা উভয়েই এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, 'হে মুহাজির দল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?' তখন আমরা বললাম, 'আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি।' তারা বললেন, 'না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত।

^{১২৩} আত-তারিখি আল-ইসলামী (৯/২১)।

আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন।' তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব।' আমরা চললাম। অবশেষে বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক লোক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোক কে? তারা জবাব দিল, ইনি সা'দ ইবনে উবাদাহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার কী হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরে আক্রান্ত।

আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবাদ। আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি ছোট দল মাত্র, যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে আলাদা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খেলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নিশ্চুপ হলেন তখন আমি কিছু বলার ইচ্ছে করলাম। আর আমি আগে থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভালো লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা ঠাণ্ডা করতে চাইলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তুমি থাম।' আমি তাঁকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোনো কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঐরকম বরং তার থেকেও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা বলেছ আসলে তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খেলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্দিষ্ট। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম

আরব। আর আমি এ দু-জন হতে যে কোনো একজনকে তোমাদের জন্য নির্ধারিত করলাম। তোমরা যে কোনো একজনের হাতে বাইআত হয়ে যাও।

এরপর তিনি আমার ও আবু উবাইদাহ ইবনু জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ব্যতীত যত কথা বলেছেন কোনোটাকে অপছন্দ করিনি। আবু উবাইদাহ বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান আছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হবার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে অগ্রসর করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোনো গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ, হয়তো আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না।’ তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, ‘আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও বংশগত সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের হতে হবে এক আমীর আর তোমাদের হতে হবে এক আমীর।’ এ সময় অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।

আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, ‘হে আবু বকর! আপনি হাত বাড়ান।’ তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বাইআত হলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বাইআত হলেন। অতঃপর আনসারগণও তার হাতে বাইআত হলেন।^{১২৪}

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা অনুসারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথা বলেন, তিনি আনসার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত যা নাযিল হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা সবই সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি সা’দ ইবনে

উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে লক্ষ করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমস্ত লোক যদি এক উপত্যকার পথে যাত্রা করে, আর আনসার সম্প্রদায় সে উপত্যকার পথে না গিয়ে অন্য পথে চলতে আরম্ভ করে, তবে আমি আনসারদেরই সহযাত্রী হয়ে চলব।’ হে সা’দ, আপনার সম্ভবত এটাও মনে আছে, কেননা তখন আপনিও সে মজলিসে বসা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সম্মুখে বলেছেন, ‘জাতির নেতা কুরাইশ সম্প্রদায় থেকেই হবে। কুরাইশরাই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাদের ভালো লোকেরা ভালো লোকেরই অনুসরণ করবে এবং তাদের মন্দরা মন্দ লোকেরই অনুসরণ করবে।’ এটা শুনে সা’দ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘নিঃসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন। আমরা থাকব পরামর্শদাতা আর আপনারা হবেন নেতা।’^{১২৫}

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা ও করণীয়

১। জনগণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

আনসার সাহাবীদের প্রতিনিধি যখন নিজেদের মধ্য থেকে ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে সকলকে অবহিত করছিলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে তার বক্তৃতা সাজিয়েছিলেন। পরে তিনি এটাও বলেছিলেন যে, বক্তৃতার কথামালার গাঁথুনীতে তিনি নিজেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কথা বলার আগেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে চুপ থাকতে বললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টাই পরীক্ষার করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি নিজেই মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে কথা বলবেন। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

^{১২৫} মুসনাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল (১/৫)।

আনহু ভালো করেই জানতেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালো এবং সম্ভবত এটাও ভেবেছিলেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে এই উত্তেজিত অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয় এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি রয়েছে। অবশ্যই মুহাজিরীনরা সত্যের উপর ছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই খিলাফাতের ব্যাপারটি কুরাইশ বংশের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন। আনসার সাহাবীরা যদিও তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক ছিল না, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, তারা সবাই নিবেদিত মুসলমান। তাদের আবেগ এবং ভালোবাসাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এজন্য মুহাজিরীনদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচিত হবে, এটা শুধু জানিয়ে দেওয়া যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত ইসলামের জন্য মহান ত্যাগের কথা স্মরণ করে তাদের যথোপযুক্ত প্রশংসা করা উচিত ছিল যাতে তাদের অন্তঃকরণকে জয়ী করা সম্ভব হতো। আর তখনই তাদের পক্ষে সম্ভটচিন্তে সবকিছু মানা সম্ভব হতো।

এটা নিশ্চিত যে, এ অসম্ভবকে সম্ভব করার যোগ্যতা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেশি ছিল। পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ‘তাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথা বললেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোনো কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঐরকম বরং তার থেকেও উত্তম কথা বললেন।’

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে কথা বলা শুরু করলেন যে, তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি আনসার সাহাবীদের মন জয় করে ফেললেন। তিনি তাদেরকে তার প্রতি বিশ্বস্ত করে তুললেন এবং তাদের ভুল চিন্তাভাবনা শুধরে দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে জানতেন যে, যখন কেউ কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে অথবা শক্রতা প্রকাশ করে, তখন মুসলমান হিসেবে প্রথম কাজ হচ্ছে, তার

অন্তঃকরণকে জয় করার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে অপরপক্ষের ভালো দিকটার প্রশংসা দিয়েই শুরু করতে হয়, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে হয়, তার আচরণে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয় এবং সর্বোপরি পরিকার এবং যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলতে হয় যা অপর পক্ষের মনে ভালো লাগে। এ পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে অনেক উদাহরণই রয়েছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমেই তাদের মহান গুণাবলীর কথা তুলে ধরলেন। কুরআন ও হাদীসে তাদের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ আছে, এর সবই তিনি একে একে উল্লেখ করলেন। কিন্তু তারপরেই তিনি বলেন যে, এসব উন্নত গুণাবলী থাকার পরেও আনসার সাহাবীরা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে অধিকারী নন। কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকার নির্দেশনা রয়ে গেছে যে, মুসলিম জাতিকে কুরাইশ বংশ থেকে নেতৃত্ব দিবে।

এটা পরিকার করার পর তিনি অনেকগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করলেন যাতে আনসার সাহাবীরা নিশ্চিত হতে পারেন যে, খিলাফতের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি এবং তারা এ বিষয়ে দৌড়ঝাপ করারও দরকার নেই। উল্লেখিত প্রমাণসমূহের মধ্যে তিনি কুরআন মাজীদ থেকে এই আয়াতটিও পেশ করেছিলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
هُمْ الصَّادِقُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(এ সম্পদ) অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্যে যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যশ্রয়ী। এবং (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে) যারা এ নগরীতে (মদীনায়ে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম।^{১২৬}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং (কাজে-কর্মে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।^{১২৭}

আগের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, সেখানে আনসারদেরকে ‘সফলকাম’ বলা হয়েছে এবং মুহাজিরদের ‘সত্যবাদী’ বলা হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরকে সত্যবাদীগণের সাথে থাকতে বা তাদের অনুসরণ করতে বলেছেন। উপরের দু-টি আয়াত উদাহরণ হিসেবে পেশ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তার সুগভীর এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মুহাজিরীদের থেকে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে আরও একটি দিকে ইশারা করেন: খলীফা হওয়ার জন্য ব্যক্তির এমন কিছু যোগ্যতা থাকা

^{১২৬} সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮-৯।

^{১২৭} সূরা আল-তাওবাহ, ৯:১১৯।

প্রয়োজন যাকে আরবের সকল সম্প্রদায় মেনে নিতে পারে। এটা সর্বজন স্বীকৃত ছিল যে, সকল আরব সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশরাই সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিল। কুরাইশরাই অলঙ্ঘনীয় ও দুর্জয় শহর মক্কার অধিবাসী, সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং ঐতিহ্যময় বংশ পরিক্রমা কুরাইশদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, অতীতে কয়েক দশক বরং শতাব্দী ধরে কুরাইশরাই আরব সমাজে একচ্ছত্র গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। যদি মদীনার কাউকে খলীফা নিয়োগ করা হতো, তাহলে অন্যান্য সম্প্রদায় এতে আপত্তি করার সম্ভাবনা ছিল। সবাই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে অন্য গোত্র থেকে ভালো মনে করত। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ সম্প্রদায়কে সবদিক থেকে বেশি সম্মানিত করেছেন। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর। তারা মক্কা শহরের অধিবাসী। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরই একজনকে শেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তার বলিষ্ঠ যুক্তি আনসারদের সামনে পেশ করলেন, তখন আনসাররা সবাই তাকে এ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ হিসেবে মেনে নিল। আনসারদের একজন নেতা সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু চমৎকারভাবে বলে উঠলেন যে, মুহাজিররাই মুসলিম জাতির নেতা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তারা যেমন তার উপদেষ্টা, সহকারী এবং সাহায্যকারী হতে পেরেই গৌরববোধ করেছে, তার মৃত্যুর পর তারা তেমনি থাকবে।' এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যৌক্তিক এবং সঠিক বক্তব্য, অন্যদিকে আনসারদের নমনীয়তা ও উদারতার কারণে সহজেই মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর সকলের পক্ষ থেকে খলীফা নির্বাচনের কাজও সহজ হয়ে যায়।

২। আবু বকর রা.এবং উমর রা.—উভয়ে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে অনগ্রহী ছিলেন

মুসলমানদের মধ্যে তারাই আসলে সত্যিকারের নেতা হওয়ার যোগ্যতম প্রার্থী যারা আদৌ নেতা হতে চান না। তারা অন্য মুসলামানের উপর নেতৃত্ব নিতে অনিচ্ছুক, কারণ তারা জানেন এটা

কোনো সুযোগ গ্রহণের বিষয় নয়। বরং এটা একটি দায়িত্ব এবং বোঝা যে কারণে তাকে কিয়ামতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। একজন সাধারণ মুসলমানেরও নিজের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এটা সত্যি যে, তার পরিবারের সার্বিক দেখভালো করাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিও তার দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু এটার ব্যাপ্তি অনেক কম। কিন্তু একজন নেতাকে তার অধীনস্থ সকল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হয়। তাকে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে শাসন করতে হয় এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তাকে সকল মানুষের জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। যখন সবাই বিশ্রাম নেয়, তখন নেতাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং তাদের কল্যাণে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এ কারণেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর খলীফা হতে আগ্রহী ছিলেন না। যদিও তারা সকলের চেয়ে অধিক যোগ্য ছিলেন। বনু সাঈদার চত্বরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জনের ব্যাপারে প্রস্তাব করেন যাদেরকে তিনি এ পদের যোগ্য মনে করেছিলেন। তারা হচ্ছেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আবু বকরের এই একটি কথা ছাড়া আমার সবই ভালো লেগেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান আছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হবার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে অগ্রসর করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোনো গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না।’

খলীফা হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থী। এ সত্য উপলব্ধি করেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘আপনি হাত বাড়ান।’ সঙ্গে সঙ্গে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার হাতে বাইআত হন। আরেক বর্ণনামতে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হে আনসার

লোকসকল! তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযে ইমামতি করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন? এটা জানার পর কে আছ এমন যে আবু বকর থেকে আগে বেড়ে যাবে?’ আনসার সাহাবীরা জবাব দিলেন, ‘আমরা কাউকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আগে অধিক সম্মানিত ভাবা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।’

বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে সমবেত লোকদের মধ্যে কেবলমাত্র উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলার তাওফিক পেয়েছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা হিসেবে কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বিভিন্ন সময় গুরুত্ব সহকারে ইশারা করে গেছেন যে, এ কাজের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ইন্তেকালের পূর্বে চরম অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযে ইমামতির জন্য নিয়োগ দেন। যখন কেউ কেউ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোমলচিত্ত ও নরম মেজাজের জন্য নামায পড়াতে গিয়ে কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না এবং এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত সঠিক ব্যক্তি নন বলে জানিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব রাগ করেছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ‘অন্য কেউ নয়, বরং আবু বকরই নামায পড়াবেন।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এ বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন, তখন সবাই সহজেই স্বীকার করে নেয় যে, খলীফা হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে বেশি যোগ্য প্রার্থী। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যে অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা ও নিজের অধিকার না থাকার স্বীকৃতি ছিল। তারপর থেকে সবকিছু এত দ্রুত সংঘটিত হতে থাকে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ পাননি। যদিও তিনি এটা করতে পারেননি, কিন্তু পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বয়ানে এ কথা পরিষ্কার

বলেছেন যে, তিনি প্রথমে খলীফা হতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং কয়েকটি ঘটনায় তিনি নিজেকে এ পদ থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন যেন অন্য কেউ এ পদে আসীন হতে পারেন। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। কারণ ততক্ষণে সবার মনে এটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই তার একমাত্র যোগ্য উত্তরসূরী।

এক খুতবায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি খেলাফত পদের জন্য প্রার্থী এবং লোভী ছিলাম না। প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আমি এই পদের জন্য কখনো কোনো প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। এটা পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারেও আবেদন জানাইনি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা আমাকে খেলাফতের পদ গ্রহণের জন অনুরোধ করলে আমি আশঙ্কা করলাম যে, আমি এ পদ গ্রহণ না করলে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদ-ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। সে ভয়েই আমি এ পদ গ্রহণ করেছি। নেতৃত্বপদ গ্রহণ করে আমার মনে কোনো শান্তি ও স্বস্তি নেই। বরং আমি তো মনে করি যে, আমার উপর বিরাট এক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গুরুদায়িত্বভার গ্রহণের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। তবে যদি আল্লাহ তা‘আলা আমাকে শক্তি দান করেন এবং প্রত্যেকে কর্তব্য পালনে আমাকে সাহায্য করেন, তবেই আমার দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব হবে। আজও আমি এটাই কামনা করি যে, আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে আমার মাথা থেকে এই গুরুদায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দান করুন।’

নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমরা যখন বনু সাসীদা গোত্রের চতুরে সমবেত হয়েছিলাম, তখন আমি এ খেলাফতের দায়িত্ব উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করব বলে ভেবেছিলাম। আমার আশা ছিল, তাদের কেউ একজন মুসলিম জাতির নেতা হবে এবং আমি তার মন্ত্রী হব।’

এক ঘটনায় তিনি সবার সামনে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘হে লোকসকল, তোমাদের স্বাধীনতা আছে, তোমরা যাকে ইচ্ছা তাকে খলীফা বানিয়ে নাও। তখন আমি তোমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে পারব।’ তখন উপস্থিত সবাই একযোগে কোরাসসহ জবাব দিল, ‘আমরা আপনাকে খলীফা হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি। আপনিই ছিলেন রাসূলের সাথে দু-জনের একজন (সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানকালে)।’

লোকেরা যখন আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছিল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে, যদি কেউ তাকে খলীফা হিসেবে মানতে না চায়, তাহলে সে যেন সামনে আসে। তখন একজন এগিয়ে এল। তিনি হলেন আলী আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি খেলাফতকে অস্বীকার করতে আসেননি। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অধিক যোগ্য লোক আর কেউ নেই। তিনি তরবারি উন্মুক্ত করে মিসরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক পা মিসরে রেখে এবং আরেক পা মাটিতে রেখে তিনি ঘোষণা করলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে অব্যাহতি দিতে বলি না, আর আপনার অব্যাহতি গ্রহণ করাও হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সবার আগে মর্যাদা দিয়েছেন। কে আছে এমন যে কিনা আপনার মর্যাদাহানী করে?’ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই একমাত্র ব্যক্তি নন যে নেতৃত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন; বরং তা ব্যাপকভাবে সকল বড় বড় সাহাবীদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস বিকৃত করার জন্য যে কোনো হীন কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা নির্লজ্জভাবে প্রচার করে যে, বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে সমবেত মুহাজিরগণ ও আনসারগণ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে এর স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। কিন্তু তারপরেও তারা

এ মিথ্যা ছড়াতেই থাকে। সত্যিকার অর্থে আনসার সাহাবীরা কেবলমাত্র মুসলিম জাতির উন্নতিই কামনা করেছে এবং এজন্য তারা যেভাবে হোক নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছে। এজন্যই তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হতে দ্বিধাবোধ করেনি। ইসলামের শত্রুরা দাবী করে যে, আনসার সাহাবীরা খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তাহলে আনসাররা কেন এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দিলেন? কারণ সেখানে আনসার সাহাবীরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন এবং তাদের কাছে অস্ত্র-সস্ত্রও বেশি ছিল। তারা খুব সহজেই মুহাজিরদের বাধ্য করতে পারতেন যে, তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে মেনে নেন। এগুলোর কিছুই সেখানে ঘটেনি। কারণ বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে তিক্ততার বাতাস ছিল না, ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহযোগিতার বাতাস। আনসার সাহাবীরা শতভাগ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগের পক্ষে ছিলেন। পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শুরু দিকে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে তারা এটা প্রমাণও করেছেন। যেমন, উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এর বড় প্রমাণ। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ খুবই দৃঢ় ছিল এবং বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রপাচনা ও উদ্দেশ্যমূলক বর্ণনাসমূহ থেকে অনেক বেশি মযবুত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর আনসার সাহাবীদের কেউই তার হাতে বাইআত হতে অস্বীকার করেননি।

৩। সাঈদ ইবনে উবাদাহ রা. এবং আবু বকর রা.-এর খেলাফতের ব্যাপারে তার অবস্থান

দুর্বল এবং বানোয়াট হাদীস থেকে এ ধারণা দেওয়া হয় যে, বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি কলহ

এবং বিবাদপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সहीহ বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেখানে ক্ষমতা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা কোনো ধরনের সহিংসতা হয়নি। বরং খুব কম সময়ের মধ্যেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথম খলীফা হিসেবে মেনে নিতে সবাই ঐক্যমতে পৌঁছেছে।

এরকম বানোয়াট হাদীসে এটা বলা হয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে সর্বপ্রথম সা'দ ইবনে উবাদাহ বাইআত গ্রহণ করেন। এটা সত্য যে, আবু বকর এবং উমর বনু সাঈদ গোত্রের চতুর্নে আসার আগে সা'দ ইবনে উবাদাহকে মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু যখনই আবু বকর তাকে রাসূলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন সা'দ ইবনে উবাদাহ বলে উঠলেন, 'আমরা থাকব পরামর্শদাতা আর আপনারা হবেন নেতা।' আমি এখানে আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেরা পরস্পরের মধ্যে এমন কোনো চক্রান্তও করেননি যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন মুসলিম জাতির খলীফা হবেন। এ ধরনের অসত্য কথা আমি এজন্য উল্লেখ করলাম যে, অনেক ঐতিহাসিকগণ তাদের বই-পুস্তকে এসব মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কিছু কিছু ঐতিহাসিকগণ সা'দ ইবনে উবাদাহ সম্পর্কে বানোয়াট এবং দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তারা লিখেছেন যে, সা'দ ইবনে উবাদাহ মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন যেন তার খলীফা পদ তারা ছিনিয়ে না নিতে পারে। তাদের এই উক্তি কেবল বানোয়াট যে তা নয়, বরং এটা সা'দ ইবনে উবাদাহ ইসলামের জন্য সারাজীবন যে ত্যাগ-তিতিষ্কার স্বাক্ষর রেখেছেন, তারও বিরোধী। উল্লেখ্য যে, সা'দ ইবনে উবাদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে একজন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন নকীব সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনিই সম্ভবত একমাত্র মদীনার সাহাবী যাকে ঈমান আনার কারণে মক্কায় নির্যাতন করা হয়েছে। তার দু-হাত গ্রীবায

বেঁধে বন্দিরূপে মক্কায় প্রবেশ করানো হয়েছিল। পরে যুবাইর ইবনে মুতইম তাকে মুক্ত করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন মহানুভবতা এবং বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শও গ্রহণ করেছিলেন। এ পরামর্শে তারা নিজেদেরকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জন্যই নিবেদন করেছিলেন। এরকম গৌরবান্বিত অতীত জীবন থেকে এটা অনুমান করাও অসম্ভব যে, তিনি জাতিগত সম্প্রীতি ভাঙ্গার জন্য উস্কানি দিবেন অথবা ভিন্ন গোত্র থেকে মুসলিম জাতির নেতা নির্বাচিত হওয়ায় আহত হবেন।

এসব বানোয়াট বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পর সা'দ ইবনে উবাদাহ তার পেছনে নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তিনি এমনভাবে আচরণ করছিলেন যাতে মনে হয়েছিল তিনি নিজেকে মুসলিম সমাজ থেকে পুরোপুরি আলাদা করে নিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'হে সা'দ, আপনার সম্ভবত এটাও মনে আছে, কেননা তখন আপনিও সেই মজলিসে ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সম্মুখে বলেছেন, 'এ বিষয় (খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে। মুসলিমরা তাদের মুসলমানদের এবং কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুসারী।' এটা শুনে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন। আমরা থাকব পরামর্শদাতা আর আপনারা হবেন নেতা।'^{১২৮}

কেউ এসব বানোয়াট বর্ণনার উপর নির্ভর করে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদাকে খাটো করতে পারে না। এবং ইসলামের জন্য তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং ত্যাগকে অস্বীকার করতে পারে না। উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ যে মিথ্যা, এটার দু-টি কারণ আছে। প্রথমত, এর বর্ণনাকারী ক্ষমতালোভীদের একজন এবং তার বর্ণনাকৃত সব হাদীসকে হাদীস বিশারদরা প্রত্যাখান করেছেন।^{১২৯} ইমাম আয-যাহবী তার সম্পর্কে বলেছেন, 'এটা খুবই পরিকার যে, এ হাদীসের রাবীগণ চরম দুর্বল।' দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের সকল বর্ণনা আমরা সা'দ ইবনে উবাদাহ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী যা জানতে পারি, তার সাথে বিরোধী। সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনভর ইসলামের জন্য তার ত্যাগের সাথে এর কোনো মিল নেই।

৪। উমর ইবনে খাত্তাব রা. এবং আল হুবাব ইবনে আল-মুনযির রা.-এর মধ্যে মতভেদসমূহ সম্পর্কে বর্ণনার মূল্যায়ন

বর্ণনায় এসেছে যে, বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে আলোচনা চলার এক পর্যায়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-হুবাব ইবনে আল-মুনযির আস-সালামি আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উদ্ভূত তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আসলে সত্য ছিল ভিন্ন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আগেই ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি কখনো আল-হুবাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কোনো উক্তি করবেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিই আমার কথার উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তাকে কোনো জবাব দেইনি। কেননা আমার আর তার মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিবাদ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এরূপ বিবাদে জড়াতে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমি শপথ করেছিলাম তাকে কষ্টদায়ক কোনো কথা বলব না।^{১৩০} এটা

^{১২৯} মীযান আল-ইত্তেদাল ফী নাকদ আর-রিযাল, আয-যাহবী (৩/২৯৯২)

^{১৩০} আল-আনসার ফিল-আসর আর-রাশিদী (পৃ. ১০০)

সত্য যে, হুবাব রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জন খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহাজিরদের পক্ষ থেকে একজন এবং আনসারদের পক্ষ থেকে একজন। একইভাবে এটাও সত্য যে, এটা ছিল বিভ্রান্তমূলক একটি প্রস্তাব।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-হুবাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে অভিযুক্ত মতানৈক্যের ব্যাপারে হুবাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু মনগড়া উক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। আমি এখানে ‘মনগড়া’ শব্দটি ব্যবহার করলাম কারণ, হুবাব সম্পর্কে আমরা যেসব নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই, তার সাথে এগুলোর কোনো মিল নেই। হুবাব একজন জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান সাহাবী ছিলেন। তাকে ‘জ্ঞানসম্পন্ন’ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি খুব সতর্কতার সাথে তার কথার শব্দমালা নির্বাচন করতেন। তদুপরি তিনি বদর এবং খাইবার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাতা ছিলেন।

এটা ঠিক যে, তিনি বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে ঐ সমাবেশে এ কথা বলেছিলেন যে, ‘আনসারদের মধ্য থেকে একজন খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং আরেকজন তোমাদের (মুহাজির) পক্ষ থেকে।’ তিনি এটা বুঝে-শুনেই বলেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, যদি ভুল কেউ খলীফা নির্বাচিত হয়ে যায়, তাহলে হয়তো সে আনসারদের প্রতি ভালো আচরণ করবে না। তিনি নিজেই তার কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমরা এ ব্যাপারে (খলীফা নির্বাচন) তোমাদের (মুহাজিরগণের) সাথে প্রতিযোগিতা করছি না। আমাদের আশঙ্কা যে, যে সম্প্রদায়ের লোকদের পিতা ও ভ্রাতাদের আমরা হত্যা করেছি, তারাই আবার এটা না হস্তগত করে নেয়!’^{১৩১} মুহাজিরগণ জানতেন যে, আল-হুবাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ভুল ধারণা করছেন। কিন্তু তারা তার আশঙ্কাকে অবমূল্যায়ন করেননি। কারণ তারা নিজেরাও মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশই শিরোধার্য। মুসলিম জাতির খলীফা সর্বদা কুরাইশ বংশ থেকেই নির্বাচিত করতে হবে।

৫। হাদীস : ‘(মুসলিম জাতির) নেতা কুরাইশ সম্প্রদায় থেকে হতে হবে।’

যেসব হাদীসে মক্কার কুরাইশ বংশ থেকে মুসলিম জাতির খলীফা নির্বাচনের আবশ্যিকতার বর্ণনা পাওয়া যায়, তা শুধু বুখারী, মুসলিম কিংবা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেই আসেনি, বরং হাদিসটির শব্দও বিভিন্নভাবে এসেছে। ফলে এটা নিয়ে কোনো ধরনের ভুল অথবা মনগড়া ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সহীহ বুখারী শরীফে মু’আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى
وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দীন কায়েমে লেগে থাকবে তত দিন খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন।^{১৩২}

সহীহ মুসলিম শরীফে এসছে,

لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا بِخُلَفَاءِ كُلِّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

ভবিষ্যতে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত (এবং দৃঢ় ও শক্তিশালী) থাকবে খলীফাগণ দ্বারা যারা সবাই কুরাইশ বংশের হবে।^{১৩৩}

^{১৩২} সহীহ, বুখারী (৭১৩৯)।

^{১৩৩} সহীহ, মুসলিম (১৮২১)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

এ বিষয় (খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের
হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু-জন লোকও বেঁচে
থাকবে।^{১৩৪}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন,

النَّاسُ تَبِعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَ
كَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরাইশদের অনুসারী।
মুসলিমরা তাদের মুসলমানদের এবং কাফেররা তাঁদের
কাফেরদের অনুসারী।^{১৩৫}

বুকাইর ইবনে ওয়াহাব আল-জাযারী বর্ণনা করেছেন যে, আনাস
ইবনে মালাক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকে
বলেছেন, ‘আমি তোমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা
সচরাচর সবার কাছে বর্ণনা করি না। আমরা একবার এক আনসার
সাহাবীর বাসায় ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
তাশরিফ আনলেন। আমরা বাড়ির দরজার দু-টি কড়া ধরে
দাঁড়িয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বললেন,

الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلُ
ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتَرْجِعُوا فَرَجِعُوا وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفُوا وَإِنْ حَكَمُوا
عَدَلُوا

^{১৩৪} সহীহ, বুখারী (৭১৪০)।

^{১৩৫} সহীহ, মুসলীম শরীফ (৭১৪০)।

ইমাম (মুসলিম জাতির শাসক) হবে কুরাইশ বংশ থেকে। তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে। একইভাবে তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। যদি তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই তারা সেটা করবে। যদি তারা কোনো চুক্তি করে, তবে তা রক্ষা করবে। আর যদি বিচার করতে হয়, তবে তা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে করবে।^{১৩৬}

ফতহুল বারিতে ইবনে হাজার ‘কুরাইশ বংশ থেকে শাসক’ - এই শিরোনামে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এ হাদীসগুলো বিভিন্ন বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন যেগুলো ‘আস-সুনান’, ‘আল-মাসানীদ’ এবং ‘আল-মুসান্নাফাত’ নামে পরিচিত। এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অনেক। এমন হাদীসের কিতাব খুঁজে পাওয়া দুস্কর যাতে এ বিষয়ে বর্ণনা নেই। বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ কাছাকাছি। সবগুলো হাদীসই এ বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, শরীয়তের নেতৃত্ব কুরাইশের মধ্যে থাকবে। এটা শুধু খেলাফতের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য বিষয়ে নেতা হওয়ার জন্য যোগ্য যে কেউ হতে পারবে।

অনেক হাদীস থেকে এটা যেমন পরিষ্কার যে, জাতির নেতা কুরাইশ বংশ থেকে হবে, তেমনি একই হাদীস থেকে এটাও পাওয়া যায় যে, কুরাইশদের অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরাইশরা তখনই মুসলিম জাতির শাসক হতে পারবে যখন তারা আল্লাহর বিধানকে কায়েম করবে। মু’আয রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস থেকে এ ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশনা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, একই ধরনের হাদীস আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত হয়েছে :

إِنْ اسْتَرْجِئُوا فَرَجِئُوا وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفُوا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ
لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ

যদি তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই তারা সেটা করবে। যদি তারা কোনো চুক্তি করে, তবে তা রক্ষা করবে। আর যদি বিচার করতে হয়, তবে তা ন্যায্যপরায়ণতার সঙ্গে করবে। যদি তাদের কেউ এসব না করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।^{১৩৭}

সুতরাং একই হাদীসে কুরাইশদের যেমন অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তেমনি তারা যদি আল্লাহুর হুকুম না মানে তবে তাদেরকে মানার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। যখন কুরাইশদের মধ্য থেকে কেউ নেতা হবেন এবং তিনি নশ্রতা ও ন্যায্যপরায়ণতার সাথে শাসন করবেন, তখন তিনি লোকদের জন্য একটি আশির্বাদ হয়ে উঠবেন। কিন্তু যখনই এর বিপরীত করবেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে উপেক্ষা করবেন, তাহলে এ ধরনের লোক থেকে মহামারী রোগ প্লেগের মতোই বেঁচে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي أَوْ فَسَادَ أُمَّتِي رُؤُوسُ أُغْيَلِمَةٍ سُفْهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ

মুসলিম জাতির সবচেয়ে অধঃপতন এবং ক্ষতির কারণ হবে কুরাইশদের মুর্খ তরুন নেতারা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আমরা তখন কি করব?’ তিনি জবাব দিলেন,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ

সম্ভব হলে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে (তাদের মন্দ কাজে সহযোগিতা করবে না এবং তাদের সাথে যুদ্ধে শরীক হবে না)।^{১৩৮}

^{১৩৭} আল-মুসান্নাফ, আবু শাইবাহ (৫/৫৪৪)।

^{১৩৮} দালাইল আন-নুবুওওয়াহ, আল বাইহাকি (৬/৪৬৪); আল-ইহসান ফী তাকরীব সহীহ হিফান (৬৭১৩)।

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে আনসার সাহাবীরা কুরাইশদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রথমে তারা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অটল ছিল। তারপর যখনই তাদেরকে খেলাফতের ব্যাপারে কুরাইশদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তারা নিজেদের দাবী থেকে সরে আসে এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করে।

এজন্য দেখা যায় যে, খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি কোনো বিশৃঙ্খলা কিংবা শুধুমাত্র আবেগনির্ভর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়নি, বরং এটা সম্পন্ন হয়েছিল ঐশী বাণীর প্রভাব এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে। পুরো প্রক্রিয়া এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, আনসাররা সবাই শেষমেষ সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং এমন একজনও ছিল না যার মধ্যে কুরাইশদের নেতৃত্ব লাভের অধিকারের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল। সবাই খুশি মনেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা এ ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে থাকে এবং কুরাইশদের নেতৃত্বের অধিকার সংক্রান্ত সকল হাদীসকে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলে মানে না, বরং তারা বলে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই এগুলো বলে বেড়িয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ। তারা বলে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথাটাকে একটি শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছেন যেন খেলাফতের সুযোগ কেবল কুরাইশদের হাতেই থাকে। অবশ্যই সত্য সত্যই। এজন্য আমরা দেখি যে, অনেকগুলো সহীহ হাদীস থেকেই জানা যায় যে, খেলাফতের বিষয়টি কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে মুহাজিরীন এবং আনসারদের সকলেই এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং সবাই ঐক্য এবং সম্প্রীতি নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেছে।

৬। আবু বকর রা.-এর খেলাফতড়কুরআনের আয়াতে ইশারা^{১৭৯}

কুরআন মাজীদে সরাসরি এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলিম জাতির জন্য প্রথম খলীফা হিসেবে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তবে অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে ইশারা আছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে বেশি যোগ্য। আয়াতগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে (যেমন ইহুদী), তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (যেমন খ্রিস্টান)।^{১৪০}

এই আয়াতগুলো প্রতিটি মুসলমানই দিনে অন্তত সতেরবার পড়ে থাকে এবং এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কয়েকটি আদেশ দিয়েছেন : তিনি যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারা কারা? কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসায় আল্লাহ এর জবাব দিয়েছেন,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

^{১৭৯} এ অধ্যায়টি আরবী মূল গ্রন্থে নেই। এটি ইংরেজি অনুবাদকের সংযোজন।

^{১৪০} সূরা আন-নিসা, ৪:৬৯।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! ^{১৪১}

একটি গুণ হচ্ছে, তারা হবেন সিদ্দীক। যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে, সত্যবাদী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হচ্ছেন একজন সিদ্দীক। সত্যিকার অর্থে তিনি এ দলের মধ্যে সর্বোত্তম।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মতো যারা তাদের পথের দিকে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শিনকিটি যথার্থই বলেছেন, 'এ আয়াত থেকে আমরা পরিকার বুঝতে পারি যে, খলীফা হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে বেশি যোগ্য। সূরা ফাতিহাতে এটাই পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা ফাতিহাতে আমাদেরকে একটি দলের পথে চলার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং সেই দল হকের পথে রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে (যেমন ইহুদী), তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (যেমন খ্রিস্টান)। ^{১৪২}

^{১৪১} সূরা আল-ফাতেহা, ১:৬-৭।

^{১৪২} সূরা আল-ফাতেহা, ১:৬-৭।

কুরআন মাজীদেৱ আৰও অনেক জায়গায় আল্লাহ যাদেৱ উপৰ তাৰ নেয়ামত বৰ্ষণ কৰেছেন, তাৰেৱ পৰিচয় উল্লেখ কৰে বলেছেন তাৰা হছেন সত্যবাদী। ৰাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবৰ দিয়েছেন আবু বকৰ ৰাযিয়াল্লাহু আনহু হছেন তেমন একজন সত্যবাদী। ফলে এটা খুবই পৰিষ্কাৰ যে, আবু বকৰ ৰাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন মানুষ যাৰ উপৰ আল্লাহ তা'আলা তাৰ নেয়ামত বৰ্ষণ কৰেছেন যাকে আমাদেৱ জন্য আখেৰাতে মুক্তিৰ জন্য অনুসরণ কৰতে বলা হয়েছে। সুতরাং আবু বকৰ ৰাযিয়াল্লাহু আনহু সরল পথে অধিষ্ঠিত এবং তিনিই খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

খ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদেৱ মধ্যে যে ব্যক্তি তাৰ দীন থেকে ফিৰে যাবে তাহলে অচিৰেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেৱকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তাৰা তাকে ভালোবাসবে। তাৰা মুমিনদেৱ উপৰ বিন্দু এবং কাফিৰদেৱ উপৰ কঠোৰ হবে। আল্লাহৰ ৰাস্তায় তাৰা জিহাদ কৰবে এবং কোনো কটাক্ষকাৰীৰ কটাক্ষকে ভয় কৰবে না। এটি আল্লাহৰ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান কৰেন। আৰ আল্লাহ প্রাচুৰ্যময়, সৰ্বজ্ঞ।^{১৪৩}

আমরা জানি এ আয়াত ৰাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ জীবদ্দশায় নাযিল হয়েছে এবং এখানে ৰাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর কি ঘটবে তার দিকেও ইশারা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাওয়ার পরপরই অনেক ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হয় যারা ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা ইতিপূর্বে সতর্ক করেছেন যে, যদি তারা কখনো ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তিনি এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিন্দ্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোনো কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। পরে এ আয়াত অনুসারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যবাহিনী উদ্দিষ্ট হয়েছে যারা ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার অধীনস্থ সবার প্রতি যে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর খলীফা হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সত্যিকারের উত্তরাধিকারী ছিলেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর ওয়াদা সত্যে পরিণত হয় : আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যবাহিনী কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এবং কোনো বাধাকেই তারা পরওয়া করেননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভণ্ড নবীদেরকে পরাজিত করেন। এটা এমন একটি ঘটনা যার সাথে আয়াতের সারমর্ম পাশাপাশি রাখলে এটা মূর্ত হয়ে ওঠে যে, প্রথম খলীফা হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা তার উপর এবং সকল সাহাবীর উপর রাজি হয়ে যান।

গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু-জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত, আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{১৪৪}

উপরোক্ত আয়াত এবং মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচিত হওয়াকে যৌক্তিকভাবে মেলালে আগের আয়াত থেকে এখানে বিষয়টি আরও বেশি প্রামাণিক হয়ে ওঠে। এখানে তাকে ‘দু-জনের একজন’ বলা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, তিনি শুধু সওর পর্বতে গুহার মধ্যেই ‘দু-জনের একজন’ ছিলেন না, বরং তিনি পুরো মুসলিম জাতির স্তর বিন্যাসের মধ্যে ‘দু-জনের একজন’ ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও একটি দিক দিয়ে ‘দু-জনের একজন’ ছিলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন এবং যারা ইসলামের উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই কাজ করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ছিলেন।

ঘ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে,
আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই
পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি
শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং
তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি
তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির
পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা
আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক
করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।^{১৪৫}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ত্রিশ অথবা
তারও পরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে এই আয়াতের প্রেক্ষিতে
আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান
রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের
সমর্থন পাওয়া যায়। হাফিজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি
বলেছেন যে, ইসলামের শুরুর দিকে একজন প্রখ্যাত আলেম আবু
বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের
বিষয়টি কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে বলে দাবী করেছেন এবং
তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।

ঙ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ^{১৪৬}

এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।^{১৪৬}

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, যারা মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করেছে, তারা সবাই সত্যবাদী ছিলেন। আর এ দলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হিসেবে হিজরত করার বিরল সৌভাগ্যে অর্জন করেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা নিজেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সত্যবাদিতার স্বাক্ষর দিচ্ছেন। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা নিঃস্ব দেশত্যাগী, যারা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, কেউই মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। তারা নিজেরাও মিথ্যাবাদী হতে পারেন না এবং অন্যদের সাথেও মিথ্যা আচরণ করতে পারেন না; বাস্তবতা হচ্ছে, তারা নিজেরাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও সেটা গ্রহণ করেছিলেন। পরে সবাইকে বাইআত করে নিয়েছিলেন।

হাদীসসমূহ যেখানে আবু বকর রা.-এর খেলাফতের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত রয়েছে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ব্যাপারে এত বেশি সংখ্যক হাদীস রয়েছে এবং এত বেশি সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছে

যে, বিদআতপন্থী লোকদের পক্ষে কিছুতেই সেগুলো অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যারা এসব হাদীসকে অস্বীকার করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একরোখা। তারা ইচ্ছে করেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করে (নাউযুবিল্লাহ)। এসব হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীসে সরাসরি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের কথা বলা হয়েছে এবং বাকিগুলোতে সেদিকে পরিস্কার ইশারা রয়েছে। নিচে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হলো।

ক। যুবায়ের ইবনে মুত'ইম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল এবং কোনো ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার আসার আদেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই? স্ত্রীলোকটি এ কথা বলে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মৃত্যুর কথা বোঝাতে চাচ্ছিল। তিনি বললেন,

إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে আসবে।

এই হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে হাযার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এ হাদীস শিয়াদের যুক্তি খণ্ডন করে, যারা বলে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন।'

খ। হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন,

إِنِّي لَا أَذَرِي مَا قَدَرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي

আমি জানি না, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে আছি।
অতএব, তোমরা আমার পরে এই দু-জনের পদাঙ্ক অনুসরণ
করে চলবে।

এ বলে তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু
আনহুর প্রতি ইশারা করলেন।^{১৪৭} আরেক বর্ণনায় আছে, আমার
মৃত্যুর পর যারা আসবে, তাদেরকে অনুসরণ কর: আবু বকর
রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমার পরে তারা
তোমাদেরকে নেতৃত্ব দিবে।' এ হাদীসের মধ্যে তাদের অনুসরণের
তাকীদ করা হয়েছে। তাদের উত্তম চরিত্র এবং গোপন অবস্থার
সততার কারণে এ হাদীসের মধ্যে খিলাফতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত
রয়েছে।

গ। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزَعُ عَلَى حَوْضٍ أُسْقِي النَّاسَ فَجَاءَنِي
أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدَيَّ لِيُرْوِيَّ حَنِي فَتَزَعَّ دَلْوَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ
ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ أَرْ نَزْعَ
رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلآنُ يَتَفَجَّرُ

ঘুমের মধ্যে আমি দেখলাম, আমার হাউজ হতে পানি
উত্তোলন করছি। আর লোকদের পানি দিচ্ছি। আবু বকর
এসে আমাকে বিশ্রাম করতে দেওয়ার জন্য আমার হাত
থেকে বালতি নিয়ে দু-বালতি পানি উঠালেন এবং তার
উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর
উমর ইবনে খত্তাব এসে তার হাত থেকে বালতি নিলেন।
তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী উত্তোলনকারী আমি আর

^{১৪৭} সিলসিলাতুল-হাদীস আস-সহীহ, আলবানি (৩/২৩৩, ২৩৬)।

কোনোদিন দেখিনি। লোকেরা তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল, আর তখন হাউজ পরিপূর্ণ প্রবাহিত হচ্ছিল।

ইমাম শাফেঈ রহ. এ হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ‘নবীদের স্বপ্ন ওহী।’ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘তার উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল’ বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় কম হবে বলে ইশারা করেছেন। এ সময় ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নতুন নতুন দেশ জয় এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় শাসন করার সুবাদে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বহিঃবিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ঘ। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘মৃত্যুপীড়ায় অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন,

আবু বকর এবং তোমার ভাইকে আমার কাছে ডাক। আমি একটি বিষয় লিখতে চাই (আবু বকরের খলীফা হওয়ার নিশ্চয়তা প্রসঙ্গে)। আমার ভয় হয়, যার যোগ্যতা নেই, এমন কেউ হয়তো খলীফা হওয়ার আশা করবে এবং কেউ হয়তো বলবে, ‘আমি বেশি যোগ্য।’ কিন্তু আল্লাহ এবং ঈমানদাররা আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন না।^{১৪৮}

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইত্তেকালের পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা হবে সেদিকে ইশারা করেছেন। কিন্তু একই সময় এ আশাও ব্যক্ত করেছেন যে, মতানৈক্য বেশিক্ষণ টিকবে না যেহেতু ঈমানদাররা আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করবে না। পরে বনু সাঈদা গোত্রের চতুরে তাই হয়েছিল। লোকেরা শুরুতে অমত থাকলেও খুব দ্রুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সবাই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ঙ। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শোনাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে?’ আমরা বললাম, ‘না, হে আল্লাহর রাসূল, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।’ তিনি বললেন,

ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْبُخْضِ

আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে পেলে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, ‘না, হে আল্লাহর রাসূল, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।’ তিনি বললেন, ‘আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ।’

অতঃপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ‘লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে?’ আমরা বললাম, ‘না, হে আল্লাহর রাসূল। তারা আপনার জন্য অপেক্ষারত।’ ওদিকে সহাবীগণ এশার নামাযের জন্য রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে নেন। সংবাদবাহক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে লোকদের নিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘হে উমর, আপনি সাহাবীগণের ইমামতি করে নামায আদায় করুন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আপনিই এর অধিক যোগ্য।’ তাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই কয়েকদিন নামায আদায় করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু নিজে হাক্কাবোধ করলেন এবং দু-জন লোকের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাতের জন্য বের হলেন। ওই দু-জনের একজন ছিলেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, ‘তোমরা আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও।’ তারা তাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে বসিয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের ইক্তিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সহাবীগণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামাযের ইক্তিদা করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, ‘আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

অন্তিমকালের অসুস্থতা সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না?’ তিনি বললেন, ‘করুন।’ তাই আমি তাকে সে হাদীস শোনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোনো অংশেই আপত্তি করলেন না। তবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কি আপনার নিকট তার নাম বলেছেন?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু।’^{১৪৯}

এ হাদীস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলের সকল সাহাবীর মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম কেউ ছিল না; মানে তিনি সকলের মধ্যে সর্বোত্তম। আর এ সত্যই প্রমাণ করে যে, খলীফা হওয়ার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন। ঘটনাক্রমে এ হাদীস থেকে আরেকটি মাসআলা জানা যায়। যদি ইমাম সাহেব কোনো কারণে কোনো নামাযে ইমামতি করতে না পারেন, তবে তিনি অন্য একজনকে তার স্থলে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। আর এ ঘটনায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুরও বড়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তার পরিবর্তে অন্য কাউকে নামাযে ইমামতি করার জন্য খুঁজছিলেন, তখন তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই পছন্দ করে নিয়েছেন।

চ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন আনসার সাহাবীরা বলল, ‘দু-জন শাসক নিযুক্ত করা হোক। একজন আনসারদের মধ্য থেকে এবং আরেকজন তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ মুহাজিরীন থেকে)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘হে আনসার লোকসকল! তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে

নামাযে ইমামতি করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন? এটা জানার পর কে আছে এমন যে আবু বকর থেকে আগে বেড়ে যাবে?’ আনসার সাহাবীরা জবাব দিলেন, ‘আমরা কাউকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আগে অধিক সম্মানিত ভাবা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।’^{১৫০}

ছ। ইবনে সা’দ তার সনদে হাসান থেকে বর্ণনা করেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তিম পীড়াকালে কয়েকটি দিন-রাত এমনভাবে অতিবাহিত হতো যে, মসজিদে আযান হলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ডেকে বলে দিতেন, আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, নামায ইসলামের স্তম্ভ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আমাদের ইমাম, তখন আমরা তাকে আমাদের পার্থিব নেতৃত্বের জন্যও মনোনীত করে নিলাম। এরপর আমরা সকলেই তার হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি।’

এটা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, খলীফা পদের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সঠিক এবং একমাত্র যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। আবুল হাসান আল-আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সকল সাহাবী থেকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন। এটা এমন এক বিষয় যা সব মুসলমানের জানা প্রয়োজন। এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, সকল সাহাবী থেকে তিনি বেশি জ্ঞানী ছিলেন এবং কুরআন মাজীদ বোঝার ক্ষেত্রেও বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে (এটা কেবল সহীহ যে তা নয়, বরং সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি

কুরআন সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী হবে, সে ইমামতি করবে। যদি একের অধিক লোকের কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ হয়, তাহলে যে রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী হবে, সে ইমামতি করবে। আর যদি সুন্নাতের জ্ঞানী সবাই সমান হয়, তাহলে যে বয়স্ক, সে ইমামতি করবে। আর যদি বয়সের দিক থেকে সমান হয়, তাহলে যে আগে ইসলাম কবুল করেছে, সে ইমামতি করবে।’ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘আবুল হাসান আল-আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। আমাদের মনে রাখা উচিত, এ হাদীসে যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলোই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।’^{১৫১}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দু-টি মতামত পাওয়া যায়। একদল আলেম মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ব্যাপারে প্রচ্ছন্নভাবে বলে গেছেন। অন্য কথায় তিনি তার সাহাবীদেরকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করার জন্য আদেশ দেননি। শুধু ইশারা করে গেছেন, তারা যেন তা করে। আরেকদল আলেম মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু ইশারাই করে যাননি, বরং প্রথম খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার ব্যাপারে পরিকার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলে গিয়েছেন। প্রথম মতামতের স্বপক্ষে হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ হাদীস শাস্ত্রের আরও অনেক উলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হয়।^{১৫২} তাদের বক্তব্যের পক্ষে দু-টি হাদীস পেশ করা হয়। একটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের ইমামতির জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ করেছেন। আরেকটিতে রাসূলুল্লাহ

^{১৫১} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৫/২৬৫)।

^{১৫২} মিনহাজ আস-সুন্নাহ, ইবনে তাইয়িম্যা (১/১৩৪, ১৩৫)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর দিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের দরজা ব্যতীত অন্যান্যদের সব দরজা বন্ধ করার আদেশ দেন।

দ্বিতীয় মতের পক্ষে প্রস্তাবকেরাও হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে হাযাম আয-যাহবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ্য। তারা অনেকগুলো হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি এই যে, একজন মহিলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, ‘যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে যেও।’ তারা আরেকটি হাদীস তুলে ধরেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন,

আবু বকর এবং তোমার ভাইকে আমার কাছে ডাক। আমি একটি বিষয় লিখতে চাই (আবু বকরের খলীফা হওয়ার নিশ্চয়তা প্রসঙ্গে)। আমার ভয় হয়, যার যোগ্যতা নেই, এমন কেউ হয়তো খলীফা হওয়ার আশা করবে এবং কেউ হয়তো বলবে, ‘আমি বেশি যোগ্য।’ কিন্তু আল্লাহ এবং ঈমানদাররা আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

সবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি হাউজ হতে পানি উত্তোলন করছিলেন। আর লোকদের পানি দিচ্ছিলেন। তারপর আবু বকর আসেন এবং তাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তার হাত থেকে বালতি নেন।

উপরের সব বর্ণনা ও প্রমাণের সাপেক্ষে আমি নিশ্চিত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথম খলীফা হিসেবে মনোনীত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে

আদেশ করে গিয়েছেন। অবশ্য এ আদেশটি তিনি পরোক্ষভাবেই দিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে আদেশ না দেওয়ার কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জানিয়েছিলেন) যে, অন্য কেউ তার সমকক্ষ না থাকাতে মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই খলীফা হিসেবে পছন্দ করবে।^{১৫৩}

ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘মোটকথা, এটা পরীক্ষার যে, তার কথা এবং কাজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ঘটনায় ইশারা করেছেন যে, তার সাহাবীরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই প্রথম খলীফা হিসেবে পছন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কাগজে লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যেভাবেই হোক মুসলমানরা তাকেই পছন্দ করে নেবে এবং এজন্যই তিনি আর তা লিখে যাননি। যদি এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ থাকত, তাহলে তিনি প্রথম খলীফা হিসেবে আবু বকরের মনোনয়নের ব্যাপারে সরাসরি আদেশ দিয়ে যেতেন। বরং তিনি জানতেন তার সাহাবীরা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবে। এজন্য তিনি এ ব্যাপারে ইশারা করে দেওয়াটাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তার পরে খলীফা হওয়ার ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই তার পছন্দ।’

খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সরাসরি হুকুম না দেওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে আরও অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। যদি তিনি সরাসরি হুকুম দিতেন, ইবনে তাইমিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহলে এটা কেবল ওহীর মাধ্যমে সম্ভব হতো—হয় কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল হতো, না হয় রাসূলের হাদীস পাওয়া যেত। যেহেতু রাসূল সরাসরি বলে যাননি, এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

^{১৫৩} আকিদাহ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত (২/৫৪৮)।

আনহুর খেলাফতের বিষয়টি ওহীর মাধ্যমেই কেবল নিশ্চিত হওয়া যায়নি (কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসূলের হাদীসসমূহ যেখানে তার খেলাফতের দিকে ইশারা করা হয়েছে), বরং ইজমার মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার কাছে যেমন প্রিয় ছিল (যা তিনি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে ইশারা করেছেন), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও পছন্দ ছিল (যা তিনি বিভিন্ন কথা ও কাজে প্রকাশ করেছেন), এটা সকল ঈমানদাররাও তাকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। এটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তিন গুণ বেশি সম্মানের : তিনি আল্লাহ তা‘আলা, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সকল ঈমানদার কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন যাতে কোনো নিয়োগপত্রের প্রয়োজন ছিল না।^{১৫৪}

৮। আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সব উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতির সর্বময় শাসক এবং খলীফা হওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন। একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যাবে না যিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করেননি। বিষয়টি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বৈধতা প্রকাশ করে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তার উম্মতকে কখনো ভুলের উপর ঐক্যমতে পৌঁছাবেন না। এখান থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, কোনো সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে অস্বীকার করেননি। সাঈদ ইবনে যারিদকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘লোকেরা

^{১৫৪} মিনহায আস-সুন্নাহ (১/১৩৯-১৪১) এবং মাযমু আল-ফতওয়া (৯৩৫/৪৭-৪৯)

কখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে মেনে নিল?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, সেদিনই। মুসলিম জাতি হিসেবে তারা নেতৃত্ববিহীন দিনের একটি অংশও অতিবাহিত করা পছন্দ করেননি।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক। খতীব বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘মুহাজিরীন এবং আনসার সাহাবীরা কোনো যুক্তি-তর্ক ছাড়াই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে মেনে নেন। তারা তাকে ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা’ হিসেবে সম্বোধন করতেন। এটা খুব আশ্চর্যজনক যে, তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে আর কাউকে এ নামে ডাকেননি। বলা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় ত্রিশ হাজার মুসলমান ছিলেন। তারা সবাই তাকে এ নামে সম্বোধন করেছেন।’^{১৫৫}

খ। আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে মুহাজিরীন এবং আনসারদের প্রশংসা করেছেন। যারা বাইআতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন, আল্লাহ তা‘আলা নিচের এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন।

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল।’^{১৫৬}

^{১৫৫} তারিখে বাগদাদ (১০/১৩০, ১৩১)

^{১৫৬} সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১৮।

এ আয়াতে এবং এরকম আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যাদের প্রশংসা করেছেন, তারা কোনো যুক্তি-তর্ক ছাড়াই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তারা সবাই তার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন এবং সবাই তাকে ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা’ বলে সম্বোধন করেছেন। উল্লেখ্য, তারা সবাই এ বাইআত মেনে চলেছেন, তার মর্যাদাকে মূল্যায়ন করেছেন এবং তার খেলাফতের পুরো সময় পরিপূর্ণভাবে তার প্রতি অনুগত ছিলেন।

গ। আব্দুল মালিক জুওয়াইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘সকল সাহাবীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়েছিল। সবাই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং তার প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু শিয়ারা দাবী করে যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিরোধিতা করেছেন। তারা যা বলে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট। তবে হ্যাঁ, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু সাজ্জিদা গোত্রের চতুরে গণজমায়েতে ছিলেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের খবর শুনে তখন তিনি দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, যখন তিনি নির্জনতা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন, তখন বিরাট এক জামাতের উপস্থিতিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করেন।’

ঘ। আবু বকর আল-বাকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন, ‘আমাকে (খলীফা পদ থেকে) অব্যহতি দাও। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই’, তখন বিশ্বাসীদের নেতা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমরা আপনাকে পদচ্যুত করব না, অব্যহতি নিতেও বলব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ধর্মীয় ব্যাপারে (আমাদের থেকে) আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা দুনিয়ার ব্যাপারেও কি আপনার উপর বিশ্বস্ত থাকব না?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবম হিজরীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হজ্জ কাফেলা পরিচালনার দায়িত্ব

দিয়েছিলেন—আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে ওই ঘটনার দিকে ইশারা করেছেন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম পীড়ার সময় তাকে নামাযে ইমামতি করতে বলেছেন, সেদিকেও ইশারা করেছেন। মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, অকল্পনীয় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং ধর্মীয় বিষয়াদি বোঝার ব্যাপারে ছিলেন প্রচণ্ড ধী-শক্তির অধিকারী।^{১৫৭}

৯। খেলাফত কী? খলীফা বলতে কি বোঝায়?

এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, খেলাফতই (হুকুমতে এলাহিয়াহ) যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য সঠিক এবং প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা। খলীফার দপ্তর হতেই রাষ্ট্রের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন আদর্শ খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে, শরীয়তের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগ করা, মুসলিম জাতির যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবীরা চরম সংকটের মুখোমুখি হন। তাদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতো, অথবা সিদ্ধান্তহীনতায় থেকে নিজেদের মধ্যে বিভক্তি, দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার ভোগান্তিতে পড়তে হতো। এ জটিল পরিস্থিতিতে সাহাবীরা একজন নেতার প্রয়োজন অনুভব করলেন যার নেতৃত্বে তারা সবাই একত্রিত হতে পারবেন; তারা জানতেন যে, তাদেরকে একজন খলীফা নিয়োগ করতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তারা আর দেরি করেননি।

খেলাফতকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। আর এ দু-টির ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি

^{১৫৭} আল-ইনসাফ ফী মা ইয়াযিবু ইতিকাদু ওয়ালা ইয়যুযুল-জাল বিহি (পৃ. ৬৫)

মূলনীতি রয়েছে: পারস্পরিক সমঝোতা এবং বাইআত (খলীফার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ অথবা খলীফাকে মেনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া)।

খেলাফত কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়, তিনি হচ্ছেন খলীফা। এর সমার্থক শব্দ, ইমাম অথবা আমীর। সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, খলীফা নির্বাচন করে নেওয়া জাতির জন্য ওয়াজিব। নির্বাচিত খলীফা রাষ্ট্রের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণসহ মানুষের মধ্যে ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন, ন্যায়ভিত্তিক ইসলামের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণ, রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমা নির্ধারণ, দেশের সীমাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কাজ করবে।

কুরআন, হাদীস এবং ইজমা (যে কোনো যুগের সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত)—ইসলামের আইনের এসব মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিটি মুসলমানের জন্য খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজিব এবং তারপর তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।^{১৫৮}

এবং আল্লাহ বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি,
অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর
এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে
কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে
যায়।^{১৫৯}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে নিম্নোক্ত
হাদীসটি উল্লেখ করা হয়,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ
مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে
মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিন দলিল বিহীন অবস্থায়
আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল
আর তার ঘাড়ে বাইআত-আনুগত্যের কোনো শিকল নেই
তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।^{১৬০}

সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম একজন খলীফা নির্বাচন করাকে এত
বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের দাফন-কাফনের উপর খলীফা নির্বাচনকে অগ্রাধিকার

^{১৫৯} সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৬।

^{১৬০} সহীহ, মুসলিম (৩/১৪৭৮) (১৮৫১)

দিয়ে বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে জমায়েত হয়েছিলেন। যদি খলীফা নির্বাচনে এত দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন না হতো, তাহলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হয়তো তার প্রার্থীতা গ্রহণ করতেন না। তিনি একটি কারণেই তা গ্রহণ করেছিলেন। আর তা এই যে, তখন যদি দ্রুত একজনকে খলীফা নির্বাচন করা না হতো, তাহলে চারিদিকে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি, অসন্তোষ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। এসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেলাম খলীফা নির্বাচন করে নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। মূলত এ বিষয়ে দেরী করা তাদের জন্য জায়েযও ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এ ইজমার কারণে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মুসলমানদের অবশ্যই একজন নেতা থাকতে হবে।^{১৬১}

আল্লাম আবুল হাসান আন-নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম জাতির খলীফা পদে প্রার্থী নির্বাচনে কিছু শর্তের কথা আলোচনা করেছেন। এসব শর্তসমূহ তালিকাবদ্ধ করার পর আবুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসকল শর্তসমূহের সবগুলোই পূরণ করেন। এসব শর্তসমূহ বিস্তারিত আলোচনা না করে আমি এখানে কিছু গুণের কথা উল্লেখ করব যে কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা হয়। একই সাথে তিনি যে সবচেয়ে যোগ্যতম প্রার্থী ছিলেন, তারও কিছু কারণ উল্লেখ করা হবে।

- ইসলাম কবুল করার দিন থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ এবং অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আর এর স্বাক্ষর তিনি বার বার দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমুন্নত ঈমান এবং চারিত্রিক

^{১৬১} আল-মিলাল ওয়ান-নাহাল, আশ-শাহরাস্টানী (৭/৮৩); নিযাম আল-ইকুম, মাহমুদ আল-খালিদী (পৃ. ২৩৭-২৪৮)।

উৎকর্ষতার স্বাক্ষর দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তিম পীড়াকালে নিজে ইমামতি করতে সমর্থ না হওয়ায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযে ইমামতি করতে বলেন। সব সাহাবী জানতেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মবিশ্বাস এত বেশি ছিল যে তাদের অন্য কিছু করার সুযোগ ছিল না।

- দীর্ঘদিন যাবৎ অনবরত কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি কেবল ভালো সময়েই ভালো মুসলমান ছিলেন না, ইসলামের কঠিনতম সময়েও তিনি একই ঈমানে বলীয়ান ছিলেন। সেসব কঠিন সময়ে অনেক বিশ্বাসীর অন্তর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ নেই।
- সন্দেহাতীতভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সাহাবীদের থেকে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। সমরে ও শান্তিতে, দেশে-বিদেশে, বিপদ-আপদে, সহজ ও কঠিনতম পরিবেশ তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছেন। এ দীর্ঘ সোহবতে তিনি প্রতি মুহূর্তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিখতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতেন।
- যেখানে অন্যরা নিজেদের সম্মান এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের উন্নতি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। যখন ইসলাম এবং মুসলমান বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তখন তিনি কোনো কিছুর পরোয়া না করে তার নিরাপত্তায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে পেশ করেছেন। তিনি দুনিয়ার বুকে ইসলামের মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো হুমকিকে ভয় করেননি এবং নিকটাত্মীয়দের চিন্তায় পিছপা হননি।
- এটা পরিষ্কার যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেশ শাসনের জন্য স্বপ্রণোদিত নতুন কোনো আইন প্রয়োগ করতে চাননি। বরং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবিকল

অনুসরণ ও অনুকরণ করে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। প্রতি পদে পদে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, আমল এবং বিচার ব্যবস্থাকেই প্রয়োগ করেছেন। মোটকথা, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত থেকে এক চুলও এদিক-সেদিক করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে তিনি একইরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন; উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা এবং ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

সম্ভবত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে চরম দুনিয়াবিমুখতা। এটা এমন পর্যায়ে ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি। দুনিয়ার সুখ বা প্রাপ্তির প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি ক্ষমতার জন্যও উৎসাহী ছিলেন না। নিজে কোনো রাজত্ব কায়েম করবেন, এমন কোনো আশাও ছিল না। তিনি কেবল তার জীবনের যে কাজ সেটা পরিপূর্ণভাবে করতে চেয়েছেন; প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি কথায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর ইবাদত করা। ঐসময় যারা রাজ্য শাসন করতেন, তারা এমন এক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতেন যাতে রাজা এবং তার পরিবার আরও অধিক অর্থ-বিলুপ্ত এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে। আরব উপত্যকায় রোম, পার্সিয়া এবং আশেপাশের দেশগুলোতে এরকমই হতো। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরাধীকারী হিসেবে নিজের ছেলেকে না দিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনীত করে গেছেন। তিনি শুধু ইসলামের ব্যাপ্তিকে বাড়াতে চেয়েছেন। নিজের অথবা পরিবারের বৈষয়িক উন্নতির দিকে না তাকিয়ে ইসলাম এবং সকল মুসলমানের সামগ্রিক উন্নতি চেয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতোই তিনি একজন নিঃস্বার্থ নেতা ছিলেন, যিনি সত্যিকার অর্থেই তার অনুগতদের প্রতি খুব দরদী ছিলেন।^{১৬২}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে এসব উন্নত গুণাবলী থাকায় তার খেলাফতের ব্যাপারে বুন সাঈদা গোত্রের চতুরে সমবেত লোকজনকে সম্মত করাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। পরে সাধারণের সামনে যখন খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রার্থীতা ঘোষণা করা হলো, নির্বাচিত করল, তখন সবাই তার প্রার্থীতাকে সম্মত জানিয়েছে এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে।^{১৬৩}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বুন সাঈদা গোত্রের চতুরে মুসলমানরা একজন খলীফা হওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ এবং নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে, এ ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিছু নীতি নিচে উল্লেখ করা হলো।

- ✓ খলীফা-নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকতে হবে
- ✓ এ পদ্ধতির একটি হবে বাইআত গ্রহণ অথবা শপথ অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে সবাই তার আনুগত্য প্রকাশ করবে।
- ✓ যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করবে; যার মধ্যে দৃঢ় ঈমান এবং রাষ্ট্রের বিষয়াদি ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য রয়েছে, তিনিই অধিক যোগ্য।
- ✓ খলীফা নির্বাচনে স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান নেই। খেলাফতের জন্য (রাজত্বের বিপরীত) কেউ পারিবারিক ঐশ্বর্যের কারণে যোগ্য হয়ে ওঠে না।
- ✓ খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় লোকজনকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে যেন তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম করে।

✓ যদিও নির্বাচনের বৈঠকে অনেক নেতার যোগ্যতা ও গুণাবলী নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু একজনকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারস্থ হতে হবে। এটা সত্য যে, আনসাররা তাদের একজনকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যুক্তি পেশ করলেও যখন তাদের সামনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রার্থীতার নির্ভরযোগ্য হাদীস পেশ করা হয়েছে, তখন সবাই তারা তাকে মেনে নিয়েছে এবং তার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছে।

✓ পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই একজন খলীফাকে নির্বাচিত করতে হবে। এটা কুরআন মাজীদে আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূলের কর্মপদ্ধতিতে তা প্রকাশ পেয়েছে এবং বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে সাহাবীগণ সেটা অনুসরণ করেছেন।

বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হওয়ার মধ্য দিয়ে তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়নি এবং পরদিন যখন সকল সাধারণ মানুষ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিল, তখনো এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়নি। মূলত, এ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছিল যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা পদে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং লোকজনের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করার সময় কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।



দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ

এক। সাধারণ জনগণের বাইআত গ্রহণ

বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে গণজমায়েতে খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচিত হওয়া এবং উপস্থিত সকলের বাইআত গ্রহণ ছিল একটি গোপনীয় ব্যাপার। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা হিসেবে নিয়োগকে আরও নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। এজন্য পরের দিন সাধারণ মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্যের শপথ করার জন্য একত্রিত হয়।^{১৬৪}

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, বনু সাঈদা গোত্রের চত্বরে গণজমায়েতের পরদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসিজদের মিম্বরের নিচে বসেছিলেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে মহান আল্লাহ তা‘আলার গৌরব বর্ণনা করে কথা শুরু করলেন। তারপর বললেন, ‘হে লোকসকল, গতকাল আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলেছি যেগুলো আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যাবে না। এমনকি সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{১৬৪} আসর আল-খুলাফা আর-রাশিদীন, ড. ফাখিয়াহ আন-নিবরাউই, পৃ. ৩০।

ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ওয়াদাও করে যাননি (সম্ভবত তিনি গতকাল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাননি বলেছিলেন, সেদিকে ইশারা করেছেন)। আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তেকাল করবেন। তবে মুহাম্মাদ যদিও ইন্তেকাল করেছেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার সঙ্গী এবং দু-জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা ওঠ এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ কর।'

অতঃপর তার কাছে লোকেরা সাধারণ বাইআত গ্রহণ করল যেমন করে আগের দিন কিছু মুসলমান বাইআত গ্রহণ করেছিল।

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন যা মুসলিম জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণ হিসেবে প্রসিদ্ধ। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো তিনিও আল্লাহর প্রশংসা করে কথা শুরু করেন। তারপর বলেন,

হে লোকসকল, আমি আপনাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং যদি আমি অন্যায় কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। স্মরণ রাখবেন, সততা আমানত আর মিথ্যা খেয়ানত। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার অধিকার আদায় করে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে শক্তিমান ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে আমি হকদারের অধিকার ফিরিয়ে এনে দিতে পারি।

যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক হয় সে জাতির উপর আল্লাহ ব্যাপকভাবে বালা মুসীবত নাযিল করেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করতে আপনারা বাধ্য নন। আচ্ছা, এখন সবাই নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের প্রতি সদয় হোন।^{১৬৫}

যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলছেন, মিস্বরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলাতে অবশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিস্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বাইআত গ্রহণ করল।^{১৬৬}

সংক্ষেপে বলা যায়, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নীতিনির্ধারণী ভাষণটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। এ ভাষণটি লিখতে গেলে এক অনুচ্ছেদও হবে না, অথচ এর মধ্য দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি শাসক এবং দেশের নাগরিকদের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি এটাও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উল্লেখ করেছেন যে, শাসকের প্রতি জনগণের আস্থা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ শাসক আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অনুগত থাকে। তদুপরি তিনি আরও দু-টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন; একটি হচ্ছে, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং আরেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়, সামাজিক ব্যবহার। তিনি জনগণের সামনে এটা

^{১৬৫} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩০৫, ৩০৬). এ হাদীসের বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য।

^{১৬৬} বুখারী (৭২১৯)

পরিকারভাবে তুলে ধরেন যে, তারা যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে এবং জিহাদ করতে হবে। আর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে লোকদেরকে অন্যায় এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এসবের ব্যাপক বিস্তৃতি সমাজের জন্য ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনে যা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বক্তব্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রাথমিক দিনগুলো এবং তার দেশ শাসনের কিছু মূলনীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপলব্ধি করা যায়।

১। আনুগত্যের শপথ বা বাইআত-এর তাৎপর্য

কখনো কখনো কারও প্রতি আনুগত্যের শপথকে বোঝানোর জন্য বাইআত শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এখানে বাইআত^{১৬৭}-এর অর্থ হচ্ছে আনুগত্য: ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সাথে সন্ধি অথবা বন্ধন। ‘বাইআত’ শব্দের অর্থ হিসেবে ‘আনুগত্য’ শব্দটি নিতান্তভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নতুবা এ শব্দের ব্যাপকতা ভিন্ন ভাষায় কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে বোঝানো কঠিন। এজন্য এ শব্দটি ইসলামের পরিভাষা হিসেবে মূল নামেই ব্যবহার করা উত্তম। তারপরেও আমরা বাইআত সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তার উপর কিছু আলোকপাত করব। ইবনে খুলদুন বাইআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘কারও অধীনতাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটি আইনসম্মত চুক্তিপত্র।’^{১৬৮} অন্যরা বলেছেন, ‘ইসলামের শিক্ষাকে প্রয়োগ করার জন্য বাইআত হচ্ছে

^{১৬৭} বাইআত শব্দটি আরবিতে بَيْع - عَهْد থেকে নির্গত। এর অর্থ বিক্রয় করা। কারও বাইআত গ্রহণ করার অর্থ তার হাতে নিজের ইচ্ছাকে বিক্রয় করা এবং তার হাতে আনুগত্যের শপথ করা।

^{১৬৮} আল-মুকাদিমাহ, পৃ. ২০৯।

একটি শপথ।’ যখন মুসলমানরা তাদের নেতার কাছে বাইআত হয়, তখন তারা তাদের হাত নেতার হাতের উপর রাখে যা শপথকে আরও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে এবং মেনে চলার অঙ্গিকারকে নিশ্চিত করে। এইভাবে হাত মেলানোটা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর তারা যেভাবে হাত মেলায় সেটাকে উপস্থাপন করে; এটা শর্তসাপেক্ষে পারস্পরিক সম্মতি প্রকাশ করে যার অপর নাম বাইআত। ঘটনাক্রমে এ কারণেই আনুগত্যের শপথকে বাইআত বলা হয়, আরবীতে বিক্রি করা অর্থাৎ ‘বাই’ শব্দ থেকে এটা উদ্ভূত হয়েছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা হিসেবে নিয়োগের এই প্রক্রিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকেরা তাদের নেতা হিসেবে কাউকে পছন্দ করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে, তবে সাধারণ জনগণের উচিত ঐ নেতাকে সমর্থন করা এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তাদেরকে প্রতিহত করা। তারা এ কাজ মুসলিম জাতির ঐক্য বজায় রাখা এবং দৃঢ়ভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যই করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ের আনুগত্যের কোনো শিকল নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।^{১৬৯}

এই হাদীসে মুসলিম জাতির নির্বাচিত খলীফার কাছে যদি কেউ আনুগত্যের শপথ করা থেকে বিরত থাকে, তবে তার জন্য কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। যে বিরত থাকল, সে পথভ্রষ্ট এবং যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে পথভ্রষ্টতার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করল।

একজন নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হওয়া ইসলামে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি কেউ নির্বাচিত খলীফা অথবা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অথবা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চক্রান্ত করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলার হুকুম রয়েছে। এ ধরনের হীন চেষ্টা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন বিশৃঙ্খল ও অরাজকতা তৈরী হয় যাতে বহু রক্তপাত সংঘটিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعه مَا
اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَأُضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخِرِ

আর যে ব্যক্তি কোনো ইমাম (বা নেতা)-এর হাতে বাইআত হয়—আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তার হাতে হাত দিয়ে এবং অন্তরে সে ইচ্ছা পোষণ করে তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তীজনের গর্দান উড়িয়ে দেবে।

দেশের রাজধানীতে যারা বসবাস করে, তারা সরাসরি খলীফার হাতে বাইআত হবে। আর যারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বা অন্যান্য শহরে বসবাস করে, তাহলে তারা খলীফা নিযুক্ত আমীরের কাছে বাইআত গ্রহণ করবে। এ আদেশ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের যুগ থেকেই প্রচলিত হয়েছে। মদীনার অধিবাসীরা তার হাতেই বাইআত গ্রহণ করেছে। আর মক্কা এবং তায়েফবাসীরা তার নিযুক্ত গভর্নরদের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে।

সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য খলীফার হাতে সরাসরি বাইআত গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর সাধারণ লোকদের জন্য খলীফার নিযুক্ত গভর্নর, সমাজ অধিপতি, নেতা বা প্রতিনিধির হাতে বাইআত গ্রহণ করাই যথেষ্ট। অবশ্য সমাজের নেতা বা জ্ঞানী ব্যক্তির খলীফার কোনো প্রতিনিধির কাছে বাইআত গ্রহণ করে, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য, অনেক উলামায়ে

কেরামের মতে রাষ্ট্রের সকলকে খলীফার হাতেই বাইআত গ্রহণ করতে হবে, অন্য কারও কাছে বাইআত হলে হবে না। এ দলের উলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, এটাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

প্রকৃত অর্থে বাইআত শুধু মুসলিম জাতির রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই প্রযোজ্য হবে। পৃথিবীতে মুসলিম দেশ থাকুক অথবা না থাকুক, অন্য কারও কাছে এ বাইআত প্রযোজ্য হবে না। কারণ এ বাইআতের মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে, এটা মূল্যহীন।

সংক্ষেপে বাইআত বলতে এমন একজন খলীফার প্রতি আনুগত্যকে বোঝায় যে খলীফা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। মূলত, বাইআত দু-পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি: খলীফা এবং দেশের জনগণ। যখন এ দু-পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হবে, তখন খলীফা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং ইসলামের বিধানের প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিষ্ঠাবান থাকবে। ইসলামের বিধানের মধ্যে ব্যক্তির ঈমান, আইন-কানুন এবং জীবন ব্যবস্থা সবই অন্তর্ভুক্ত। আর দেশের জনগণ ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফার প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে।

সুতরাং বাইআত শব্দটির ব্যবহার ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সাথেই সংশ্লিষ্ট। খলীফা এবং দেশের জনগণ বাইআতের মাধ্যমে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কোনো পক্ষেরই ইসলামের আইনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে, তাহলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর এর ফলে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং তার পরিণতি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوْا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।^{১৭০}

২। আবু বকর রা.-এর খেলাফতের সময় প্রণীত আইনসমূহের উৎস

খলীফা হওয়ার পর প্রথম ভাষণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি যে পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতে থাকি, সে পর্যন্ত তোমরাও আমার আনুগত্যে থেক। আর যখনই আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে বিন্দুমাত্র মুখ ফিরিয়ে নেই, তখনই তোমরা আমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও।’ তিনি তার এ বক্তব্যে যেমন বলেছেন, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই নীতির উপর অটল ছিলেন। তার সময়ে প্রণীত আইনসমূহের উৎসের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

ক। পবিত্র কুরআন মাজীদ

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا^{৪:১০৫}

নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যার প্রতি

আল্লাহ আপনাকে দিক নির্দেশ করেন। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।^{১৭১}

জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্য এটাই প্রাথমিক উৎস।

খ। রাসূল সা.-এর সুন্নাত

ইসলামী বিধি-বিধানের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। সুন্নাতের মধ্যেই একজন কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিধান সমূহের বাস্তবভিত্তিক আমল হৃদয়াঙ্গম করতে পারে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যদি কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যেত, তাহলে এ বিষয়ে অন্য সব মতবাদ এবং থিওরীকে বাদ দেওয়া হতো। এ থেকে অনুমেয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনোভাবেই পার্থিব বা মানুষের তৈরি কোনো আইন অনুসৃত হতে পারে না। বরং এটা এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান অনুযায়ী যাবতীয় আইন-কানুন প্রয়োগ করা হয়। যে কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন, তার জন্য এ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তিনি নতুন কোনো আইন উদ্ভাবন করবেন না, বরং তার কাজ হচ্ছে ইসলামী আইনগুলোকেই বাস্তবায়ন করা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহাবীদের যুগে ইসলামের বিধানই কার্যকর ছিল এবং কেউই এ আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না—শাসকও না, জনগণও না। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবেন, সে পর্যন্ত তিনি জনগণের আনুগত্য পাওয়ার দাবী রাখেন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

‘আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনোরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে।’^{১৭২}

৩। দেশের নাগরিক কর্তৃক খলীফাকে পর্যবেক্ষণ এবং তার কাজ-কর্মে জবাবদিহিতা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং যদি আমি অন্যায় কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন।’ এখানে তিনি স্পষ্টতই খলীফার কাজ-কর্মে প্রতিটি নাগরিকের জবাবদিহিতা চাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছেন। তারা অবশ্যই খলীফাকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভালো কাজ করতে বাধ্য করবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যের শুরুতেই শাসকদের পতনের কারণ বর্ণনা করেছেন। তার খেলাফতের যুগ থেকেই তিনি একটি বিষয় পরস্কার করে দিয়েছেন যে, যেহেতু ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র নবীর যুগ শেষ এবং ওহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কোনো নেতাই ভুলের উর্ধ্বে নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের উপর যে শাসন ক্ষমতা পেয়েছিলেন, তা ছিল আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে এবং ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারপরে যে কেউ আসবে, সে তার বিচার-বিশ্লেষণে ভুল করতেই পারে। এজন্যই তার জন্য কুরআন-সুন্নাহকে পদে পদে অনুসরণ করা উচিত।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ চিন্তাই ছিল যে, দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই জাতীয় উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, খলীফাকে সহযোগিতা করা, তাকে উপদেশ দেওয়া, তার কাজ-কর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার ভুল শুধরিয়ে দেওয়া। তাদেরকে এ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, যদি খলীফা তাদেরকে অস্ত্র হাতে নিতে বলে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জিহাদ করতে বলে, তাহলে তাতে তারা সহযোগিতা করবে কিনা। যতদিন পর্যন্ত তাদের নেতা ইসলামী আইন মেনে চলবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকেরই

দায়িত্ব, খলীফাকে সম্মান করা। আর খলীফাকে সম্মান করার মধ্য দিয়ে তারা আসলে ইসলাম ধর্মকেই সম্মান করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ
غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

অবশ্যই আল্লাহর গৌরব বর্ণনার দাবী এই যে, বয়স্কদের সম্মান করা, কুরআনের বাহককে সম্মান করা, যারা এর শিক্ষাকে অনুসরণ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে না এবং মুসলমানদের নেতাদের সম্মান করা।

আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা।

এ কথাটাকে তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, কিসের প্রতি কল্যাণকামিতা?’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

আল্লাহর প্রতি, তার কিতাবের প্রতি, তার রাসূলের প্রতি, মুসলমানদের ইমামের প্রতি এবং দেশের সাধারণ জনগণের প্রতি।

এ হাদীসে উল্লেখিত সবার জন্যই আনুগত্যের ভিন্ন অর্থ প্রযোজ্য; এখানে আলোচ্য বিষয় হলো, মুসলিম জাতির ইমামের প্রতি আনুগত্য যার অর্থ হচ্ছে, তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা, তাদের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ থাকা, ভুল চিহ্নিত করা এবং সম্মানজনক পদ্ধতিতে তা শুধরে দেওয়া। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

আনহু তার ভাষণে আরও অনেক কথা বলেছেন যে, একটি জাতির মর্যাদা তার নেতাদের মর্যাদার উপর নির্ভর করে। এজন্য দেশের সাধারণ জনগণ এবং শাসকদের মধ্যে অনেক বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এ এই আকুতিতে সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই সাড়া দিয়েছিলেন। তারা তাকে সঠিক উপদেশ এবং নির্ভুল তথ্য দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ-কর্ম সহজে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমরা এখন যে যুগে বসবাস করছি, সেখানে অনেক মুসলিম দেশে নেতাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। বাহ্যত শাসক এবং জনগণের মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন নেই। বরং সাধারণ জনগণ শাসকদের নির্ধূর একনায়কতন্ত্র এবং অমানবিক নীতির স্বীকার হচ্ছে। আর ব্যক্তি তার নেতাকে সদুপদেশ এবং সহায়তা দেওয়ার পরিবর্তে শাসক শ্রেণী থেকে আলাদা থাকতেই পছন্দ করে এবং কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যদি না আবার সেটা শাসকশ্রেণী কর্তৃক রাজনীতি হিসেবে গণ্য হয়ে যুলুমের স্বীকার হতে হয়। এটা কেবলমাত্র নেতাদের দোষ কিনা অথবা নেতা ও জনগণ উভয়েই দায়ী, এ ব্যাপারে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। যখন এরকম আলোচনার সুযোগ থাকবে, তখনই কেবল বিজয় আশা করা যায়। আর নেতাকে অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে। তখন জনগণ প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াবে এবং ভুল হয়ে গেলে তা শুধরে দিবে। এসব নীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমেই একটি জাতি বিশ্বের মধ্যে উন্নত এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

৪। দেশের সকল নাগরিকদের মধ্যে ন্যায় বিচার এবং সম অধিকার প্রতিষ্ঠা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ইনশাআল্লাহ, আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার অধিকার আদায় করে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে শক্তিমান

ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে আমি হকদারের অধিকার ফিরিয়ে এনে দিতে পারি।”^{১৭৩} একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিগুলোর মধ্যে দু-টি অন্যতম ভিত্তি হলো, সবার জন্য ন্যায় বিচার এবং সম অধিকার। মূলত, যে দেশের জনগণ এ দু-টি থেকে বঞ্চিত, যদিও তাতে মুসলিম জনবসতি থাকে, তবু সেটা অদৌ মুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে না।

সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা কোনো নেতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় যে, সে তার মনমতো যখন খুশি তা প্রয়োগ করবে, বরং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামীক দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যকীয় কর্তব্য। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেছেন যে, একজন শাসকের জন্য তার খেলাফতের সময় দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব।^{১৭৪}

কুরআন মাজীদে আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এটা পরিস্কার যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবীতে ন্যায় বিচার এবং প্রতিটি মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সত্যিকার মুসলিম রাষ্ট্র দেশ থেকে সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। এ ধরনের রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকবে দেশের সব জনগণ - ধনী বা গরিব, নারী-পুরুষ, সাদা অথবা কাল, যুবক অথবা বৃদ্ধ, সবাই তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং দাবী কোনো ধরনের টাকা ব্যয় বা অবৈধ শক্তি ব্যবহার ছাড়াই প্রকাশ এবং আদায় করতে পারবে।

ইসলামে একজন নেতা তার অধীনস্থদের মধ্যে যারা বিচারের জন্য আসবে অথবা আনা হবে, তাদের সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা না করেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে। ব্যক্তির মর্যাদা, ভাষা, জাতীয়তা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা চিন্তা না করে সত্যের উপর ভিত্তি

^{১৭৩} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩০৫)।

^{১৭৪} তাফসীর আর-রাযি (১০/১৪১)।

করে মুসলিম নেতা বা বিচারক ন্যায় বিচার কায়েম করবে। একজন মুসলিম বিচারকের কাছে বন্ধু অথবা শত্রু, ধনী অথবা গরিব, জমিদার বা দিনমজুর - যেই আসুক না কেন, এটা কোনো বিষয় হিসেবে গণ্য হবে না। তিনি কেবল যা সত্য, তার উপর ভিত্তি করেই বিচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না। সুবিচার কর—এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।^{১৭৫}

সৎগুণ এবং স্বচ্ছতার মূর্ত প্রতীক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের অন্তর জয় করে ফেললেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতাকে দায়িত্ব হিসেবেই কেবল পালন করেননি, বরং এর মাধ্যমে তিনি ইসলামের শান্তির বাণীকে বাস্তব আমলের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। যদি সরকারি কোষাগারে কোনো মাল জমা হতো, তিনি তা মানুষের মধ্যে পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে বণ্টন করে দিতেন। তিনি নিজেকেও একজন সাধারণ মুসলিমদের কাতারে সামিল করে নিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন জুমু'আর খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, 'আগামীকাল সকালে সবাই দানের জন্য উট নিয়ে হাজির হবেন এবং তারপর সেগুলো উপযুক্ত প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু আমাদের সাথে (আস্তাবলে) অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন প্রবেশ না করে।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর

এ কথা শুনে এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, ‘এই নাও উটের লাগাম (যা দিয়ে উটকে নিয়ন্ত্রণ ও চালানো হয়)। আশা করা যায়, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে (আগামীকাল সকালে) একটি উট দিবেন।’

পরদিন সকালে লোকটি এল। সে এসে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে আস্তাবলে প্রবেশ করেছেন। সে কারও অনুমতি না নিয়েই সেখানে প্রবেশ করল। তাকে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘তুমি এখানে প্রবেশ করলে কেন?’ এই বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার হাত থেকে লাগামটা নিলেন এবং সেটা দিয়ে তাকে শাস্তি দিলেন। সবগুলো উট যখন বিতরণ শেষ হয়ে গেল, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকটিকে বললেন, ‘তুমি আমাকে এ লাগাম দিয়ে আঘাত কর যেমনটি আমি তোমাকে করেছি।’

জাতির নেতা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এটা জরুরী ছিল যে, উটগুলো যেন সুষ্ঠু এবং ন্যায্যভাবে বিতরণ করা হয়। এজন্য তিনি লোকজনকে তার সাথে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং যে কেউ তার এ আদেশ অমান্য করবে, তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার তার আছে। তথাপি তিনি যেহেতু আল্লাহকে খুব বেশি ভয় পেতেন, এজন্য এ শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন। তারপর তিনি লোকটির কাছ থেকেও উটের লাগাম দিয়ে একইরকম আঘাত আশা করেছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনভিপ্রেত প্রস্তাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিব্রতবোধ করলেন। তিনি বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর শপথ, সে আপনাকে শাস্তি ফিরিয়ে দিবে না। এটাকে আপনি সুন্নাত বানাবেন না (খলীফাকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার বিধান পরবর্তীদের জন্য নমুনা হয়ে যাবে)।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘তাহলে কে আমাকে কিয়ামতের দিন রক্ষা করবে?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এর পরিবর্তে তাকে খুশি করে দেন

(আপনাকে আঘাত করার পরিবর্তে তাকে এমন কিছু হাদিয়া দিয়ে দেন যাতে সে আপনার উপর খুশি হয়ে যায়)। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দাসকে ডাকলেন এবং লোকটিকে একটি উট, উটের লাগাম, কিছু মখমল কাপড় এবং পাঁচ দিনার দিতে বললেন। এসব পেয়ে লোকটি অবশ্যই খুব খুশি এবং সন্তুষ্ট হয়েছিল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাষণে সবার জন্য সম অধিকারের কথা বলেছিলেন, যা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।^{১৭৬}

ইসলামে সবাই সমান। রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, আরব-অনারব, সাদা-কাল সবাই এক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও সম অধিকারের এ শিক্ষাকে বাস্তবে আমল করে দেখিয়েছেন। তিনি তার ভাষণে এর ওয়াদাও করেছিলেন, ‘হে লোকসকল, আমি আপনাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং যদি আমি অন্যায় কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সঠিক পথে

ফিরিয়ে আনবেন। স্মরণ রাখবেন, সততা আমানত আর মিথ্যা খেয়ানত। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার অধিকার আদায় করে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে শক্তিমান ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে আমি হকদারের অধিকার ফিরিয়ে এনে দিতে পারি।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় তিনি দেশের জনগণের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদ বণ্টন করার বেলায়ও একই নীতি অনুসরণ করতেন। অবশ্য এ নীতিতে অনেক সাহাবী বিব্রতবোধ করেন। তারা মনে করতেন, সবাই একই হারে সম্পদ পাওয়া ঠিক নয়। যারা ইসলামের জন্য বেশি কুরবানী করেছেন, তাদের বেশি সম্পদ পাওয়া উচিত। ইবনে সা’দ ও অন্যরা বর্ণনা করেন, বাইতুল মালের অবস্থান ছিল আস-সুনহ এলাকায়। এখানেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বসবাস করতেন। বাইতুল মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো প্রহরী ছিল না। এজন্য কেউ কেউ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করত, ‘আপনি কেন বাইতুল মালের জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করেন না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিতেন যে, তার ভয়ের কোনো কারণ নেই এবং সব মালই নিরাপদে আছে। তাতে তালা আছে। তাছাড়া বাইতুল মালে আসলে কোনো সম্পদ থাকত না।

এজন্য তিনি এ কথা বলতেন। বাইতুল মাল খালি থাকার কারণ এই নয় যে, মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে খুব দুর্বল ছিলেন। বরং যেসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসত, সেগুলো বাইতুল মালে জমা হওয়ার আগেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব উপযুক্ত প্রাপকদের কাছে বণ্টন করে দিতেন। তিনি বেশি সময় ধরে মাল জমা করে রাখা পছন্দ করতেন না। অথচ এ সম্পদ অনেকের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় বসবাস শুরু করেন, তখন বাইতুল মালও তার সাথে মদীনায় স্থাপিত হয়। আসলে তার ঘরের একটি অংশই ছিল বাইতুল মালের জন্য বরাদ্দ।

একবার হুহাইনাহ এলাকার খনি থেকে আহরিত মালামাল তার নিকট আসে। এমনভাবে বনু খুলাইমের মধ্যে একটি খনি পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে প্রাপ্ত সাদাকাহ তিনি বাইতুল মালে রাখেন। স্বাধীন মানুষ, দাস-দাসী, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে সে সম্পদের একই সমান অংশ দান করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘খেলাফতের প্রথম বছর তিনি দশ দিরহাম করে প্রতিটি স্বাধীন ব্যক্তিকে বরাদ্দ দেন এবং দাস-দাসীকেও দশ দিরহাম প্রদান করেন। খেলাফতের দ্বিতীয় বছর (বাইতুল মালে প্রচুর মাল সমাগম হওয়ায়) প্রত্যেককে বিশ দিরহাম করে দেন।’

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সমবন্টন নীতিতে অনেকেই বিব্রত হতেন। তারা অভিযোগ জানাল, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, বাইতুল মাল বণ্টনে আপনি সবাইকে সমান শেয়ার দিচ্ছেন। যদিও লোকদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা বেশি মর্যাদার অধিকারী (কারণ দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন), অনেকে ভালো কাজে আগে বেড়ে আছে এবং অনেকে অন্যদের চেয়ে আগে ইসলাম কবুল করেছে। তাদেরকে কি একটু বেশি দেওয়া উচিত হবে না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘তুমি যেসব দলের লোকজনের কথা বলছ, আমি খুব ভালোভাবেই জানি তারা কি করেছে (ইসলামের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে)। কিন্তু তারা যা করেছে, তার ফলাফল তো আল্লাহর কাছ থেকেই পাবে। আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা। আমরা এখানে জীবিকা নিয়ে কাজ করছি (দুনিয়ার সামান্য সামগ্রী যা আমি লোকদের ভালো কাজের বিনিময় হিসেবে দিতে পারি না)। এজন্য স্বার্থপরতার চেয়ে কাজ করে জীবিকা অর্জন করা এবং অন্যের জন্য উৎসর্গ করে উদাহরণ সৃষ্টি করাই শ্রেয়।

যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সমবন্টনের নীতির সমালোচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন। তিনি একটু ক্ষোভের সাথেই বললেন, ‘আপনি কি তাহলে

তাদেরকেও সমানহারে দিবেন যারা উভয় হিজরত করেছে (প্রথমে আবিসিনিয়া, পরে মদীনা), যারা উভয় কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছে এবং যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছে?’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘তারা যা করেছে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছে। সুতরাং তারা আল্লাহ তা‘আলার কাছেই এর বদলা পাবে। এবং এ দুনিয়া তো আখেরাতে পৌঁছার একটি সিঁড়ি মাত্র।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এজন্য তিনি খলীফা হয়ে এ নীতির পরিবর্তন করেন। যারা ইসলামের প্রথম দিকে ঈমান এনেছেন এবং আগে রাসূলের পাশে থেকে লড়াই করেছেন, তিনি তাদেরকে বেশি অংশ দিতেন। এটা ছিল তার খেলাফতের শেষ সময়ের সিদ্ধান্ত। অবশ্য পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই নীতির জন্য আফসোস করতেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নীতিকেই ঠিক মনে করতেন। খেলাফতের একেবারে শেষ দিকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘যদি সবকিছু আবার শুরু থেকে করা সম্ভব হতো, তাহলে আমি বাইতুল মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সবাইকে সমানহারে দিতাম।’ এই স্বীকারোক্তি থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিনয় যেমন বোঝা যায়, তেমনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং উন্নত বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সরকারি মালের একাংশ যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য উট, ঘোড়া এবং অস্ত্র-সস্ত্র কেনার কাজে ব্যয় করতেন। একবার শীতের প্রকোপ খুব বেড়ে গেলে তিনি বিরাট অংকের টাকা খরচ করে শীতবস্ত্র ক্রয় করেন এবং সেগুলো মদীনার বিধবাদের মধ্যে বিলি করে দেন। তার দু-বছর ব্যাপী খেলাফতকালে মোট দুই লক্ষ দিরহাম সরকারি কোষাগারে জমা হয়। আর তিনি এগুলোর সবই ইসলামের কল্যাণে খরচ করে ফেলেছিলেন।

এটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল যে, সামগ্রিকভাবে ন্যায়বিচার এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই একটি দেশের নেতা এবং অধীনস্থদের জন্য সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন করা সম্ভব। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তার এই সঠিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষী হিসেবে কুরআন মাজীদে এই আয়াত উল্লেখ্য,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।^{১৭৭}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ন্যায়পরায়ণ শাসক হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই ব্যক্তিগত অভিলাষ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি নিজেকে জীবনের মূল প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। এ কারণেই তিনি অন্যের প্রয়োজনের দিকে তীব্র নজর রাখতেন। গরিবের দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং দুর্বলের অসহায়ত্ব—সবকিছুই তিনি দেখভালো করতেন। মোটকথা তিনি যদিও দেশের অধিকর্তা ছিলেন, কিন্তু নিজেকে চরম গরিব এবং অসহায়দের কাতারে সামিল করে নিয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাদের কষ্ট বুঝতেন। তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সবার জন্য ন্যায় বিচার করতেন। নিজের, ছেলে-মেয়েদের এবং পরিবারের আরাম-আয়েশের দিকে তিনি দেখেননি। তার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দেশের আপামর জনগণের বড় থেকে বড় এবং ছোট থেকে ছোট সমস্যা সমাধানের দিকে।^{১৭৮}

^{১৭৭} সূরা নাহল, ১৬:৯০।

^{১৭৮} আস-সিদ্দীক, হাইকাল বাসাহ, পৃ. ২২৪।

সত্যিকার অর্থে ন্যায় বিচার এবং সম-অধিকারের পতাকা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গরিব, দুঃখী, নিঃস্ব এবং অসহায়রা জানত যে তাদের অধিকার খর্ব করা হবে না। এজন্য সমাজের দুর্বলরা তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করে শক্তিশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং একইসাথে শক্তিশালীরা যারা অত্যাচারী ছিল, তাদের কাছ থেকে দুর্বলের হক আদায় করার ফলে তারা নিজেরাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সারাদেশে আইনের কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। সামাজিক মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ—কোনো কিছই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধা হতে পারেনি। ইবনে তাইয়িমা সত্যিই খুব সুন্দর বলেছেন, ‘আল্লাহ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী জাতিকে সাহায্য করেন যদিও সেটা বিধর্মী রাষ্ট্র হয়, আল্লাহ যুলুমকারী কোনো জাতিকে সাহায্য করেন না যদিও সেটা মুসলিম রাষ্ট্র হয়। ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে।’^{১৭৯}

৫। নেতা এবং তার অধীনস্থদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে সত্যবাদিতা

খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘স্মরণ রাখবেন, সত্যবাদিতা আমানত আর মিথ্যা খেয়ানত।’ এভাবে তিনি ঘোষণা দেন যে, রাজা এবং প্রজাদের মধ্যে সব সম্পর্ক এবং লেনদেনের ভিত্তি হতে হবে সত্যবাদিতা। এজন্য নেতাকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ‘হে মুমিনগণ তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।’^{১৮০} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এ

^{১৭৯} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩০৫)।

^{১৮০} সূরা তওবা ৯:১১৯।

ঘোষণা দিয়েছেন, এটা অবান্তর নয় যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شيخ زان وملك كذاب، وعائل

مستكبر

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী গরিব।^{১৮১}

ঘটনাক্রমে এই হাদীসে উল্লেখিত তিন ব্যক্তিরই অপরাধী হওয়ার সুযোগ কম ছিল। একজন যুবকের ব্যভিচারী হওয়া সঙ্গত কারণেই অপরাধ। কিন্তু একজন বৃদ্ধ যার যৌন চাহিদাই কম, তার জন্য ব্যভিচারী হওয়া আরও বেশি অপরাধ। বৃদ্ধের যৌন চাহিদা কম থাকার কারণে তার অসদুপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল না। একইভাবে একজন ধনী ব্যক্তির অহংকারী হওয়া অপরাধ। কিন্তু একজন গরিব লোকের অহংকারী হওয়া আরও বেশি অপরাধ। কারণ তার তো কোনো সম্পদ বা প্রতিপত্তি নেই যে কারণে সে অহংকার করতে পারে। তারও অহংকারী হওয়ার সুযোগ কম ছিল। সবশেষে একজন সাধারণ মানুষ মিথ্যাবাদী হলে সে অপরাধী। সাধারণত এ ধরনের লোক অবৈধ উপায়ে সম্পদ অথবা পদমর্যাদা লাভ করার জন্য মিথ্যা বলে। যদিও এ কারণে তার মিথ্যা বলা জায়েয হয়ে যায় না। অপরপক্ষে একজন রাজা যে প্রবল প্রতিপত্তি এবং অগাধ সম্পদের অধিকারী, তার তো মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্য সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন সেটা সাধারণ মানুষ থেকে বেশি অপরাধ হয়ে যায়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যে মিথ্যা বলাকে প্রতারণার শামিল বলেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা যখন এ ধরনের কথা বলেন, তখন এ কথায় মিথ্যা বলা মানে রাজনৈতিক প্রতারণাই বোঝায়। সংক্ষেপে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বোঝাতে চেয়েছেন যে, একজন মিথ্যাবাদী দেশের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তি়র আরও অর্থ রয়েছে। এ কথার মাধ্যমে তিনি শাসক এবং অধীনস্থদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। সাধারণ মুসলমানরা এ কথায় তার প্রতি আরও বিশ্বস্ত হবে এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপর নির্ভর করতে পারবে। এ ধরনের বিশ্বস্ততা, পারস্পরিক আস্থা বর্তমান সমাজে বিরল। এখন সবাই নেতাদের মিথ্যাচারণ দেখেই অভ্যস্থ।

৬। একটি বিপ্লবী ঘোষণা : রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়নি

খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাষণে বলেছেন, ‘যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন।’ এটা সত্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় মুসলমানরা পুরো আরব উপত্যকায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এর সাথে মুসলমানদের জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রু উভয়েই মুসলিম জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহিঃশত্রুর মধ্যে রোমান এবং পারস্য শাসকরা তাদের কাছে হঠাৎ ক্ষমতা লাভ করা মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। আর আভ্যন্তরীণ শত্রুদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে যাকাত দিতে অস্বীকার করছে। আবার তাদের মধ্যে অনেকে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করছে। এসব মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড নবীর মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক হচ্ছে চরম মিথ্যুক মুসাইলামা।

সামরিক যোগ্যতার বিচারে সবচেয়ে দক্ষ না হলেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো অংশে কম ছিলেন না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যই তার এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেরই অনুরণন :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ

যদি তোমরা ‘ঈনা’ তথা স্বর্ণ-রূপা বিক্রয়ে লিপ্ত হও, ঘাঁড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, তা দূর করবেন না যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে।^{১৮২}

হাদীসে যে চরম পরিণতির কথা বলা হয়েছে, এর প্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির শক্তি ও ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আপামর লোকজনও তার কথায় ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে। সবাই স্বেচ্ছায় দুর্বলকে রক্ষা করা, নির্যাতিতকে উদ্ধার এবং বিদেশের মাটিতে ইসলামকে প্রচার-প্রসারের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

৭। ব্যাভিচার এবং অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাষণে বলেছেন, ‘যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক হয় সে জাতির উপর আল্লাহ ব্যাপকভাবে বালা মুসীবত নাযিল করেন।’ তার বক্তব্যের অন্য সব উক্তির মতো এ কথারও ভিত্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। মনে হয় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলো বলার জন্যই মিসরে উঠেছিলেন।

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُغْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشًا فِيهِمُ
الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ
مَضَوْا...

ব্যভিচার যখন এমন পর্যায় পৌছবে যে, এটা প্রকাশ্যে ঘটতে থাকবে। তখন প্লেগ এবং এ জাতীয় রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিল না...।^{১৮৩}

সমাজকে ধ্বংস করার জন্য অশ্লীলতা এবং যেনার মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দায়ী। এটা এমন একটি রোগ যা সমাজের ভিত দুর্বল করে ফেলে এবং একসময় তা সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে, এটা মহামারী এবং অসুখ-বিসুখ ডেকে আনে। বর্তমানে আমরা যে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখছি, এটা তারই প্রভাব। এ ধরনের কঠিন ব্যাধি আগে ছিল না।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার জাতির জাগতিক উন্নতি আত্মিক উন্নতির উপরই নির্ভরশীল। তারপর তিনি একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যা আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই তার জীবদ্দশায় নিয়েছিলেন, তা হলো, সমাজের নৈতিক চরিত্রকে সমুন্নত রাখা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে একটি জাতি ব্যক্তিস্বার্থ এবং লোভ-লালসা নিয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। বরং একটি জাতি তখনই শক্তিশালী জাতিতে উন্নীত হতে পারে যখন তারা প্রগতিশীল এবং সমস্ত উন্নতির জন্য কল্যাণকামী হবে।

উন্নত মানসিকতা এবং ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী সভ্যতার মধ্যে গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যদি কোনো জাতি অন্যায় আচরণে

অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে যায়, তাহলে তারা জাতিকে ধ্বংসের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। অপরদিকে উন্নত মন-মানসিকতার চর্চাই জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়টি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্যই দাউদ আলাইহিস সালাম, যুলকারনাইন এবং এরকম আরও অনেক নেতা ও তার সমসাময়িক লোকেরা সৎ চরিত্র এবং ভালো আচরণের জন্য সভ্যতার উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। এরকম জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল যতক্ষণ তারা এসব মূল্যবোধকে আঁকড়ে ছিল। আর যখন তারা এসব ত্যাগ করে শয়তানের উপাসনা শুরু করেছে এবং আল্লাহর প্রতি নাফরমানি শুরু করেছে, তখনই তারা পরিণতিতে রোগ-বলাই, দুর্যোগ, মহামারি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। কোনো কোনো জাতি সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে কিছু অপরিবর্তনীয় নিয়ম-কানুন শিখিয়েছিলেন যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ জগতকে পরিচালনা করেন। এরকম একটি নীতির কথা ইতিমধ্যে আমরা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির জবানে শুনেছি। তা এই যে,

আল্লাহ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী জাতিকে সাহায্য করেন যদিও তা বিধর্মী রাষ্ট্র হয়, আল্লাহ যুলুমকারী কোনো জাতিকে সাহায্য করেন না যদিও সেটা মুসলিম রাষ্ট্র হয়। ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে।

আমরা এখানে যে বিষয়ে আলোচনা করছি, তা হলো, ভালো চরিত্র এবং আচরণ সমাজকে উন্নত করে এবং লোভ-লালসা ও অন্যায় সমাজে নানা রোগ-বলাই, প্লেগ, মহামারী এবং বিপর্যয় ডেকে আনে - এটি আরেকটি অপরিবর্তনীয় নীতি। এটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَاهُنَا تَذْمِيرًا

যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।^{১৮৪}

এখানে আয়াতের তরজমা সচরাচর যেভাবে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়, সেভাবেই করা হয়েছে। অন্য তিলাওয়াতে ‘আমারনা’ এর পরিবর্তে ‘আম্মারনা’ পড়া হয়। ‘আমারনা’ মানে সুনির্দিষ্ট আদেশ পাঠানো, আর ‘আম্মারনা’ মানে যখন তাদের ধনিক-বণিক শ্রেণিকে আমীর বানাই। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, ‘এবং যখন আমরা কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন ঐ জনপদের নেতাদেরকে দুনিয়ার সব বিভূ-বৈভবের অধিকারী করে দেই।’ ঘটনাক্রমে ‘তারায়ফ’ (এ শব্দটিই ভিন্ন আঙ্গিকে এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে) শব্দটির অর্থ ‘প্রচুর বিভূ-বৈভবের মালিক হওয়া’। এর আরেক অর্থ হচ্ছে সে সত্যের উপর নেই। এজন্য আরবীতে ‘ছারা’ (ধনাঢ্যতা) শব্দটির সব ব্যবহারের সাথে ‘তারায়ফ’ শব্দ সমার্থক নয়।

উন্নত সমাজ গঠনে যে কোনো বিজ্ঞ শাসকের আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। যে নেতা সমাজে অবাধে অশ্লীলতা হতে দেয়, বরং এটাকে সমর্থন করে এবং প্রচার-প্রসারে সহায়তা করে, সে সত্যিই মূর্খ। সে তার জাতিকে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেমনটি আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আশ্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।^{১৮৫}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার সময় প্রদত্ত ভাষণটির আরও বেশি আলোচনা করা প্রয়োজন। এটা এমন এক বক্তব্য যেখানে তিনি তার খেলাফতকালে যেসব নীতি অনুসরণ করবেন, তা তুলে ধরেছেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ঐসব নীতি বাস্তবায়নও করেছেন। এ বক্তব্যে তিনি একজন নেতা এবং তার অধীনস্থদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পারস্পরিক মূল্যবোধের কথা পরিকারভাবে তুলে ধরেছেন। সারকথা, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলেছেন যার মাধ্যমে একটি সমাজ সফল হতে পারে এবং একজন নেতা সফলভাবে বিশ্বের পুরো জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে। তদুপরি তিনি এটাও ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যে আদর্শ এবং নীতির উপর চলেছেন, তিনিও একই আদর্শ ও নীতি অব্যাহত রাখবেন। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তেকাল করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শ্রোতাদেরকে এটা জানিয়েছেন; কিন্তু তিনি অনুসরণের জন্য একটি ধর্ম এবং একটি কিতাব রেখে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করবে, ততদিন তারা সফল এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এটাই আসল বার্তা যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সাধারণ জনগণ খুব সহজেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে মেনে নিয়েছিল কারণ তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতিকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বক্তব্যের প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত মূল্যবান এবং

ঐতিহাসিকভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ‘কেউই সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির ইমাম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করবে।’

দুই। আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা

এটা জানা কথা যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নীতিসমূহ একা একাই বাস্তবায়ন করেননি, বরং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সাহায্য নিয়েছেন। আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ‘এ জাতির সবচেয়ে বিশ্বস্ত’ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ্য বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অবশ্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক সময় বিচারকার্য করতেন। আর যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অফিসিয়াল চিঠি-পত্র লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অবশ্য অন্যান্য সাহাবী যেমন আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুও অনেক সময় এসব চিঠি-পত্র খলীফার আদেশানুযায়ী লিখে দিতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানরা খলীফা হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ‘আল্লাহর রাসূলের খলীফা’ হিসেবে সম্বোধন করতেন। লোকজন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিঃসংকোচে শুধু বিশ্বাসই করতেন না, তাকেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এবং সব সময় তার সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশী ছিলেন। একটিই সমস্যা ছিল, তিনি তাদের জন্য সব সময় কাছাকাছি ছিলেন না। অন্তত খেলাফতের শুরুর দিকের দিনগুলোতে। তদুপরি, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন

ব্যবসায়ী ছিলেন। তাকে প্রায় প্রতিদিনই মার্কেটে যেতে হতো, তার পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে হতো।

বর্ণনায় এসেছে, খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিন পরেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখা গেল যে, কিছু কাপড় বিক্রি করার জন্য তিনি সেগুলো নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পথ রোধ করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘বাজারে।’ তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন যাচ্ছেন? আপনাকে পুরো মুসলিম জাতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে আমি কিভাবে আমার সংসার চালাব?’ তারা বললেন, ‘আপনি আমাদের সাথে চলুন। আমরা আপনার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দেব।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে গেলেন। তারপর এটা সাব্যস্ত হলে যে, তিনি প্রতিদিন একটি বকরির একটি অংশ পাবেন।^{১৮৬}

রিয়াদুন নাদরাহ কিতাবে অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, এই ভাতার পরিমাণ ছিল বছরে ২৫০ দিনার এবং ভেড়ার কিছু অংশ। বাইতুল মাল থেকে এ ভাতা প্রদান করা হবে। কিন্তু এ ভাতা তার এবং তার পরিবারের খরচ বহন করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য একবার না পেরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-বাকী বাজারে ব্যবসার জন্য গেলেন। এসময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইরে হাঁটার সময় এক দল মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি ব্যাপার?’ তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর রাসূলের খলীফার কাছে একটি বিচারের জন্য দেখা করতে এসেছি।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজে বের হলেন। তিনি তাকে বাজারে দেখে খুব অবাক এবং বিরক্ত হলেন।

^{১৮৬} রিয়াদুন নাদিরাহ ফী মানাকিবুদ আশরাহ, পৃ. ২৯১।

তিনি তার হাত ধরে বললেন, ‘আমার সাথে আসুন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘তোমার কাজের যিম্মাদার হয়ে আমার লাভ নেই। তুমি আমাকে যা বরাদ্দ দিয়েছ তা দিয়ে আমার এশ্বৎ আমার পরিবারের খরচ সামলানো সম্ভব হচ্ছে না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে আমরা আপনাকে আরও বাড়িয়ে দেব।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমাকে ৩০০ দিনার দিতে হবে এবং আস্ত একটি বকরিও দিতে হবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এত বেশি দিতে আমি রাজি না।’ এ আলোচনা শুনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এলেন। পুরো বিষয়টা শুনে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘তিনি যা চাচ্ছেন, তাকে পুরোটাই দিয়ে দিন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘তুমি কি সত্যিই চাচ্ছ যে, আমরা এরকম করি?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাতে রাজি হলেন এবং ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেল।^{১৮৭}

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে গেলেন এবং মিস্বরে আরোহণ করলেন। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন যেন লোকজন জমা হতে পারে। জমায়েত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ‘হে লোকসকল, পূর্বে আমার ভাতা নির্ধারিত ছিল বছরে ২৫০ দিনার এবং একটি বকরির কিছু অংশ যা বকরির পেট, মাথা এবং পায়ের দিক থেকে নেওয়া হতো। এখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার ভাতা বাড়িয়ে বছরে ৩০০ দিনার এবং একটি সম্পূর্ণ বকরি করতে রাজি হয়েছে। আপনারা কি এ ব্যাপারে রাজি আছেন?’ মুহাজিরীনরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা রাজি আছি।’

আসলে নতুন ভাতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধনী বানিয়ে দেয়নি। বরং কোনোমতে পরিবার চলত। সবচেয়ে বড় কথা হলো,

^{১৮৭} রিয়াদুন নাদিরাহ ফী মানাকিবুল আশরাহ, পৃ. ২৯১।

এখন তিনি খেলাফতের কাজে পুরো সময় দিতে পারবেন। সাহাবীরা তার পরিবারের অতীব প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে। সাহাবীরা তাকে যা দিয়েছে, তা দিয়ে কোনোমতে তার এবং তার পরিবার চলতে পারবে। আর এর বিনিময়ে সাহাবীরা আশা করেছে যে, এর বিনিময়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সব সময় এবং শক্তি মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করবেন। বাহ্যিকভাবে এটাকে অসম ব্যবস্থা বলে মনে হয়। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে কিছু মনে করলেন না। তিনি তার কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকেই আশা করেন।

বাইতুল মালের ব্যাপারে দেশের জনগণের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভালো বোঝাপড়া ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন জাতির নেতা, কিন্তু বাইতুল মালের উপর তার কোনো অধিকার ছিল না; কেবলমাত্র তার ভাতাটুকু ছাড়া। ইতিহাসের সব নেতা এবং রাজাই (পশ্চিম বিশ্বে সাম্প্রতিক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করত। কিং লুইয়াস ভি এ চিন্তা-চেতনাকে আরও বাড়িয়ে বলেন, ‘আমি মানে দেশ এবং দেশ মানেই আমি।’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ইনভেস্ট করে নিজে মুনাফা পকেটস্থ করেছেন। অপরদিকে তার দেশের জনগণ ছিল গরিব, চরম দারিদ্রতায় ক্লিষ্ট এবং পুষ্টিহীন। আজকের মুসলিম শাসকদের অবস্থা কিং লুইয়াস থেকে কোনো অংশে কম নয়। অনেক মুসলিম দেশের সম্পদ গুটিকয়েক নেতাদের হাতে এবং তারা সেগুলো তাদের ইচ্ছামতো খরচ করে। কেউ কেউ এত বেশি ধনী যে, সে নিজেও জানে না তার সম্পদের পরিমাণ কত! তার এজন্য খরচের কোনো হিসেব রাখে না। তাদের সম্পদের একটি বড় অংশ বিদেশের ব্যাংকে এমনি পড়ে আছে। এরকম নেতাদেরকে ধরার মতো কেউ নেই। তাদের সম্পদের হিসেব নেওয়ার কেউ নেই। মূলত তাদের সম্পদ নয়, দেশের সম্পদ। এদিকে সাধারণ জনগণ কোনোমতে দিনানিপাত করে বেঁচে আছে। এসব নেতাদের হুঁশ নেই যে, এত

বিশাল সম্পদ তাকে আখেরাতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে না। এমনকি দুনিয়াতেও এর পরিণাম ভোগ করতে হতে পারে। যেমনটি হয়েছিল ইরানের শাহদের বেলায়, দুনিয়ার বুকেও এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে তারা আশ্রয় পেতে পারে।

ভালো হতো যদি মুসলিম শাসকরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুসরণ করত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন নেতৃত্ব কোনো সুযোগ নয়, বরং দায়িত্ব। আবার খলীফা বেতন নিচ্ছে, কিন্তু তার পদমর্যদার জন্য নয়, বরং পুরোপুরি নিবেদিত অন্তঃকরণে জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য।

একটি নিরাপদ এবং উন্নত সমাজ গঠনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দিন-রাত পরিশ্রম করতেন। তার একটি উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের সব নাগরিকের মূল চাহিদা পূরণ করে আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলা। তিনি অনেক সময় ব্যয় করে তাদের মধ্যে বিরোধ মিমাংসা করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। দুর্বলের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছেন। নিচের বর্ণনা থেকে মানুষের জীবনের সামগ্রিক উন্নতিতে (জাগতিক এবং আত্মিক উভয় উন্নতি) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেষ্টার বিস্তারিত জানা যাবে।

১। আবু বকর রা. : সমাজের একজন আদর্শ ব্যক্তি

আল্লাহর রাসূলের খলীফা হিসেবে সমাজের সব মানুষ থেকে তার কাঁধে অনেক বেশি দায়িত্ব। এ চিন্তা মাথায় রেখে তিনি জীবন সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি শ্বাস তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আসলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সময়ের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে যে বোধে উন্নীত হয়েছিলেন, তা তিনি ভুলে যাননি। এমন কোনো সময় তিনি পার করেননি যখন তিনি কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হয় তিনি কাউকে দীন শেখাচ্ছেন, অথবা কাউকে ভালো কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন, অথবা কাউকে মন্দ কাজ থেকে ফেরাচ্ছেন, অথবা কোনো

না কোনোভাবে সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছেন। সমস্ত মুসলিম জাতির প্রতি মহান কর্তব্যের মধ্যেও তিনি ছোট থেকে ছোট কাজ করতেও পিছপা হতেন না। এ গুণই তাকে প্রথম খলীফার মর্যাদায় আসীন করেছিল। এখানে কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলো যা থেকে এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, একটি জাতির নেতা হওয়ার পরও তার প্রত্যাহিক জীবন-যাপনে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

ক। বকরীর দুধ দোহন করা, অন্ধ বৃদ্ধ মহিলাকে সাহায্য করা এবং উম্মে আইমান রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ

খলীফা হওয়ার আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এলাকায় বসবাসরত এক মহিলার বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। যখন লোকেরা মসজিদে নববীতে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিল, তখন সে এলাকায় এক মেয়ে বলে উঠল, ‘এখন থেকে তিনি আর কখনো আমাদের বকরীর দুধ দোহন করে দিবেন না।’ এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের বকরীর দুধ দোহন করে দেব। আশা করি আমার নতুন দায়িত্ব আমাকে বদলে দেবে না।’ খলীফা হওয়ার পরও ছয় মাস তিনি তার গ্রামে ছিলেন, ঐ মহিলার বকরীর দুধ দোহন করে দিচ্ছেন। অবশ্য পরে মদীনায়ে চলে আসার পর তিনি এ কাজ করতে পারেননি।

এ ঘটনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিনয় এবং নম্রতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, তার সমসাময়িক সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং পুরো জাতির নেতা হয়েও তিনি তার প্রত্যাহিক কর্মকাণ্ডে যেমন করে তিনি মানুষের খেদমত করতেন, তাতে কোনো পরিবর্তন হতে দেননি। তিনি মানুষের সাহায্য করা অব্যাহত রেখেছেন যদিও ঐ কাজ করতে গিয়ে তার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হতো; যে সময়ে তিনি রাষ্ট্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীরা ছোট ছোট নেকীর কাজ করার জন্য তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতেন। এ থেকে অন্যকে সাহায্য করা এবং সমাজের দুর্বল ও অসহায়দের যত্ন

নেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।^{১৮৮} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নেতৃত্বের বিশেষ যোগ্যতা এবং উন্নত চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে পুরো আরব উপত্যকায় শান্তি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ধর্মচ্যুতদের পরাজিত করে); যিনি সাহসী এবং বিনয়ী জেনারেল হিসেবে তার সময়কার দু-টি সুপারপাওয়ারের সাথে (রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য) যুদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু তিনি তাদের পরাজিত করেছিলেন। তারপরেও তিনি প্রতিবেশীর বকরীর দুধ দোহন করেছেন এবং বলতেন, ‘আশা করি আমার নতুন দায়িত্ব আমাকে বদলে দেবে না।’ তার নতুন দায়িত্ব, মনে রাখা দরকার, এটা কোনো সাধারণ দায়িত্ব ছিল না, তার দায়িত্ব ছিল সমস্ত আরব শাসন করা, পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এবং সবচেয়ে নিরাপদ, বিচার ব্যবস্থায় সবচেয়ে নিরপেক্ষ এবং দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে উন্নত সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তারপরেও তিনি একইরকম থাকতে পছন্দ করতেন এবং এতসব গুরুদায়িত্বের বোঝাও তাকে প্রতিবেশীর বকরীর দুধ দোহন করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।^{১৮৯}

খলীফা হওয়ার পরও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক একইরকম ছিল। সেটা হলো তার বিনয়। যদি তার উটের লাগাম হাত থেকে পড়ে যেত, তাহলে তিনি নিজেই নেমে সেটা উঠাতেন। যখন একবার এ ঘটনা হলো, তখন কেউ একজন তাকে বলল, ‘আপনি যদি আমাদেরকে হুকুম করতেন, তাহলে আমরা সেটা উঠিয়ে দিতাম (তাহলে আপনাকে কষ্ট করে উটের পিঠ থেকে নামতে হতো না)।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিয়েছেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করেছেন, কারও কাছে কোনো কিছু না চাইতে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বিনয়ের কথাই কুরআন মাজীদে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

^{১৮৮} তারিখুল ইসলামী (৮/১৯)।

^{১৮৯} আবু বকর আস-সিদ্দিক রা., তানতাবি, পৃ. ১৮৬।

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (এবং ডুবিয়ে দিলাম)। অতএব, দেখ (হে মুহাম্মাদ সা.), জালেমদের (পাপাচারী, কাফের এবং যারা আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী ছিল অথবা আল্লাহর রাসূল মূসা আলাইহিস সালামের উপদেশকে উপেক্ষা করেছিল) পরিণাম কি হয়েছে।^{১৯০}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, অহংকার নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটিও তাকে সব সময় বিনয় থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে,

مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا

عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

দান সম্পদকে কমায় না। যখন কোনো বান্দা কাউকে মাফ করে দেয়, আল্লাহ তার সম্মান এবং মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। আর যখন কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ আসীন করেন (পদে, মর্যাদায়, সম্মানে ইত্যাদি)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিনয় তাকে অন্য মুসলমানদের খেদমতে আরও বেশি নিয়োজিত করে দেয়; বিশেষ করে সমাজের দুর্বল এবং অসহায়দের। আবু সালেহ গিফারী বর্ণনা করেছেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার শহরের প্রান্তে একজন অন্ধ বৃদ্ধ মহিলার খেদমত করতেন। তিনি রাতে সেই মহিলার বাড়িতে যেতেন, তার জন্য পানীয় সরবরাহ করতেন

এবং তার বাড়ি-ঘর পরিকার-পরিচ্ছন্ন করে দিতেন। একদিন রাতে তিনি ঐ মহিলার বাড়িতে গিয়ে দেখেন এ কাজগুলো কেউ একজন ইতিমধ্যে করে দিয়ে গেছে। এটা তার জন্য খুব পেরেশানির কারণ হলো। তারপরে কয়েক রাত তিনি আরও আগে গিয়েও একইরকম পেলেন। রহস্যজনক প্রতিযোগীর কাছে এরকম হেরে গিয়ে তিনি মর্মান্বিত হলেন। যতই তিনি আগে যেতেন, তারপরেও দেরি হয়ে যেত। একবার তিনি অনেক আগে গিয়ে মহিলার বাড়ির এক কোণে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। তিনি দেখতে চাইলেন যে, কে এসে মহিলার কাজ করে। ধৈর্য সহকারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন অপেক্ষা করছেন, একটু পর তিনি দেখলেন একটি মূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য! এ তো আবু বকর যিনি তখন মুসলিম জাহানের খলীফা।^{১৯১}

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাবসানের পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।’ সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জান না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু-জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

^{১৯১} আবু বকর আস-সিদ্দীক, তানতাবি, পৃ. ২৯।

খ। কারও সাথে কথা বলবে না বলে যে নারী কসম খেয়েছে,
তার উদ্দেশ্যে আবু বকর রা.-এর উপদেশ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে জাহেলী যুগের কাজ-কর্ম থেকে ফিরে আসতে বলেছেন এবং বিদআত সৃষ্টি করতেও নিষেধ করেছেন। বিদআত হচ্ছে ধর্মে নতুন জিনিস যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে পাওয়া যায় না। তিনি মানুষকে সুন্নাতে অনুসরণে ঐকান্তিক হতে বলেছেন। কাইস ইবনে আবু হাযিম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহমাস গোত্রের যায়নাব নামের এক নারীর নিকট গেলেন। তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, নারীটি কথাবার্তা বলছে না। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞেস করলেন, নারীটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন? তারা তাঁকে জানালেন, এ নারী নিরবতার সাথে হজ পালনের মান্নত করেছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, ‘কথা বল, কেননা এটা হালাল নয়। এটা জাহিলীয়াত যুগের কাজ।’

তখন নারীটি কথাবার্তা বলল। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কে?’; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, ‘আমি একজন মুহাজির লোক।’ মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কোনো গোত্রের মুহাজির?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কুরাইশ গোত্রের।’ মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কুরাইশের কোন বংশের?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি তো অত্যাধিক প্রশ্নকারিণী। আমি আবু বকর। তখন মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, জাহেলী যুগের পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারব?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যতদিন তোমাদের ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের উপর অটল থাকবেন।’ মহিলা জিজ্ঞেস করল, ‘ইমামগণ কারা?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমাদের গোত্রে ও সমাজে এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক কি দেখনি যারা নির্দেশ দিলে সকলেই তা মেনে চলে।’ নারীটি উত্তর দিল,

হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এরাই হলেন জনগণের ইমাম।’^{১৯২}

কথা না বলার জন্য কসম খাওয়া একটি বিদআত এবং ইসলাম পূর্ব যুগের কুসংস্কার। খাতাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘জাহেলী যুগে ইবাদতের একটি পদ্ধতি ছিল, কথা না বলার জন্য কসম খাওয়া অথবা পছন্দ করা। তখন কেউ একজন দিন-রাত নিজেকে কোথাও আবদ্ধ রেখে (ইবাদতের জন্য) নিরবতা পালন করত।’^{১৯৩} সুতরাং তাদের নিষেধ করা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা দ্বারা কেউ কেউ এরূপ দলীল দিয়ে থাকেন, যে ব্যক্তি কথা না বলার ব্যাপারে কসম করেছে, তার জন্য মুস্তাহাব হলো কথা বলা এবং এরূপ কসমের কাফফারা দিতে হবে না। কারণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু ঐ মহিলাকে কাফফারা দিতে বলেননি। এ কথার পক্ষে যুক্তি এই যে, যদি কেউ মান্নত করে কথা বলবে না, তাহলে মান্নতই হবে না। কেননা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিঃশর্তভাবে বলেছেন, কথা না বলার নিয়ত বা মান্নত কোনোটাই হালাল নয়। এটা জাহেলী যুগের কাজ। ইসলাম এসব কুসংস্কারকে রহিত করেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেই বলেছেন, নিজ থেকে বলেননি। সুতরাং এটা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। ইমাম ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘যেসব হাদীসে নিরবতাকে (কথা কম বলার ব্যাপারে) উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, এর সাথে সেসব হাদীসের কোনো বিরোধ নেই...ইসলামে যে নিরবতাকে জায়েয বলা হয় তা মূলত মিথ্যা না বলে বেঁচে থাকা অথবা এমন সত্য কথা না বলা যা মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে যখন সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকে, তখন সত্য না বলা অপরাধ। এমনভাবে অনুপকারী সঠিক বক্তব্য থেকেও ফিরে থাকা উচিত নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।’^{১৯৪}

^{১৯২} সহীহ, বুখারী (৩৮৩৪)।

^{১৯৩} ফাতহুল বারী (৭/১৫০)।

^{১৯৪} প্রাগুক্ত (৭/১৫১)।

গ। ভালো কাজে উৎসাহ এবং শ্রম কাজে নিষেধ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা প্রত্যেকেই একেকজন মেসপালক এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ মেসের জন্য দায়িত্বশীল। একইভাবে একজন মানুষ তার পরিবারের সদস্যদের জন্য দায়িত্বশীল। তাদেরকে খাওয়ানো, নিরাপদ রাখা, কাপড় এবং আশ্রয় দেওয়া তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে, তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করা; ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং সব রকমের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। একজন মানুষের জন্য একই ছাদের নিচে বসবাসরত তার পরিবারের সামান্য কয়েকজন সদস্যদের উপর এসব দায়িত্ব পালন করা জরুরী। এখান থেকে ধারণা করা যায় যে, একটি পুরো জাতির নেতার উপর কি রকম দায়িত্ব বর্তায় এবং যার সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তার অধীনস্থ সকল মানুষ! এটা যেমন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সত্য, তেমনি আজকের যুগে যে কোনো নেতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্থক্য শুধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐকান্তিকভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই কোনো না কোনো সদস্যকে দীন শিক্ষা দিয়েছেন।

কিছু মুসলমান মনে করে যে, অন্যকে দীন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই। তারা মনে করে যে, এটা ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব। সে নিজ প্রয়োজনে ধর্মীয় বিধি-বিধান জেনে নিবে। এর জন্য কোনো উৎসাহ প্রদানেরও দরকার নেই। তারা ভুলের মধ্যে আছে। সম্ভবত এই আয়াতের অপব্যাখ্যাই তাদেরকে এ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আয়াতটি হলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।^{১৯৫}

একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, ‘হে লোকসকল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهِمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

যদি কেউ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখে কিন্তু সেটা পরিবর্তন করে দেয় না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করবেন।’

অন্য আরেক বর্ণনায় একই ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হে লোকসকল, তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত করেছ, কিন্তু ঠিকভাবে বুঝতে পারনি। তোমরা এর অর্থকে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করছ। তোমরা মনে করছ তোমাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার প্রয়োজন নেই। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا بِعَلْيَيْدِيهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْزِمَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

হে লোকসকল, যদি কেউ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখে কিন্তু তাকে ধরে না (মন্দ কাজ করতে তাকে বাধা দেয় না অথবা নিষেধ করে না), শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করবেন।

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলেন, আল্লাহ যে বলেছেন, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর, এ কথা দ্বারা এটা বাতিল হয়ে যায় না যে, প্রতিটি মুসলমানের উপরই ভালো কাজে আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তোমাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা যদি কর তাহলে অন্যের দুর্বলতার ব্যাপারে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। এটা আরেক আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।^{১৯৬}

মুসলমানদের যা করতে বলা হয়েছে, তাঁর মধ্যে একটি কাজ হলো, ভালো কাজে আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা। যদি কেউ এ আদেশ পালন করে এবং সে যদি অন্যকে দ্বীনের কথা বলার পরও তাঁতে সাড়া না পায়, তাহলে খারাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য সে দায়ী হবে না। কারণ সে তার (সত্য পৌছে দেওয়ার) দায়িত্ব পালন করেছে।^{১৯৭}

নিচের ঘটনাগুলো থেকে পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি সুযোগকেই অন্যকে দ্বীন শেখাতে চেষ্টা করেছেন, ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং মন্দকে প্রতিহত করেছেন। মাইমুন ইবনে মেহরান বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি এক দল লোকের মজলিসে এল। সে মজলিসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। কাউকে কিছু না বলে সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা।’ মজলিসে কেবল তাকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেওয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য বললেন, ‘মজলিসের অন্যদেরকে সালাম না দিয়ে শুধু আমাকে কেন দিলে?’

^{১৯৬} সূরা ফাতির, ৩৫:১৮।

^{১৯৭} উনুল মা'বুদ শারহ সুনান আবু দাউদ (১১/৩২৯)।

কখনো কখনো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো কথা না বলে কেবল তার কাজের মাধ্যমে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিষ্ক্রিয় থেকে কাউকে শিক্ষা দেননি। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি অনেক সময় সুনাত কাজ (ঐচ্ছিক আমল) ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ কেউ তাকে ঐ আমল করতে দেখলে ভাবতে পারে যে, সেটা করা ফরয। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, হুজাইফা ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন, তারা হজের সময় কুরবানী করা থেকে বিরত থাকতেন। পরবর্তীরা যেন এটাকে ফরয মনে না করে, সেজন্য এরকম করতেন।

একজন দীনদার পিতা সন্তানের জন্য যা করে, তিনিও তা-ই করতেন। তাদের ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার উপদেশ দিতেন। একবার তিনি তার ছেলে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিবেশীর সাথে কোনো এক কারণে বিরোধে জড়িয়ে তর্ক করতে দেখলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘প্রতিবেশীর সাথে মন্দ কথা বলো না। এ কথা তার ইন্তেকালের পরও বেঁচে থাকবে।’^{১৯৮} এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, দুনিয়ার সবকিছু ক্ষণস্থায়ী। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পর এবং সব মানুষ মরে যাবার পরও মানুষের আমল থেকে যাবে যার জন্য তাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহিতা করতে হবে।

আর তিনি তার পিতার সাথে সংব্যবহারকারী ছিলেন। হিজরীর বারতম বছর রযব মাসে তিনি উমরা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দুপুরের আগ মুহূর্তে মক্কায় প্রবেশ করেন। তার পিতা আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বাড়ির দরজায় অবস্থান করছিলেন। তার সাথে কয়েকজন যুবক ছিল। তাদেরকে তিনি সঙ্গ দিচ্ছিলেন। তখন কেউ তাকে বলল, ‘এই যে আপনার ছেলে!’ পিতা এ কথা শুনে দাঁড়ালেন। এটা দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত তার দাঁড়ানো উটনীকে বসানোর চেষ্টা

^{১৯৮} যুহদ, ইবনে মুবারক (১/৫৫১)।

করলেন। (কিন্তু উটনীর বসতে দেবী হচ্ছিল) তাই তিনি উটনী থেকে লাফিয়ে নামলেন যেন পিতার সাথে সদয় আচরণ হয়। লোকেরা এসে সালাম করতে লাগল। আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আতীক, তারা অনেক। তুমি তাদের সঙ্গ দাও।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে পিতা! আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। আমাকে অনেক বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শক্তি ছাড়া এ দায়িত্ব আদায়ের সামান্যতম শক্তি আমার নেই।’

সব দায়িত্বের পরও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামাযই ছিল তার জীবনের প্রাণ। আমি এখানে শুধু তার সময়মতো নামায পড়ার কথা বলছি না, বরং আমি বলতে চাচ্ছি, খুব গুরুত্ব এবং পরম যত্নের সাথে তিনি নামায পড়তেন। তার ইন্তেকালে অনেক বছর পরেও মক্কার লোকজন বলাবলি করত, ‘ইবনে জুরাইব আতা’র কাছ থেকে নামায শিখেছে, আতা শিখেছেন যুবায়ের-এর কাছ থেকে, যুবায়ের শিখেছেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায শিখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে।’ আব্দুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ‘আমি কখনো ইবনে জুরাইব থেকে কাউকে ভালোভাবে নামায পড়তে দেখিনি।’^{১৯৯}

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সকালে ফজরের নামায পড়ালেন। দু-রাকাতে তিনি সূরা বাকারা পড়লেন। নামাযান্তে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, পাশ ফিরে দেখলাম সূর্য উদিত হয়ে গেছে।’ তিনি বললেন, ‘যদি সূর্যোদয় হয়েই থাকে, তাহলে সেটা আমাদের গাফেল পায়নি।’^{২০০}

যখন কেউ দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়ে পড়ত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং আখেরাতের কথা

^{১৯৯} ফাযায়েলে সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ (১/২৫৪)।

^{২০০} আর-রিয়াযুন নাযরাহ ফী মানাকিবিল আশারাহ, পৃ. ২২৪।

স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমন, কারও প্রিয়জন ইন্তেকাল করেছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলতেন, ‘সব দুঃখ-দুর্দশারই সান্ত্বনা আছে এবং যখন কাউকে অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলে, তখন তার ভাগ্যে কিছুই জোটে না। তীব্র যাতনার চেয়ে মৃত্যু সহজ (ঈমানদারদের জন্য; যার প্রিয়জন মারা গেছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আশা দিচ্ছেন) এবং তারপর এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর কথা স্মরণ কর, কি কষ্ট করেই না তা সহ্য করেছে। তাহলে এখন তোমার কষ্ট কম হবে। আল্লাহ তোমার পুরস্কারকে বাড়িয়ে দিন!’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশেষভাবে কাউকে একাকী এবং সাধারণ লোকদেরকে মিস্বর থেকে সতর্ক করতেন। তার খুতবা ছিল খুব সংক্ষেপ। তাতে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা থাকত না (যা এখন খুবই সাধারণ) এবং তা হতো প্রজ্ঞাপূর্ণ। একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক তেজস্বী খুতবায় বললেন, ‘মানুষের জন্য পাঁচটি অন্ধকার এবং পাঁচটি আলো আছে। দুনিয়ার ভালোবাসা হচ্ছে অন্ধকার এবং তাকওয়া হচ্ছে তার আলো। গুণাহ অন্ধকার এবং তওবা তার আলো। কবর অন্ধকার এবং তার আলো কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। আখেরাত অন্ধকার এবং তার আলো নেক আমল। পুলসিরাত অন্ধকার এবং তার আলো ঈমান।’^{২০১}

বিশেষ করে জুমু‘আর খুতবায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় ঈমান এবং বাগ্মিতা বোঝা যেত। আউসাত ইবনে ইসমাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের এক বছর পর তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি খুতবা শুনেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘গত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে এই মিস্বরে দাঁড়িয়েছিলেন যেরকম আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।’ এ কথা বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি এমনভাবে কাঁদছিলেন যে কারণে তিনি কোনো

^{২০১} ফারায়েয আল-কালাম লিল খুলাফা আল-কিরাম, কাসিম আশুর, পৃ.২৯।

কথা বলতে পারছিলেন না। কান্নায় তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর বললেন, ‘হে লোকসকল, আল্লাহর কাছে কল্যাণ (শারিরীক, কিন্তু বিশেষ করে আত্মিক সুস্থতা এবং আখেরাতের কল্যাণ) চাও। দৃঢ় ঈমানের বিপরীতে অধিক কোনো কল্যাণ নেই। সর্বদা সত্য কথা বলবে। সততাই হচ্ছে দীনদারী। আর উভয়েই জান্নাতের সামগ্রী (সৎ এবং দীনদার ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে)। আর মিথ্যার ব্যাপারে সাবধান! মিথ্যাই অশ্লীল কাজে নিয়ে যায়। মিথ্যা এবং অশ্লীলতা জাহান্নামের সামগ্রী। পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করবে না; অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে না। অন্যকে ঘৃণা করবে না; অন্যকে হিংসা করবে না—কিন্তু একে অন্যের বন্ধু হও, আল্লাহর খাঁটি বান্দা হও।’^{২০২}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মানুষের মধ্যে একটি গুণের বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করতেন যা তার মধ্যে পর্যাণ্ট ছিল। সেটা হচ্ছে বিনয় এবং লজ্জা। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক খুতবায় বলেছেন, ‘হে মুসলমান, আল্লাহকে লজ্জা কর, তার হাতে আমার জীবন, আমি নিজেকে চাদরে আবৃত করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাই। আমি এটা মহান আল্লাহ তা‘আলাকে লজ্জা করে এ কাজ করি।’

আব্দুল্লাহ ইবনে হাকীম বর্ণিত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক খুতবায় বলেন, ‘আল্লাহকে ভয় করা, তার যথাযোগ্য প্রশংসা করা এবং ভয় এবং আশা নিয়ে তার কাছে দু‘আ করার জন্য আমি নিজেকে এবং আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রশংসা করেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অবশ্যই তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি
সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে
বিনীত।^{২০৩}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেছেন, ‘হে আল্লাহর
বান্দাগণ, তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ তা‘আলা নিজের হকের
বিনিময়ে তোমাদের জানসমূহ নিজের কাছে রেহানে আবদ্ধ
রেখেছেন, আর এই তোমাদের কাছ থেকে পূর্ণ ওয়াদা গ্রহণ
করেছেন। তিনি তোমাদের অস্থায়ী সামান্য জানকে অসংখ্য স্থায়ী
নেয়ামতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, আল্লাহ তা‘আলার
কিতাব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। উহার বিস্ময়কর ও
অক্ষমকারী গুণাবলী কখনও নিঃশেষ হবে না। তার আলো
কখনও স্তিমিত হবে না। অতএব তোমরা আল্লাহ তা‘আলার এই
কালামকে সত্য বলে বিশ্বাস কর এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ
কর। আর এর আলো থেকে অন্তর-চক্ষুর জ্যোতি হাসিল কর,
সেদিনের জন্য যেদিন কোনো আলোই থাকবে না। আর একথা
খুব উত্তমরূপে স্মরণ রেখ, আল্লাহ তোমাদেরকে একমাত্র তার
ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য দু-জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে
রেখেছেন যারা জানেন তোমরা যা কর। আরও জেনে রাখ, এ
দুনিয়ায় তোমরা সবাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছ। আর
কখন যাওয়ার সময় হবে, কেউ জানে না। যদি কোনোভাবে
নেক আমল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা যায়,
তবে তার চেষ্টা কর। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এটা করা সম্ভব
নয়। অনেক মানুষ অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।
অথচ নিজের ব্যাপারে ছিল উদাসীন (আল্লাহর প্রতি দায়িত্বের
বেলায় সতর্ক ছিল না)। আমি তোমাদেরকে সেরকম হতে
নিষেধ করছি। সুতরাং ভালো কাজে দৌড়াও এবং তাতেই
রয়েছে নাজাত। সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও
বলেছেন, ‘কোথায় তোমার ভাই যাকে তুমি চিনতে? কোথায়

সেই বন্ধুরা যাদেরকে তুমি চিনতে? তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। তাদের আমলের বিনিময় তারা পাচ্ছে। হয় তারা শান্তিতে আছে নয় কঠিন আঘাবে রয়েছে। কোথায় আজ সেই অহংকারী রাজা-বাদশারা যারা বড় বড় শহর বানিয়েছিল এবং চারিদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরাও দিয়েছিল? তারা আজ মাটি আর পাথরের নিচে। কোথায় সেই সুন্দর উজ্জ্বল চেহারা, যৌবনে যে সবার নজর কাড়ত? কোথায় রাজারা? কোথায় তারা যাদেরকে যুদ্ধে বিজয় দান করা হয়েছিল?

সময় তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা এখন কবরের গভীর অন্ধকারে পড়ে আছে। ঐ কথায় কোনো লাভ নেই যে কথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বলা হয়নি। ঐ সম্পদে কোনো লাভ নেই যা আল্লাহর পথে খরচ করা হয়নি। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যার অজ্ঞতা তাকে ধৈর্যধারণ থেকে পিছিয়ে রেখেছে। ঐ ব্যক্তির মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই যাকে আল্লাহর জন্য কিছু করতে বললে সমালোচনার ভয়ে করতে সাহসী হয় না। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্কের কোনো তুলনা হয় না। এ সম্পর্কের কারণে তার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে না, অথবা মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে দিবেন, তাও আশা করতে পারে না। তাকে মানার মাধ্যমেই তার কাছ থেকে রহমত এবং মন্দ থেকে ফিরে থাকার হিম্মত লাভ করা যায়।

কোনো ভালোই ভালো না যদি তা জাহান্নামে নিয়ে যায়, আবার কোনো কষ্টই কষ্ট না যদি তা জান্নাতে নিয়ে যায়। তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তার প্রশংসা কর যেমন প্রশংসার যোগ্য তিনি, তার নিকট নিজের গুনাহের জন্য মাফ চাও। তিনি পরম ক্ষমাশীল। যা বলার দরকার ছিল, আমি তা বললাম। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার এবং সবার জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করছি।^{২০৪}

^{২০৪} এ হাদীসের বর্ণনা সূত্র হাসান (গ্রহণযোগ্য), এটা হাদীসের বক্তব্যের জন্য নয়, বরং অন্যান্য বর্ণনায় এ হাদীসের সমর্থন পাওয়া গেছে। এ হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবু শাইবাহ (৭/১৪৪)

২। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে বিচার ব্যবস্থা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিচার ব্যবস্থা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের বিচার ব্যবস্থা আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিচার ব্যবস্থারই বাস্তব নমুনা ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবিকল একই নীতি অবিকৃতভাবে অনুসৃত হয়েছে। তার বিচারের জন্য আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় ছিল না। তাদের বিচার ব্যবস্থার দু-টি প্রধান দিক হলো,

- ✓ প্রথমত, পুরোপুরি কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে বিচার করা হতো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় প্রয়োগ করা হয়েছিল।
- ✓ দ্বিতীয়ত, নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দপ্তর বন্টন করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যে নতুন নতুন ইস্যু এবং পরিস্থিতিতে বিচার ব্যবস্থাকে সহজ করেছিলেন।

যদি কেউ তার কাছে বিচারের জন্য আসত অথবা দু-জন বিচারপ্রার্থী হাজির হতো, তাহলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই সেগুলোর বিচার করতেন। কিন্তু সবসময় তিনি এটা পারতেন না। মদীনায় বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের তুলনায় বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত এজন্য তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম বিচারক এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দ্বিতীয় বিচারক। মদীনার বাইরে তিনি গভর্নর এবং বিচারক পদে অনেককে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের বেশিরভাগকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সেসব কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় বিচারের মূলনীতি ছিল,

১। পবিত্র কুরআন মাজীদ

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সুন্নাতসমূহ যেখানে তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন বিচারকার্যে নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। ইজমা, অর্থাৎ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সমসাময়িক বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, তা অনুসরণ করতেন।

৪। ব্যক্তিগত অভিমত এবং বিশ্লেষণ (কিয়াস), আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা তখনই প্রয়োগ করতেন যখন কোনো ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা পেতেন না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনো বিচার এলে প্রথমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজীদে এর সমাধান খুঁজতেন। যদি সেখানে নির্দেশ পেয়ে যেতেন, তাহলে সে অনুযায়ীই বিচার করতেন। আর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না পেতেন, তাহলে তিনি সুন্নাহ তালিশ করতেন। যদি সেখানে সমাধান পেয়ে যেতেন, তাহলে সে অনুযায়ীই বিচার করতেন। আর যদি না পেতেন, তাহলে অন্যদের জিজ্ঞেস করতেন, ‘আপনারা কেউ কি জানেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন কিনা?’ যদি কেউ জানতেন, তাহলে তিনি সেভাবে বলতেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেভাবেই বিচার করতেন এবং বলতেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার যিনি আমাদের মধ্যে এমন একজনকে দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এটা মনে রেখেছে।’ আর যদি তেমন কাউকে না পেতেন, তাহলে তিনি বিজ্ঞ সাহাবীদেরকে জমা করতেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করতেন। যদি সবাই কোনো এক বিষয়ে একমত পোষণ করতেন, তাহলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেভাবেই ফায়সালা দিতেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ সাহাবীরা সবাই একমত পোষণ করলে সে সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করা তার জন্য জরুরী হয়ে যায়। খলীফার জন্য তাদের বিরোধিতা জায়েয নয়।

যদি কোনো ব্যাপারে কেউ বলত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এরকম শুনেছি, তাহলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্বাক্ষী হিসেবে অন্য কাউকে পেশ করার জন্য বলতেন। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, প্রথমজন ঠিক বলছে এবং তিনি সঠিক তথ্য অনুযায়ী বিচার করছেন। যেমন, কাবীসা ইবনে যুআইব বর্ণনা করেন যে, একজন মহিলার নাতী মারা গেছে। তখন সে মহিলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এল। সে মহিলা নাতীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ চাচ্ছে। কিন্তু দাদী যে সে সম্পত্তির ভাগ পেতে পারেন, এটা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কখনো শোনেননি। এজন্য তিনি মহিলাকে বললেন, ‘আমি এ ব্যাপারে কুরআনে কিছু পাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কিছু বলতে শুনিনি।’ তিনি যেহেতু এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না, সেজন্য সাহাবীদের কাছে বিষয়টি পেশ করলেন।

মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক মহিলাকে তার মৃত নাতীর সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছিলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘তোমার এই মতের পক্ষে কোনো স্বাক্ষী আছে?’ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে স্বাক্ষী দিলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ঐ মহিলাকে তার মৃত নাতীর সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার আদেশ দেন।^{২০৫} এমনকি যখন এরকম বিষয় শুধু নিজের বেলায় পাওয়া যেত, তখনো তিনি এটাকে যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনি তখন তার পক্ষেও স্বাক্ষী খুঁজতেন। সাধারণত কাউকে দৈহিক শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে এমন করতেন। বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘যদি কাউকে দেখতাম যে, তার জন্য দৈহিক শাস্তি প্রাপ্য, তখন নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগ করতাম না।’

^{২০৫} তায়কিরাতুল হাফিয, যাহাবী (১/২)।

নূন্যতম একজন হলেও স্বাক্ষীর উপর নির্ভর করতাম।' নিচে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কিছু বিচারকার্যের উদাহরণ পেশ করা হলো।

ক। কেসাসের বিচার

আলী ইবনে মাযিদাহ সাহমী বলেন, 'আমি একজনের সাথে মারামারি করার সময় তার কানের কিছু অংশ কেটে ফেলি। এটা ঘটনাক্রমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে পড়ে গেল। তখন তিনি হজের জন্য এসেছিলেন। আমি এবং আমার প্রতিপক্ষ বিষয়টির মীমাংসার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পেশ করলাম। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'বিষয়টি দেখুন এবং কান কাটা লোকটি প্রতিপক্ষের উপর একই ধরনের শাস্তির দাবী করতে পারে কিনা জানান।' তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হ্যাঁ। একজন কাপার (যে সিংগা লাগায়)-কে ডাকুন।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কাপার শব্দটি উচ্চারণ করেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি,

إِنِّي وَهَبْتُ لِحَاكَّتِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ لَهَا فِيهِ وَإِنِّي
نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا

আমি একজন বালক দাসকে হাদিয়া হিসেবে আমার খালাকে দিয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, সে তার জন্য আশির্বাদ হবে। আমি তাকে কাপার, কসাই অথবা কারিগর বানাতে নিষেধ করেছিলাম।

খ। পিতার নূন্যতম জীবনধারণের খরচ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলের দায়িত্ব

কাইস ইবনে হাযিম বলেন যে, তিনি একবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন। তখন এক লোক তাকে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, এই ব্যক্তি সে তার পিতার দিকে

ইশারা করল) আমার সব সম্পদ দখল করতে চায়।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আপনার ছেলে কাছ থেকে কেবল জীবন ধারণের নূন্যতম খরচ নিতে পারেন।' তখন লোকটার পিতা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি, তুমি এবং তোমার সব সম্পদ তোমার পিতার? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, 'আল্লাহ যা দিয়েছে তার উপর সন্তুষ্ট থাক।' আরেক বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নিত্য প্রয়োজন মেটানোর খরচের কথাই বলেছেন।' অথবা একজন পিতা তার ছেলের কাছ থেকে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই নিতে পারে। এর বেশি না। আল্লাহই ভালো জানেন।

গ। আত্মরক্ষায় বিচার

আবু মুলাইকা তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক আরেকজনের হাতে কামড় মেরেছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজ হাত টান দেওয়ায় প্রথম ব্যক্তির সামনের একটি দাঁত উঠে গেছে। এ বিষয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নালিশ গেলে তিনি আদেশ দেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।

ঘ। চাবুক দিয়ে মারার ঘটনা

ইমাম মালিক নাফিঈ থেকে নিচের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে সাফিয়্যাহ বিনতে আবু উবাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। একজন লোককে বন্দি করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনা হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে একজন কুমারী মেয়ের সাথে অবৈধ কাজ করে তাকে গর্ভবতী করেছে। এ বিষয়ে কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল না যেহেতু লোকটা নিজেই তার দোষ স্বীকার করেছে।

লোকটি অবিবাহিত ছিল। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পাথর মেরে হত্যা করার পরিবর্তে চাবুক দিয়ে বেত্রাঘাত

করার নির্দেশ দিলেন। যথারীতি শান্তি প্রয়োগ করা হলো এবং লোকটিকে ফাদাক এলাকায় নির্বাসিত করা হলো। আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মহিলাটিকে চাবুক মারার নির্দেশ দেননি, নির্বাসিত করেননি। কারণ মহিলাটিকে এ অবৈধ কাজে বাধ্য করা হয়। পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে অভিযুক্ত মহিলাটিকে বিয়ে দিয়ে দেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি হবে যে কোনো মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে পরে আবার তাকেই বিয়ে করতে চায়? তিনি বললেন, ‘এর চেয়ে উত্তম তওবা আর নেই। এভাবে দু-জন বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারবে।’^{২০৬}

৫। বিধবা মহিলার পুনর্বার বিয়ে করার আগ পর্যন্ত তার ছোট শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার রয়েছে

উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আনসারী মহিলাকে তালাক দিলেন যিনি তার সন্তান আসিম-এর মা ছিলেন। তালাক দেওয়ার কিছু দিন পর মক্কা এবং আরাফার মাঝামাঝি মুহাসসা নামক স্থানে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলেকে দেখে খুশি হলেন। আসিম মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার বয়স পেরিয়েছে এবং হাঁটতে শিখেছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসিমকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাইলেন। এজন্য ছেলেকে ধরে টানলেন। কিন্তু তার মা তাকে দিতে চাচ্ছিলেন না এবং তিনিও ছেলেকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। দু-জনের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত কথা বিনিময় হচ্ছে। এসময় ছেলেকে যেহেতু দু-জনে ধরে টানাটানি করছিলেন, ছেলে ব্যথা পাচ্ছিল এবং সে কান্না শুরু করে দিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ছেলের ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমার বেশি অধিকার রয়েছে।’

^{২০৬} মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (১২৭৯৬)। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তিনি তার সাবেক স্ত্রীর বিষয়টিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থাপন করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আদেশ দিলেন যে, শিশুকে নিজের কাছে রেখে পরিচর্যা করার অধিকার তালাকপ্রাপ্ত মায়ের রয়েছে। এ আদেশ দেওয়ার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘শিশুর জন্য মায়ের আদর, ভালোবাসা এবং পরিচর্যা পিতার চেয়ে ভালো। আর যখন সে বালগ হবে, তখন সে নিজের জন্য তাকে নিতে পারবে।’^{২০৭} আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

‘শিশুর জন্য মা অধিক স্নেহপ্রবণ, আদর-যত্নে বেশি মমতাময়ী। ছেলেকে কাছে রাখার জন্য তারই অধিকার বেশি যতদিন পর্যন্ত না তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন।’^{২০৮}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কয়েকটি বিচারের ঘটনা উপরে উল্লেখ করা হলো। তার বিচার ব্যবস্থায় কয়েকটি মূলনীতি নিচে দেওয়া হলো :

ক। বিচার পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত—দু-টিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় প্রয়োগকৃত বিচার ব্যবস্থার নীতি অনুসৃত হয়েছে।

খ। তার আমলে বিচারিক কাজে এবং বিচারে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এগুলো পরবর্তীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুসরণীয় হয়ে আছে। বিচারকরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা তার নিয়োগকৃত বিচারকরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তারাও একই বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত দিতেন।

গ। বিচার ব্যবস্থাকে তখনো প্রশাসন থেকে আলাদা করা হয়নি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একাই ছিলেন খলীফা এবং প্রধান বিচারক।

^{২০৭} প্রাগুক্ত (৭/৫৪) (১২৬০১)।

^{২০৮} প্রাগুক্ত (৭/৫৪) (১২৬০০)।

ঘ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিচার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় আইনের পরিমাণ ছিল অনেক কম। কুরআন, সুন্নাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক আদেশ। কারণ তখনো ওহী নাযিল হচ্ছিল। এজন্য সাহাবীরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভর করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর পরিস্থিতি বদলে যায়। বিচার ব্যবস্থায় নতুন নতুন ইস্যু তৈরি হতে থাকে এবং আইনের নতুন উৎসের সৃষ্টি হয়। এ উৎস, আগেই বলেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর বর্ধিত সংস্করণ। এভাবে কুরআন এবং সুন্নাহ দু-টি প্রধান উৎসের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেওয়া বিভিন্ন বিচারিক সিদ্ধান্ত ছিল। এখন আরও নতুন দু-টি উৎস তৈরি হলো; ইজমা (ঐকমত্য) এবং কিয়াস (ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ)।

ঙ। দুর্বলকে বাঁচানোই ছিল বিচার ব্যবস্থার আরেকটি মূলনীতি। নির্যাতিতকে উদ্ধার করা এবং দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া এবং সমাজের ধনীদেরকে আলাদা দৃষ্টিতে না দেখা।

চ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত মেনে নিত। আর না মানলে তা বলপূর্বক প্রয়োগ করা হতো। অন্যদিকে বিচার প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন হতো।

৩। মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে মুসলিম ভূখণ্ডের সীমানা খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি শহরের জন্যও গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। গভর্নরের দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, শহরে শান্তি বজায় রাখা, যাকাত সংগ্রহ এবং

বিতরণ করা, জনগণের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, জুমু'আর নামায ও খুতবা প্রদান এবং মানুষকে দীন শেখানো ইত্যাদি। এজন্য সবচেয়ে জ্ঞানী, দীনদার এবং নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বেছে বেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োগ দিতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও গভর্নর নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তিনি তাদের সবাইকে আবার পুনঃনিয়োগ দেন। তিনি কাউকেই বাদ দেননি। অবশ্য কয়েকজনকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন যাতে তাদেরকে অন্য জায়গায় গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা যায়। এমন জায়গায় যেখানে তাদের খেদমত বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল।

নিচে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে গভর্নরদের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করা হলো।

ক। নামায প্রতিষ্ঠা করা : গভর্নরদের প্রধান একটি দায়িত্ব ছিল নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই ইমামতি করা। তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, বরং তিনি ধর্মীয় নেতা, আলেম এবং দাঈও ছিলেন। এজন্য আমরা দেখি যে, সকল গভর্নর শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়াতেন না, বরং প্রতি শুক্রবারে জুমু'আর খুতবা দিতেন। ঘটনাক্রমে নামাযে ইমামতি করার আদেশ শুধু প্রদেশের গভর্নরদের উপরই ছিল না, সেনাবাহিনীর ছোট প্লাটুন, ব্যাটালিয়ান অথবা যে কোনো ক্ষুদ্র দলের আমীর যাদেরকে কোনো যুদ্ধে অথবা কাজে পাঠানো হয়েছে, তাদের উপরও একই দায়িত্ব ছিল।

খ। মুসলিম সৈন্যবাহিনীর তদারকি করা : মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বর্ডার এলাকায় যেসব গভর্নর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, তাদের একটি অন্যতম কাজ ছিল মুসলিম সৈন্যবাহিনীর তদারকি করা। তারা মদীনা শহর থেকে অনেক দূরে ছিলেন। এজন্য তাদের জন্য মদীনার

সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। তাদেরকে স্বপ্রণোদিত হয়েই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতো। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, বন্দীদের ব্যবস্থাপনা, গণীমতের মাল বন্টন, শত্রুদের সাথে চুক্তি করা ইত্যাদি।

গ। নতুন বিজিত ভূমি পরিদর্শন করা : এ দায়িত্ব তাদের উপরই ছিল যারা কেবলমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বর্ডার এলাকায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। যখন মুসলিম সৈন্যবাহিনী কোনো নতুন দেশ দখল করত, তখন তার দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত হতো। তাদেরকে শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হতো। তাছাড়া সেখানে ইসলামী বিধি-বিধান চালু এবং তা সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য তাদেরকে একজন গভর্নর এবং বিচারক নিয়োগ দিতে হতো। এ নিয়োগ অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতিক্রমেই হতো। অনেকসময় তিনি নিজেই বার্তার মাধ্যমে নতুন গভর্নর এবং বিচারকের নাম জানিয়ে দিতেন।

ঘ। খলীফার পক্ষে আনুগত্যের শপথ করানো : যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন লোকজন তার কাছে বাইআত গ্রহণ করল। কিন্তু যারা মদীনার বাইরে দূরে অন্য কোনো শহরে বসবাস করত, তাদের জন্য মদীনায় এসে বাইআত গ্রহণ করা সহজ ছিল না। অধিকন্তু এটা আশা করাও অসম্ভব যে, সারা দেশ থেকে সবাই এসে নতুন খলীফার কাছে বাইআত হবে। এ সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে মক্কা, তাইফ এবং অন্যান্য শহরের গভর্নরের কাছে তারা খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল।

ঙ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব : গভর্নরের উপর রাষ্ট্রের অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা এবং তা গরিবদের মধ্যে সুষ্ঠু বন্টন করা। তাছাড়া তারা মুসলমানদের অধীন অমুসলিম এলাকা থেকে জিযিয়া (কর) আদায় করতেন।

চ। শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা : জনগণের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সবার নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করা গভর্ণরের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। তারা শহরের রাস্তা-ঘাটে ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের উপদ্রব নির্মূল করে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেন। বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া গভর্ণরের দায়িত্ব ছিল। যখন কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির বিধান জানা যেত না, সেখানেও তাদেরকে নিজেদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তা নির্ধারণ করতে হতো। মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একবার এরকম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তার শহরে দু-জন মহিলা গান গেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমান করেছিল এবং তার মৃত্যুতে তাদের উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেল। এ বিষয়ে আমরা ধর্মচ্যুতদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ছ। মানুষকে দ্বীন শেখানো : গভর্ণরদের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল জনগণকে দ্বীনের আহকাম শেখানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐসব ব্যক্তিদেরকেই গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিতেন যারা কেবল নেতৃত্বে এবং প্রশাসনিক দায়িত্বেই ভালো ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারেও ছিলেন সুগভীর জ্ঞানী এবং উত্তম বিচারক। মুআল্লিম হিসেবে তাদের দায়িত্বের গুরুত্ব বেশি ছিল কারণ তারা নতুন বিজিত দেশ অথবা শহরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারেরও প্রয়োজন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী অনেক গভর্ণর লোকজনকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মসজিদে বসতেন। একজন ঐতিহাসিক বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত একজন গভর্ণর ছিলেন যায়েদ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও তাকে পুনঃনিয়োগ দেন। তিনি সকালে উঠেই লোকজনকে কুরআন এবং হাদীস শেখাতেন যেমনটি তিনি আগে করতেন (মানে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে গভর্নর থাকাকালে যেরকম করতেন)।^{২০৯}

গভর্নরদের মুআল্লিম এবং দাঈ হিসেবে ভূমিকার জন্য প্রতিটি প্রদেশের আনাচে-কানাচে, যেখানে তারা দায়িত্বে ছিলেন, ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। তারা নতুন বিজিত এলাকা সমূহে ইসলামের ভিতকে মজবুত করেন। ঐসব এলাকায় লোকজনের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল বেশি। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে যেসব অঞ্চলে ধর্মচ্যুতদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, এ শিক্ষা তাদের ফিরিয়ে আনতেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। হয়তো কোনো অঙ্গরাজ্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পুনর্দখল হয়েছে, সেখানকার লোকজন যারা আবার ইসলামে ফিরে এসেছিল, তাদের জন্য ইসলামী শিক্ষা এবং আত্মিক উন্নতিতে সঠিক নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল।

গভর্নররা নিজ নিজ প্রদেশের জন্যই দায়িত্বশীল ছিলেন। যদি কোনো কারণে তাকে কোথাও যেতে হতো, তাহলে তিনি অন্য কাউকে তার অবর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করে যেতেন। যেমন মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনে কিন্দা প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে একই পদে পুনর্বহাল করেন। তখন তিনি কিন্দায় ছিলেন না। নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি কিন্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার পৌছতে দেরি হচ্ছিল। এজন্য তিনি যিয়াদ ইবনে লাবিদকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠান এবং তার সুস্থ হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে বলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ খবর পেয়ে সম্যক

পরিস্থিতি জেনে এ অস্থায়ী নিয়োগকে মেনে নেন। একইভাবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গভর্নর থাকাকালে একবার গুরুত্বপূর্ণ সফরের কারণে আরেকজনকে অস্থায়ীভাবে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

যে কোনো গভর্নর, এমনকি যে কোনো সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিয়োগের আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে আলোচনা করতেন। তাদের কাছে সম্ভাব্য প্রার্থীর চারিত্রিক গুণাবলী এবং অন্যান্য যোগ্যতার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতামতকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। তারপরেও যাকে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতেন, তার সাথেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলোচনা করতেন। বিশেষ করে কোনো গভর্নরকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে বদলী করার সময় অবশ্যই এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো।

আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় এরকম হয়েছিল। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতকালে তাকে প্যালেস্টাইন অভিযুক্তি এক সৈন্য দলের নেতা হিসেবে বদলী করে দেন। এ বাহিনীর জন্য একজন যোগ্য এবং অভিজ্ঞ নেতা প্রয়োজন ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হওয়ার পর এ বদলী কার্যকর করেন। আরেকবার তিনি আল-মুহাজির ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেন অথবা হাদরামতের শাসনভার বুঝে নিতে বলেন। তখন আল-মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনের গভর্নর হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাই করেন এবং হাদ্রামতের জন্য আরেকজনকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

গভর্নর নিয়োগের সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি সুন্নাতের দিকে খেয়াল রাখতেন। সেটা হলো, কোনো প্রদেশের মধ্যে যোগ্য লোক থাকলে তাকেই ঐ প্রদেশের গভর্নর বানানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন। তায়েফের গভর্নরের বেলায় তিনি তায়েফ অধিবাসী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই তায়েফের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। একইভাবে কিছু কিছু গোত্রের গভর্নরের ক্ষেত্রে ঐ একই গোত্রের যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এটা চিরসত্য যে, কোনো দল বা গোত্রকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ দল বা গোত্রের কেউ নেতা হলে সবাই তার প্রতি বেশি অনুগত হয়। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনই এ নীতি অনুসরণ করতেন যখন তিনি ব্যক্তির নিষ্ঠা, জ্ঞান, সত্যবাদিতা এবং সামর্থ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন।

কখনও কখনও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-টি প্রদেশকে একজন গভর্নরের অধীন করে দিতেন। সাধারণত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি এ কাজ করতেন। এর মধ্যে একটি ছিল ধর্মচ্যুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজীকরণার্থে। যেমন কিন্দাহ এবং হাদরামত দু-টি আলাদা প্রদেশ হওয়ার পরও তিনি দু-টিকে এক প্রদেশ করে দিয়েছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদরামতের গভর্নর যিয়াদ ইবনে লাবিবকে নতুন সংযুক্ত ভূখণ্ডের (কিন্দাহ এবং হাদরামত) শাসনকার্যে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এসব গভর্নরদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর সম্পর্ক ছিল। তারা যত দূরের প্রদেশের গভর্নরই হন না কেন, তাদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকত। প্রশাসনিক ব্যাপারেই এ যোগাযোগ বেশি হতো; যখন কোনো সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিত, তখন গভর্নররা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পরামর্শ অথবা পরিস্থিতি সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট আদেশের জন্য চিঠি লিখতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দৈনন্দিন কাজগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কাজ ছিল এসব চিঠির জবাব দেওয়া এবং গভর্নরদের কাছে

প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া। এ কাজের জন্য এবং যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে ও গভর্নরদের নিকট থেকে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য দাপ্তরিক দূত নিয়োগ করেছিলেন। উপদেশ জিজ্ঞেস করা ছাড়াও প্রদেশের যাবতীয় খবরাখবর গভর্নররা খলীফার নিকট পাঠাতেন। তাকে প্রদেশের সামগ্রিক উন্নতি এবং অবস্থা সম্পর্কে আপ-টু-ডেট রাখতেন।

বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নররা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন। সাধারণত পাশাপাশি প্রদেশের গভর্নরদের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রযোজ্য ছিল। তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, পার্শ্ববর্তী গভর্নরের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব যাতে উভয়েই উপকৃত হবে। অধিকন্তু তাদের পরস্পরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই ছিল: তারা সবাই ক্রমবর্ধমান ইসলামী রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী এবং নিরাপদ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একজন আরেকজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য গভর্নররা পরস্পরের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান করতেন, আবার কখনও সরাসরি সাক্ষাৎও করতেন। ইয়েমেন এবং হাদরামতের গভর্নরদের মাঝে মাঝে একসাথে কাজ করতে হয়েছে। শাম (সিরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) দেশের মুসলিম শাসকরাও একে অন্যের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব নেতারা গভর্নর ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন সেনাবাহিনীর কমান্ডার। শত্রুর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের কলাকৌশলে যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তারা একে অন্যের সাথে প্রায়ই দেখা করতেন।

গভর্নরদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেসব চিঠি-পত্র প্রেরণ করতেন, তার বেশিরভাগ প্রশাসনিক বিষয়াদির সাথে তেমন সংশ্লিষ্ট ছিল না। বরং এ চিঠিগুলোতে তিনি দু-টি উপদেশই খুব জোরালোভাবে দিতেন; দুনিয়া থেকে বেশি কিছু আশা কর না এবং অক্লান্তভাবে আখেরাতের জন্য কাজ কর।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহ ছিল :

১। মদীনা : ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। এখানেই খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বসবাস করতেন।

২। মক্কা : এর গভর্নর ছিলেন আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ পদে প্রথম অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হন।

৩। তায়েফ : এর গভর্নর ছিলেন উসমান ইবনে আবুল-আস আস্‌সাকাতী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ পদে প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হন।

৪। সান'আ : এটা মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ধর্মচ্যুতদের সাথে যুদ্ধে বিজীত হয়। ঐ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন আল-মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া। তাকেই এখানে গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

৫। হাদরামত : এর গভর্নর ছিলেন যিয়াদ ইবনে লাবিদ।

৬। যুবাইদ এবং রাকা : এ দু-টি প্রদেশের গভর্নর ছিলেন আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

৭। খাওলান : এর গভর্নর ছিলেন ইয়ালা ইবনে আবু উমাইয়া।

৮। জুন্দ : এর গভর্নর ছিলেন মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু।

৯। নাযরান : এর গভর্নর ছিলেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

১০। জারশ : এর গভর্নর ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাওর।

১১। বাহরাইন : এর গভর্নর ছিলেন আল-আলা ইবনে আল-হাদ্রামী।

১২। ইরাক এবং শাম : ইরাক এবং শাম মুসলমান কর্তৃক বিজয় প্রক্রিয়াধীন ছিল। সুতরাং দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা গভর্নর ছিলেন না। তারা মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন যাদেরকে ইরাক ও শাম বিজয় করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১৩। আন্মান : এর গভর্নর ছিলেন হুজাইফা ইবনে মিহসান।

১৪। ইয়ামামাহ : এর গভর্নর ছিলেন সুলাইত ইবনে কাইস।^{২১০}

৪। আবু বকর রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর আলী রা. এবং যুবায়ের রা.-এর প্রতিক্রিয়া

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করতে দেরি করেছিলেন, এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা বিশেষ করে রাফিযাহ গ্রুপের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এসব বর্ণনার প্রায় সবগুলোই কল্পকাহিনী। কেবল ইবনে আক্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি ব্যতিক্রম। তিনি বলেছেন, ‘আলী, যুবায়ের এবং তাদের সাথে যারা ছিলেন, তারা বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত থেকে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন।’^{২১১} এর কারণও রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাজিরীন সাহাবী, যাদের মধ্যে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও একজন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল করানো এবং কাফনের কাপড় পরানো। এটা কোনো বানানো গল্প না। বরং এটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সালিম ইবনে উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা মতে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

^{২১০} আল-দুয়াল আল-আরাবিইয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ, মানসূল আল-হিরাবি, পৃ. ৯৬-৯৭।

^{২১১} সহীহ আত-তাওসীক ফী সিরাহ ওয়া হায়াত আস-সিদ্দীক, পৃ. ৯৮।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, ‘আপনারা রাসূলের দাফনকার্যে নিয়োজিত থাকুন।’ তারপর তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলকে গোসল করাতে বলেন।^{২১২}

এটা মনে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল ইন্তেকাল করেছেন। এ সময় কিছু মানুষ মুসলমান জাতির ভবিষ্যত নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে— এটাই স্বাভাবিক। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরদিন, মঙ্গলবার, যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত হন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিস্বরে উঠে বসলেন এবং উপস্থিত জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করে যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম ধরে ডাকলেন। তিনি এসে গেলে বললেন, ‘হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত ভাই এবং তার ‘হাওয়ারী’, নিঃস্বার্থ নিবেদিত প্রাণ সহযোগী; আপনি কি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির সূচনা করতে যাচ্ছেন?’ তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! না কোনো সমস্যা ও আপত্তি নেই!’ তখন তিনি দাঁড়িয়ে বাইআত গ্রহণ করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জনতার মাঝে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেলেন না। তাই আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম ধরে তিনি ডাকলেন। তিনি এসে গেলে বললেন, ‘হে রাসূলের চাচাত ভাই ও তার প্রিয়তমা কন্যা সূত্রে জামাতা; আপনি কি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে যাচ্ছেন?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা!

কোনো অভিযোগ নেই।' পরে তিনিও দাঁড়িয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।^{২১৩}

দ্বিতীয় বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফের প্রণেতা ইমাম মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এই হাদীসটি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে, এ ব্যাপারে তিনি তার শায়খ ইমাম হাফিজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-খুযাইমাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে ছুটে যান এবং তাকে এই হাদীসের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। ইমাম হাফিজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তার জন্য এই হাদীসটি লিখে দেন এবং পড়ে শোনান। ইমাম মুসলিম হাদীস শুনে বলে ওঠেন, 'এ হাদীসটি একটি বাদানাহ (একটি বড় গরু কুরবানী করার মতো) মানে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ইবনে খুযাইমাহ জবাবে বলেন, 'এ হাদীস কেবল একটি বাদানাহর সমান নয়, বরং এটা একটি বাদারাহর সমান (এক ব্যাগ যাতে ১০০০ অথবা ১০০০০ দিনার ভরা; মানে এই হাদীসটি একটি অমূল্য সম্পদ)।

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপরে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র খুবই বিশ্বস্ত এবং সঠিকভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের একদিন কি দু-দিন পর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। বাস্তব ব্যাপারও তাই কেননা, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি এবং তার পিছনে কোনো নামাযেও অনুপস্থিত থাকেননি।^{২১৪}

আরেক বর্ণনায় এসেছে, হাবীব ইবনে আবু সাবিত বলেন, 'আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ছিলেন। এসময় এক

^{২১৩} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৫/২৪৯), ইবনে কাসীর হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

^{২১৪} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৫/২৪৯)।

লোক এসে তাকে খবর দেয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনের বাইআত গ্রহণের জন্য মিসরে বসেছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সংবাদ পেয়ে তখনই এক কাপড়ে দৌড়ে এসে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তখন তার শরীরের নিচে কোনো কাপড় ছিল না অথবা বড় কোনো জুকাও পরিধানে ছিল না। তিনি ঐ অবস্থায়ই বাইআতের জন্য মসজিদে চলে আসেন। তিনি কিছুতেই এ কাজে দেরী করতে চাননি। বাইআত কার্য শেষ হলে তিনি ঘর থেকে জামা আনিয়ে পরিধান করেন।’

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

আমর ইবনে হারিস সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন?’

সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, ছিলাম।’

‘কখন লোকেরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিল?’

‘যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, সেদিনই। একটি দিনও খলীফাবিহীনভাবে অতিবাহিত করা মুসলমানগণ পছন্দ করেননি।’

‘কেউ কি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিরোধিতা করেনি?’

‘না। কেবল ধর্মত্যাগী এবং ধর্মত্যাগের ইচ্ছা পোষণকারী লোকেরা বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তাহাদের বিরোধিতা কার্যকর হয়নি।’

‘মুহাজিরীনদের মধ্যেও কি কেউ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিরোধিতা করেছিলেন?’

সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘না। বিরোধিতা তো দূরের কথা; বরং তারা সকলে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময় তার প্রতি অনুগত এবং নিবেদিত ছিলেন। তিনি তাকে সর্বদা বস্তুনিষ্ঠ উপদেশ প্রদান এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও

অনেক ইসলামী মনিষীগণ এই মত পোষণ করেন যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ছয় মাস পর অথবা ভিন্নভাবে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তার আনুগত্যকে নবায়ন করেছিলেন। এই দ্বিতীয়বার বাইআত হওয়া প্রসঙ্গে অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা রয়েছে।^{২১৫}

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের স্বার্থে সংগ্রাম করতেন না, বরং মুসলিম জাতির স্বার্থেই তা করতেন। এজন্য সম্ভাব্য সব উপায়েই তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, যতদিন মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে, ততদিন তারা নিরাপদ থাকবে এবং উন্নতির দিকেই এগুবে। মুসলিম সৈন্যদল যখন ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যিল-কিসসাহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি একনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। যিল-কিসসাহ মদীনা থেকে দূরে ছিল।

ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন যিল-কিসসাহর দিকে রওনা হন এবং তিনি তার উটের উপর সোজা হয়ে বসেছিলেন, তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উটের লাগাম ধরে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনাকে ঐ কথাই বলব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, ‘তরবারি সংবরণ করুন। আপনার (সান্নিধ্য) থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং মদীনায় ফিরে চলুন। আল্লাহ না করুন, যদি আমরা আপনাকে হারাই, তাহলে আর কোনোদিনই পৃথিবীতে মুসলমানদের শাসন কায়েম হবে না (সম্ভবত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মারা যান, তাহলে

ধর্মত্যাগীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)।’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় ফিরে আসেন।^{২১৬}

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যদি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতে সন্তুষ্ট না হতেন, তাহলে তিনি এভাবে একটি মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একা ছেড়ে দিতে পারতেন এবং তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তাই করতে দিতেন। আর এভাবে যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে মারা যেতেন, তাহলে খলীফার পদ শূণ্য হয়ে যেত এবং তা তিনি দখল করতে পারতেন। কিন্তু এটা একটি অলীক কল্পনা; আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এত বেশি সত্যনিষ্ঠ এবং ধার্মিক ছিলেন যে, তার পক্ষে এরকম চিন্তা করাও ছিল অসম্ভব। তিনি কেবলই মুসলিম জাতির উন্নতি আশা করেছিলেন। আর সেটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বেই বেশি সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। এজন্য তিনি প্রগাঢ় আন্তরিকতায় খলীফাকে সদুপদেশ দিয়েছেন এবং তাকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সকল সাহাবীর উপর তার রহমত বর্ষণ করুন।

৫। আমাদের (নবীদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরের ঘটনা বলতে গিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি

মদীনা ও ফাদাক-এ অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন,

لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ

আমাদের (নবীদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।^{২১৭}

আরেক বর্ণনায় এসছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদাকাহ তার জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, তার কোনো কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই।’

আরেক বর্ণনায় এসেছে যা বুখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তার সহধর্মিণীগণ আবু বকরের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পেতে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠাতে চাইল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً

আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সদাকাহ রূপে গণ্য হয়।

খুব মহানুভবতা এবং নিঃস্বার্থভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কথাগুলো বলেছিলেন। যদি আত্মীয়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায়, তাহলে তিনিও তো রাসূলের স্ত্রী হিসেবে এক বিরাট অংশের ভাগী হতে পারতেন! আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
وَمَنْوَنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার স্ত্রীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সদাকাহ।^{২১৮}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনোভাবেই ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। বরং তিনি যা সঠিক, তাই করতে সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। তিনি রাসূলের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে তার পরিবারকে না দিয়ে সেগুলো সদকা হিসেবে গণ্য করেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কারও ওয়ারিশ নেই—এই নিশ্চিত হাদীসটি শোনার পর ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার দাবী থেকে সরে আসেন। এর পরিবর্তে তিনি সত্যকে স্বীকার করে নেন এবং রাসূলের নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইবনে কুতাইবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এ বিষয়ে তর্ক করার ব্যাপারে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনো

দোষ ছিল না। কারণ তিনি এ ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশ সম্পর্কে জানতেন না। তিনি জানতেন যে, সচরাচর ছেলে-মেয়েরা তাদের পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়। একইভাবে তিনি নিজেকে এর ব্যতিক্রম ভাবেননি। কিন্তু যখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে এ ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশ জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকেন।’ আল কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও যোগ করেন, ‘যখন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা হাদীসটি জানতে পারেন এবং তার কাছে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনি তার নিজস্ব মত ত্যাগ করেন। এটা এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ ঘটনার পর আর কোনোদিন তিনি অথবা তার ছেলে-মেয়েরা কেউই কোনোদিন রাসূলের সম্পত্তির অংশ চেয়ে দাবী উত্থাপন করেননি। তারপর যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে খলীফা নিযুক্ত হন, তখনো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনেননি।

হাম্মাদ ইবনে ইসহাক লেখেন, ‘বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহে যে বিষয়টি এসেছে তা হলো, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূল এর স্ত্রীগণ (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি চেয়েছিলেন। এরপর যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য বড় সাহাবীগণ তাদেরকে لَا نُؤَرِّثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ (অর্থাৎ আমাদের নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সদাকাহ) —এ হাদীস শোনালেন, তখন তারা হাদীসটি মেনে নিলেন এবং বুঝলেন যে, এটাই সত্য। এ ব্যাপারে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনে রাজি হতেন, তাহলে তারাই বেশি লাভবান হতেন। কারণ তাদের

দু-জনের দু-মেয়ে আয়েশা এবং হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবি ছিলেন এবং তারা দু-জনই সেসব সম্পত্তির ভালো একটি অংশ লাভ করতেন। ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেয়ে তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য তারা আয়েশা, হাফসা এবং এরকম অন্যান্যদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দেননি। যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনে রাজি হতেন, তাহলে তারা শুধু পার্থিব দিক দিয়ে লাভবান হতেন না, বরং গর্ব ভরে এ কথা বলতে পারতেন যে, আমাদের কন্যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিশ (এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের আর কি আছে! এজন্য তাদের নেওয়া সিদ্ধান্ত ছিল তাদের নিষ্ঠা এবং সততারই প্রকাশ)।

কেউ কেউ এই দাবী করে থাকেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনে রাজি হননি, তখন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব রেগে যান। এ কারণে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলেননি। এটি একটি অযৌক্তিক এবং অসার দাবী। এর দু-টি কারণ রয়েছে,

এক। দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তার পিতা। পিতাকে হারিয়ে তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এর চেয়ে মর্মপীড়া আর হতে পারে না। অধিকন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। তার এই অসুস্থতা সবকিছুকে ছেয়ে ফেলেছিল। এজন্য তিনি পারিবারিক বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। আর এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করার মতো শক্তি, সামর্থ্য অথবা সময় কোনোটাই তার ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তার ভালোই জানা ছিল

যে, খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ব্যস্ততাও ছিল চরম এবং অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় জটিল সময় পার করছিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাই প্রথম তার সাথে মিলিত হবেন। এটা জানার পর ফাতিমা এমনিতেই মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ তার মৃত্যু কিছুতেই দেরিতে হবে না। বরং খুব নিকটবর্তী। একজন মানুষ যখন জানবে যে, তার মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে, তখন তার পক্ষে দুনিয়াবী ব্যাপারে আকর্ষণ থাকা অস্বাভাবিক। আল-মুহাল্লাব বলেন, ‘কেউ এ কথা বলেনি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে দেখা হয়েছে এবং তারা নিজেরা নিজেরদের মধ্যে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তারা নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে ছিলেন না। বরং ফাতিমা নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন বলেই দেখা হয়নি।’^{২১৯}

দুই। বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, যেভাবে আশ-শাবী বলেছেন যে, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার অসুস্থতার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে গেছেন। যখন তিনি তার সাথে দেখা করতে চাইলেন, তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি চাইলেন, ‘আবু বকর এসেছেন। আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে।’ ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আপনি কি তাকে আসার অনুমতি দিতে বলেন?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সান্ত্বনাসূচক কথাবার্তা বললেন যতক্ষণ না তিনি সন্তুষ্ট হলেন।’ এরপর তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আর কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সবার মনে রাখা দরকার, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, আমার কাছে আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা বেশি আনন্দের।’

^{২১৯} আবাতিল ইয়াযিব আন তুমহা মিনাত-তারিখ, পৃ. ১০৮।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতের পুরো সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্যদের পরিপূর্ণভাবে সব যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মালসহ ফাদাক এবং খন্দকের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালের অংশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই কেবল তিনি তাদেরকে ওয়ারীশ দেননি। এটাও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ীই করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের দু-জন প্রসিদ্ধ সদস্য, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন যিনি মুহাম্মাদ বাকির নামে অধিক পরিচিত ছিলেন এবং যায়েদ ইবনে আলী, নিচের উক্তি করেছেন বলে জানা যায়,

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনোভাবেই (রাসূলের কথাকে ব্যক্ত করতে) ভুল করেছেন অথবা তাতে সামান্যতম পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হয় না। রাসূলও কখনও তাকে কস্মিণকালেও ভুলের মধ্যে আছেন অথবা ভুল করতে পারেন বলে সন্দেহ করেননি।^{২২০}

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা পিতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হরানোর ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় তাকে বলেছিলেন যে, আখেরাতে তিনিই সর্বপ্রথম তার সাথে মিলিত হবেন এবং তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে,

أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

তুমি জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হবে। এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?^{২২১}

^{২২০} আল-মুরতাদা, আবুল হাসান আন-নদভী, পৃ. ৯০-৯১; নাইয আল-বালাগাহ শরহ আবুল হাদীদ।

^{২২১} আল-মুরতাদা, আন-নদভী, পৃ. ৯৪।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ১১ হিজরীর চতুর্থ রমযান সোমবার সন্ধ্যায় এ কথা বলেছিলেন। আলী ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাগরিব থেকে এশার মধ্যে ইন্তেকাল করেন। তখন তার পাশে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। যখন তার জানাযা পড়ানোর সময় হলো, তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানাযার নামায পড়াতে বললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলে উঠলেন, ‘হে আবুল হাসান, আপনি থাকতে কি আমি নামায পড়াব?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ। আপনি আগে যান। আপনি ছাড়া আর কেউ তার জানাযার নামায পড়াবে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ালেন। তাকে রাতে দাফন করা হয়েছিল।’

এক বর্ণনামতে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানাযার নামায পড়িয়েছেন এবং চারবার তাকবীর বলেছেন।^{২২২} মুসলিম শরীফের বর্ণনামতে, আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু পড়িয়েছেন বলেও জানা যায়।^{২২৩}

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্যদের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা, মহব্বত এবং সম্মানের। এটা তার এবং তাদের মর্যাদারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। বিশেষ করে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্ক এত মধুর ছিল যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক ছেলের নামই রেখেছিলেন আবু বকর।^{২২৪} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে মুহাম্মাদকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তার খুব

^{২২২} আল-মুরতাদা, আন-নদভী, পৃ. ৯৪; আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৭/২৯।

^{২২৩} সহীহ, মুসলিম (১৭৫৯)

^{২২৪} আল-মুরতাদা, আন-নদভী, পৃ. ৯৮।

দেখভালো করেন। পরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খলীফা হন, তখন তিনি মুহাম্মাদকে একটি প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এটা এমন একটি সিদ্ধান্ত ছিল যেজন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুব সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।^{২২৫}



উসামার বাহিনী এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে
আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ



প্রথম অধ্যায়

উসামা রা.-এর বাহিনী

**প্রথম। রাসূল সা. এর ইচ্ছানুসারে আবু বকর রা. কর্তৃক
উসামা রা. এর নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রেরণ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আরব উপত্যকায় দু-টি পরাশক্তি ছিল। রোমান সাম্রাজ্য এবং পার্সিয়ান সাম্রাজ্য। আরব উপত্যকার উত্তরাংশে বিরাট এলাকা জুড়ে রোমানদের রাজত্ব ছিল। এসব এলাকার শাসকরা রোম রাজার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করত। রোম সরকারই এসব শাসককে নিয়োগ দিত এবং পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখত।

রোমানরা আরবদেরকে খুব নীচু দৃষ্টিতে দেখত। তারা আরবদের এলাকা দখল করারও প্রয়োজন মনে করত না। এজন্য আরবরা একই ধর্মের অধীনে একতাবদ্ধ হচ্ছে, এ খবর পেয়ে রোমানরা ভীষণ ক্ষেপে গেল। তাদের দৃষ্টিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এ জাতিকে একটি উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। এজন্য তারা দক্ষিণ আরব উপত্যকায় আকস্মিক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর আরব উপত্যকায় শাম অঞ্চলের দেশসমূহে (সিরিয়া এবং তার চারিদিকের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ) প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দিহয়াহ কলবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে রোম সম্রাট হিরাকলের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাকলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। ব্যক্তিগত

আক্রোশে হিরাকল সত্য থেকে বিমুখ থাকে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। যদিও সকল আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিল, তবু সবার মধ্যেই রোমানদের ব্যাপারে এক অদৃশ্য শঙ্কা কাজ করছিল। রোমানদেরকে সবাই ভয় করত। সত্যিকার অর্থে রোমানরা ছিল ঐ যামানার দুই পরাশক্তির মধ্যে একটি। রোমানদের ব্যাপারে বহুল প্রচারিত এবং বিস্তৃত এই ভয়কে দমনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের অন্তরে দৃঢ়তা তৈরি করা এবং আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করে একচ্ছত্র রাজত্বের ব্যাপারে রোমানদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া। মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যে তাদের রোমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এটা প্রতিষ্ঠিত করাও আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল।

এ কৌশলের অংশ হিসেবে আরব উপত্যকার উত্তরে একটি এলাকা আক্রমণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। আরব অধ্যুষিত ঐ এলাকা রোমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অষ্টম হিজরীতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে রোমান এবং আরব খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এটা মূতা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়োগকৃত তিনজন সেনাপতিই শহীদ হয়ে যান। তারা হলেন যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু, জাফর ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। যখন শেষ সেনাপতি শহীদ হয়ে যান, তখন আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করেন। তিনি এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রায় সব মুসলিম মুজাহিদকে অক্ষত অবস্থায় মদীনা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।^{২২৬}

^{২২৬} আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ আস-সহীহাহ, আল-উমারী (২/৪৬৭-৪৭০)।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের এক বিরাট বাহিনীকে আশ-শামের (সিরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) দিকে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী তাবুক পৌছেন।^{২২৭} তবে রোমানদের সাথে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ঐ এলাকার আরব উপজাতির সাথেও কোনো লড়াই হয়নি। উপরন্তু নিকটবর্তী এলাকার শাসকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শান্তি-চুক্তি করে জিযিয়া (কর) দিতে রাজি হয়। এ অভিযানে আরও অনেক সফলতা আসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয় যার প্রেক্ষিতে রোমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে। তাছাড়া মদীনা থেকে তাবুক পর্যন্ত দীর্ঘ এবং কষ্টকর সফর করে মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যতে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আগে নবম হিজরীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাবুকে বিশ রাত অবস্থান করে মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

পরিশেষে ১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে জানান যে, তিনি মুসলিম বাহিনীকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বালকা এবং প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করবেন। এ বাহিনীতে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীরা অংশগ্রহণের নিমিত্তে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে খুব কম বয়সী যুবক উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ করেন।^{২২৮} এ ঘটনায় বড় বড় সাহাবীরা অবাক হন। আল-হাফিয ইবনে হাযার রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

^{২২৭} সহীহ, মুসলিম (৪/৪৭৮৪)।

^{২২৮} কিসসা বা'হ জাইশ উসামা, ড. ফয়ল ইলাহী, পৃ. ৮।

ইন্তেকালের দু-দিন আগে শনিবার উসামার বাহিনী রওনা হওয়ার পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়। তবে যুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতা শুরু হওয়ারও আগে। মূলত সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে রোমানদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি হতে বলেন। পরে তিনি উসামাকে এই বলে নির্দেশ প্রদান করেন যে, ‘যাও, যেখানে তোমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তোমাদের ঘোড়াগুলো দিয়ে শত্রুদের পিষে ফেল। আমি তোমাকে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলাম।’^{২২৯}

অনেকে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে কানাঘুসা শুরু করে দিল; তিনি আসলেই বয়সে ছোট ছিলেন এবং অন্যদের তুলনায় কম অভিজ্ঞ। উপরন্তু এ বাহিনীতে এমন কিছু প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে আগে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে অনেক বেশি পারদর্শিতার স্বাক্ষরও রেখেছিলেন। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এজন্য কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল, ‘কেন উসামাকে সেনাপতি নিয়োগ করা হলো?’ যা তারা বুঝতে পারেননি, সেটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়ার পর এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল না। পরে তিনি এ বিষয়টা পরীক্ষারভাবে সাহাবীদের সামনে তুলে ধরেন,

أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ
قَبْلُ وَآيُمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ
النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

তার নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনা করছ। ইতোপূর্বে
তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ।
আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি
ছিল এবং আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রদের একজন ছিল।
অতঃপর তার পুত্র আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রদের
একজন।^{২৩০}

উসামার বাহিনী অভিযানের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করার দু-দিন
পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন।
সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এ অসুস্থতা কোনো সাধারণ ঠাণ্ডা বা
জ্বর ছিল না। এটা ছিল ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যে ব্যথা তিনি
অনুভব করছিলেন, তা বেড়েই চলছিল। সবাই খুব চিন্তিত হয়ে
পড়ল। এ অবস্থা রোমানদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনায়ও প্রভাব ফেলল।
আশ-শামের দিকে যাত্রার পরিবর্তে উসামার বাহিনী জুরফ এলাকায়
ক্যাম্পিং করল। এটা মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর উসামার বাহিনী
সঙ্গত কারণেই মদীনায় ফিরে এল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে
মুসলমানদের অবস্থা পুরোপুরি বদলে গেল। আমি এখানে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে সাহাবীদের
মধ্যে শোকাভূত অবস্থার কথা বলছি না, বরং আমি বলতে চাচ্ছি,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরপর
কিভাবে আরবের পাশ্চাত্য এলাকাসমূহে মানুষজন মুরতাদ হয়ে
যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ভগ্ন নবীর অনুসারী হয়ে ঈমান
বিসর্জন দিল; আবার অনেকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাল।
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই জটিল পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে

বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের সাথে সাথে আরবের সর্বত্র ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং মুনাফিকরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আল্লাহর কসম, আমার উপর তখন এমন উদ্বেগ ও অস্থিরতা চেপে বসে যদি তা কোনো সুদৃঢ় পর্বতের উপরে পতিত হতো, তবে সে পর্বত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত। রাসূলের সাহাবীদের অবস্থা বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিতে কোনো বাগানের মধ্যে বকরি পালের যে অবস্থা হয়, তেমনি হলো।’^{২৩১}

আরবের চতুর্দিকে এত বেশি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলো যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলো, এ অবস্থায় উসামার বাহিনীকে রোমে পাঠানো ঠিক হবে কিনা। মুসলমানদের অতিরিক্ত সৈন্য-সামন্ত চাওয়ার পরিবর্তে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের তিনদিন পরই এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে বললেন যে, উসামার বাহিনীকে তার মিশন সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হতে বল। আর যারা প্রথমবার উসামার বাহিনীতে যোগদান করেছিল, তাদের মধ্যে কেউই যেন মদীনায় না থাকে। সকলেই যেন জুরফে গিয়ে উসামার বাহিনীর সাথে মিলিত হয়।’^{২৩২}

এ কথা ঘোষণার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন,

‘হে আল্লাহর রাসূলের অনুচরগণ! আমি আপনাদেরই ন্যায় একজন। যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সহজসাধ্য ছিল, সে কাজ করতে হয়তো আপনারা আমার উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাসীর উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মনোনীত করেছিলেন। তাকে সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। আমি কেবল তার একজন অনুসারী, নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই।

^{২৩১} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩০৯)।

^{২৩২} প্রাগুক্ত।

আমি যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তাহলে আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আমি বিপথগামী হই, আপনারা আমাকে সংশোধন করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে কাউকে একটি কোড়া মেরেছেন কিংবা তার চেয়েও হালকা কোনো খারাপ আচরণ করেছেন, এরূপ দাবী করার মতো একজন লোকও এ উম্মতের মধ্যে নেই। আমার পেছনে শয়তান লেগে রয়েছে। সে আমাকে বিপথগামী করার প্রয়াস পাবে। যদি সে আমাকে পেয়ে বসে, তা হলে আপনারা আমার কাছ থেকে দূরে থাকবেন। আপনাদের চুল বা গাত্রবর্ণের কারণে আমি কাউকে প্রাধান্য দেব না। সকাল-সন্ধ্যা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে আপনারা ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মৃত্যু কত দূরে, সে জ্ঞান আপনাদের নেই। সাধ্যমতো ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। মৃত্যুর নিকট নিজেকে সোপর্দ করার পূর্বের সময়টুকুকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। কেননা মৃত্যুর পর আমলের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এক জাতি ছিল যারা মৃত্যুর কথা ভুলে গাফেল হয়ে থাকে, আমলকে তারা পরবর্তীর জন্য রেখে দেয়। খবরদার, আপনারা তাদের মতো হবেন না। চেষ্টার পর চেষ্টা করতে থাকুন! নাজাত ও মুক্তির পথ অবলম্বন করুন! তাড়াতাড়ি ও দ্রুততার সাথে সৎকাজে এগিয়ে চলুন! আপনাদের পশ্চাতে সার্বক্ষণিক এক অনুসন্ধানকারী লেগে রয়েছে। এক সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে। মৃত্যুকে ভয় করুন। (মৃত) বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান ও ভাই-বন্ধু থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন।^{২৩৩}

রাবী বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবারও দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করার পর বললেন,

‘আল্লাহ তা‘আলা সেই আমল কবুল করেন না, যা তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়নি। অএব, সকল কাজ আপনারা আল্লাহর

সম্ভ্রষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে করবেন। যখন আপনারা দরিদ্র ও অভাবী ছিলেন, তখন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন! আপনাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছেন, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করুন। দেখুন, গতকাল তারা কোথায় ছিলেন আর আজ তারা কোথায়? সেইসব অত্যাচারী রাজা বাদশারা কোথায়, যাদেরকে যুদ্ধ জয়ীরূপে স্মরণ করা হয়ে থাকে? মহাকালের করাল গ্রাসে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের কৃতিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। নিকৃষ্ট পুরুষের জন্য নিকৃষ্ট নারী এবং নিকৃষ্ট নারীদের জন্য নিকৃষ্ট পুরুষই শোভনীয়। সেইসব রাজা বাদশারা আজ কোথায়, যারা পৃথিবীকে প্রাধান্য দিয়েছে ও আবাদ করেছে? অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভুলেও তাদের নাম স্মরণ করা হয় না, যেন তাদের অস্তিত্বই কোনো কালে ছিল না। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুগামী রেখে দিয়েছেন। তাদের থেকে লালসা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। তারা চলে গেছে, তারা যে আমল করে গিয়েছে, তাই তাদের সাথে গিয়েছে। দুনিয়ার অধিকারী হয়েছে অন্যরা। আমাদেরকে তাদের পরে পাঠানো হয়েছে। যদি আমরা তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করি তাহলে আমরা পরিত্রাণ পাব। আর যদি আমরা নিলুগামী হই তাহলে তাদের সমতুল্য হব। সমুজ্জ্বল সুন্দর চেহারার অধিকারী লোকেরা কোথায় গেল, যারা তাদের যৌবনের তাড়নায় মত্ত ছিল। তারা সবাই ধূলিতে পরিণত হয়েছে। তাদের বাড়াবাড়ি তাদের জন্যই অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় গেল সেইসব লোক, যারা শহর নগর তৈরি করেছিল এবং প্রাচীর দ্বারা সেগুলোর নিরাপত্তা বেঁটনী বানিয়েছিল, আর বিভিন্ন রকম বিস্ময়কর জিনিস সেগুলোর মধ্যে গড়ে তুলেছিল? সে সবই পরবর্তীদের জন্য রেখে গিয়েছে। ঐ সবই তাদের বসত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, আর তারা কবরের অন্ধকারে বন্দী।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি।
আপনি কি তাদের কারও সাড়া পান, অথবা তাদের
ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান? ^{২৩৪}

আপনাদের বাপ-দাদা, ভাই-বন্ধু যাদেরকে আপনারা দেখেছেন,
তারা আজ কোথায়? তাদের নির্ধারিত সময় খতম হয়ে গেছে।
যে রূপ কাজ তারা করেছিল সে দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে
নেওয়া হয়েছে, তাদেরই পরিণতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।
মৃত্যুর পর নিকৃষ্ট না হয় উৎকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে তারা অবস্থান
করছে। জেনে রেখ, আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়, তার কোনো
শরীক নেই। তার ও বান্দার মাঝে আনুগত্য ও হুকুম পালন
ব্যতীত এমন কোনো সূত্র নেই, যার সাহায্যে তিনি তাকে
কল্যাণ দান করবেন; আর এমন কোনো সম্পর্কও নেই, যার
ফলে তিনি তার অকল্যাণ দূর করে দেবেন। মনে রেখ,
আপনারা কেবল তার অনুগত বান্দা। তার নিকট যে সব
নেয়ামত রয়েছে তা তার আনুগত্য ছাড়া লাভ করা যাবে না।
সাবধান! আপনাদের কারও জন্য জাহান্নামও কাছে নয়, আর
জান্নাতও দূরে নয়। ^{২৩৫}

উপরের খুতবায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে
কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা পরিকারভাবে বলেছেন যে,
তিনি একজন সাধারণ মানুষ। অন্যান্য সবার মতোই (রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত) তিনি ভুল করতে পারেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
আনহু এর মধ্যে তাদের নামের কারণেই পার্থক্য ফুটে ওঠে; একজন
রাসূলুল্লাহ, আরেকজন রাসূলুল্লাহর খলীফা। একজনের নাম সরাসরি
আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যজনের নাম সরাসরি আল্লাহর
রাসূলের সাথে সম্পর্কিত। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, যে কিনা

^{২৩৪} সূরা আল-মারইয়াম, ১৯:৯৮।

^{২৩৫} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩০৫)।

ভুলের উর্ধ্বে নয়, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি কোনো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসারেই তা পরিচালিত করবেন।

খ। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তার কাজের ভালো-মন্দ যাচাই করা এবং তাকে সত্যের পথে অবিচল ও দৃঢ় রাখা জনগণের দায়িত্ব।

গ। এ খুতবায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-টি অবাক করার মতো কথা বলেছেন যা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এক, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে কাউকে একটি কোড়া মেরেছেন কিংবা তার চেয়েও হালকা কোনো খারাপ আচরণ করেছেন, এরূপ দাবী করার মতো একজন লোকও এ উম্মতের মধ্যে নেই।’ দুই, ‘আমার পেছনে শয়তান লেগে রয়েছে। সে আমাকে বিপথগামী করার প্রয়াস পাবে। যদি সে আমাকে পেয়ে বসে, তা হলে আপনারা আমার কাছ থেকে দূরে থাকবেন।’

এ কথাগুলো বলার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে চেয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা ভুল থেকে নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি কারও সাথে সামান্যতম ভুল করেননি। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ নিশ্চয়তা ছিল না। তাকে ভুল থেকে নিরাপদ রাখা হয়নি। এজন্য কারণবশতঃ রাগের সময় তিনি কারও সাথে মন্দ আচরণ করে ফেলতে পারেন - রাগের সময়ই মানুষ অন্যের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রাখে। এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে সতর্ক করার পাশাপাশি তাকে সাহায্য করারও অনুরোধ করেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন এই বলে যে, রাগের সময় তার থেকে যেন তারা দূরে থাকে। ফলে তিনি কারও ক্ষতি করা থেকে বেঁচে যান।

এ কারণেই তিনি রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করতে বলেছেন এবং সুন্নাতের সঠিক অনুসরণই কারও সামান্যতম ক্ষতি করা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, অন্যান্য সবার মতো তাকেও শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। যদিও আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেকের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন এবং জিনদের থেকে একজন সঙ্গী বানিয়েছেন।^{২৩৬} মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্ত প্রবাহের মতো চলাচল করতে পারে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেকের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন এবং জিনদের থেকে একজন সঙ্গী বানিয়েছেন।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনারও কি তাই?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন,

وَأَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَنَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ

আমারও। তবে আল্লাহ আমাকে তাকে জয় করার তাওফিক দিয়েছেন (জিন জাতি থেকে সঙ্গীর উপর)। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন যা ভালো, তারই দিকে সে আহ্বান করে।^{২৩৭}

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, একদিন রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সাথে নিয়ে হাঁটছিলেন। তখন দু-জন আনসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হাঁটা বন্ধ

^{২৩৬} আবু বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ মাআলুল্লাহ, পৃ. ১৯৬।

^{২৩৭} সহীহ, মুসলিম (৪/২১৬৭, ২১৬৮)।

করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন, ‘থাম। আমার সাথে সাফিয়া বিনতে হওয়াই।’ তারপর বললেন,

‘আমার ভয় হচ্ছে যে, শয়তান তোমাদেরকে প্ররোচনা দিবে (উদাহরণস্বরূপ, শয়তান তোমাকে এ চিত্তায় ফেলে দিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অপরিচিত মহিলার সাথে হাঁটছেন)। বস্তুত, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্ত প্রবাহের মতো চলাচল করে।’^{২৩৮}

মোটকথা, এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে চেয়েছেন যে, তিনি শয়তানের হাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো নিরাপদ ছিলেন না। নিঃসন্দেহে এটা তার জন্য, রাসূলের সব সাহাবীদের জন্য এবং দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য সত্য।^{২৩৯}

ঘ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব খুতবাতেই মুসলমানদেরকে নসীহত করতেন এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। উপরের খুতবাতেও তিনি এমন সব মানুষের কথা আলোচনা করেছেন যারা এক সময় দুনিয়াতে ছিল, তারপর মারা গেল এবং নিজেদের আমল ছাড়া আর কিছুই তারা নিয়ে যেতে পারেনি। এখানে বক্তৃতার ধরণ, বিস্মৃত মানুষের প্রতিচ্ছবি চিত্রায়ন এবং ভাষা-শব্দের ব্যবহার দেখলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন ভালো বক্তা ছিলেন। সত্যিকার অর্থে এটা নির্দিধায় বলা যায় যে, তিনি সকল নবীর সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। তার মধ্যে অনেক কথা অল্প কয়েক শব্দে বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তার প্রসিদ্ধ কয়েকটি উক্তি হচ্ছে,

‘মৃত্যুকে স্মরণ কর। তাহলে তোমাকে জীবন দেওয়া হবে।’

^{২৩৮} সহীহ, বুখারী (৪/১২৪)।

^{২৩৯} আবু বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ মাআলুল্লাহ, পৃ. ১৯৭।

‘সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আমানত রক্ষা করে এবং সবচেয়ে মিথ্যাবাদী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আমানত খেয়ানত করে।’

‘ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। আর ঈমানই মুক্তি।’

এগুলো এমন একজন মানুষের কথা যিনি নিজে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যিনি তার হিকমতকে অতি সংক্ষেপে সামান্য কিছু শব্দে প্রকাশ করতে পারতেন। কথার ফুলঝুরি, বিস্তারিত বর্ণনা হয়তো কবিতা অথবা সাহিত্যের জন্য ঠিক থাকতে পারে, কিন্তু খুতবায় বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপনের সুযোগ নেই। কম শব্দে বিশাল কোনো তথ্যকে ব্যক্ত করতে পারলেই সেটা অনন্য খুতবায় পরিণত হয়। বর্তমান যামানায় কোনো প্রসিদ্ধ স্কলারের এক ঘণ্টার খুতবা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দশ মিনিটের বক্তব্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদিও এখন অনেকে দাবী করেন যে, এ যামানার মানুষের জন্য কুরআনের আয়াত বা হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এজন্য খুতবা দীর্ঘ হতে হবে। যদিও এটার যৌক্তিক কারণ রয়েছে, তথাপি খুতবা অবশ্যই অতি কখন থেকে মুক্ত হতে হবে। নতুবা খুতবার আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খুতবা থেকে দাঁড়ি এবং ইমাম সকলের জন্যই একজন ভালো এবং উপকারী বক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

দুই। উসামার বাহিনীর ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

কিছু সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই বলে পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন উসামার বাহিনীকে অভিযানে না পাঠান এবং এ বাহিনীর সকল সদস্যকে মদীনার কাছাকাছি যে কোনো বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রাখেন। মুসলমানদের বেশিরভাগেরই এ মত ছিল। তাদের যুক্তি হলো, ‘এ সংকটময় মুহূর্তে যখন দেশের

অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্র বিদ্বেষের ও নানা জাতীয় ফেৎনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, এখন এক দল মুসলিম সেনাদলকে যুদ্ধের জন্য বাইরে প্রেরণ করা ঠিক হবে না।^{২৪০} রাসূলের সব সাহাবীরা এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গত কারণেই তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মদীনার মুসলমানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ধর্মত্যাগ করা কোনো ছোটখাট বিষয় ছিল না, বরং তা সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল এবং কঠিন সমস্যার আকার ধারণ করল। মদীনা সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো এবং সকল মুসলিম যোদ্ধাদের তা প্রতিহত করার প্রয়োজন দেখা দিল। এমন বিপদময় পরিস্থিতিতে নিজ ভূমিকে রক্ষা না করে বিদেশী শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়াকে কেউ সঙ্গত মনে করল না।

এটা সত্য যে, উসামার বাহিনী যুদ্ধে প্রেরণ না করার পেছনে তাদের সব যুক্তির ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে বসেছিল: রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য উসামার নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠানোর আদেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ আদেশ যদি অন্য কেউ দিত, তাহলে অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অভিযান ত্যাগ করতেন এবং এ বাহিনীকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিতেন। কিন্তু পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করেও তার অন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামার বাহিনীর কাছ থেকে যে প্রাপ্তি আশা করেছিলেন, তার বিপরীত কিছু করতে রাজি হলো না। সুতরাং তিনি রাসূলের সব সাহাবীদের মতের বিরুদ্ধে একাই উসামার বাহিনীকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণের নির্দেশে অটল থাকলেন।

জুরফে ক্যাম্পিং-এ থাকা অবস্থায় উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীর সকল সদস্যকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসতে চাইলেন। এজন্য খলীফার অনুমতির প্রয়োজন ছিল। তিনি এ কাজে তার পক্ষ

থেকে উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায প্রেরণ করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তার বার্তা ছিল এরকম : ‘আমার বাহিনীতে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ মুসলমানরাই নন, বরং অধিকাংশ মুসলমানই রয়েছেন। আমি রাসূলের খলীফা, রাসূলের শহর এবং তার অধিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। আমার ভয় হয়, কাফেররা সবাইকে আক্রমণ করবে।’^{২৪১}

কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনীকে রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখার পক্ষেই ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে কিছুতেই তিনি বিচ্যুত হতে চাননি। রাসূলের সাহাবীরা তাকে খুব অনুনয়-বিনয় করে পরামর্শ দিচ্ছেলেন যেন তিনি তার মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তিনি সত্যের উপর আছেন। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সাহাবীর বক্তব্য না শুনেও তিনি পারছিলেন না। তিনি সবাইকে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এজন্য একটি বৈঠকের আহ্বান করা হলো। সব মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদেরকে তিনি দাওয়াত দিলেন। বৈঠকে রাসূলের সাহাবীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর অবস্থানে ছিলেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের খলীফা, মদীনা শহর এবং সব অধিবাসীদের নিয়ে তিনি খুব শঙ্কিত ছিলেন। তার ভয় ছিল ধর্মত্যাগীরা হয় মুসলমানদেরকে বন্দী অথবা ধ্বংস করে ফেলবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনলেন। যখন বৈঠক শেষ হয়ে গেল, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

অন্যান্য সাহাবীদেরকেও তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দিতে চাইলেন। এজন্য আরেকটি বৈঠক আহ্বান করা হলো। এবার এর স্থান নির্ধারণ করা হলো মসজিদে নববী। এ বৈঠকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে উসামার বাহিনীর অভিযানকে বাতিল করার চিন্তাকে পরিহার করতে বললেন। কারণ এ বাহিনী প্রেরণের পরিকল্পনাসহ সকল ব্যবস্থাটি সম্পন্ন করেছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বললেন, যদি এ বাহিনী প্রেরণ মুরতাদ বেদুইন আরবদের দ্বারা মদীনা গ্রাস হওয়ার কারণও হয়, তবুও তিনি এ বাহিনী প্রেরণ করেই ছাড়বেন। আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন যে, উসামার বাহিনী তিনি প্রেরণ করবেনই যদিও ধর্মত্যাগীরা মদীনা অবরুদ্ধ করে ফেলে। তিনি দাঁড়িয়ে সকল সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য দিলেন :

আল্লাহ তা'আলার শপথ! হিংস্র জন্তুসমূহ যদি আমার দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তবুও আমি উসামার বাহিনীর সিরিয়া অভিযান বন্ধ করব না। আর যদি এ শহরে আমি ছাড়া আর একজন লোকও না থাকে, তবুও আমি এ বাহিনী প্রেরণ করবই।^{২৪২}

হ্যাঁ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারী এবং সঠিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ বাস্তবায়ন করাই ছিল স্বাভাবিক। আর বাস্তবিকভাবেই তার সিদ্ধান্ত অনেক ফলপ্রসূ হয়; এ সিদ্ধান্ত মুসলমানদের পক্ষে যায়। তারা তাদের সব শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও অনেক আনসার সাহাবী উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন

করেন। তারা তার পরিবর্তে অধিক বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কাউকে সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য বিষয়টি খলীফার কাছে পেশ করার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আনসারদের পক্ষ থেকে উসামার পরিবর্তে একজন প্রবীণ ও বয়স্ক কাউকে সেনাপতি নিয়োগের দাবী আসছে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শেষ হতে না হতেই আবু বকর যেখানে বসা ছিলেন সেখান থেকে লাফ দিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দাড়ি ধরে বললেন (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থে খুব রেগে গিয়েছিলেন), ‘হে খাতাবের পুত্র! আল্লাহর রাসূল যাকে এই অভিযানের জন্য অধিনায়ক নিযুক্ত করে গেছেন, তাকে পদচ্যুত করার জন্য তুমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ?’^{২৪৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে সেখান থেকে ফিরে এলেন। আনসার সাহাবীরা তার জন্য বাইরে অপেক্ষমাণ ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি করলেন?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে জবাব দিলেন, ‘যাও, ভাগ। তোমাদের জন্য আমি খলীফার কাছে কিস্তাবেই না লজ্জিত হলাম!’^{২৪৪}

পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনীকে বিদায় জানানো এবং তাদের সাথে কিছু পথ পদব্রজে হাঁটার জন্য মদীনা থেকে রওনা হলেন। জুরফে উসামার বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। উসামার বাহিনী অভিযানে রওনা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে কিছু পথ হেঁটে চললেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরের বাহন টেনে নিচ্ছিলেন। উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় আরোহণ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি আবু বকরের দিকে ফিরে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! হয় আপনি বাহনের উপর আরোহণ করুন, আর না হয়

আমাকে বাহন থেকে নেমে আপনার সাথে হাঁটার অনুমতি দেন।’
আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, তুমি বাহন
থেকে নামবে না। আমিও বাহনে আরোহণ করব না। কিছুক্ষণের
জন্য আমার পদদ্বয়কে আল্লাহর রাস্তায় ধূলি মাখাতে দাও।’^{২৪৫}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি উসামার পাশে হাঁটছিলেন, তখন একটি
বিষয় তাকে ভাবিয়ে তুলল। উসামার বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন
উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে
বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনের কথা অকপটে
বলতে পছন্দ করতেন। আরব উপত্যকায় ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়ানোর জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে উমর
রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যে কোনো সময়ের চেয়ে এ সময় খুব
প্রয়োজন ছিল। যে কোনো কারণেই হোক, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
আনহু উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘তুমি যদি ভালো মনে
কর, তাহলে শাসনকার্যচালনায় আমাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে
উমরকে মদীনায় থাকতে অনুমতি প্রদান করতে পার।’ উসামা
রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার এ প্রস্তাবে আনন্দের সাথে সম্মতি
দিলেন। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের দিকে ফিরে
বললেন, ‘হে লোকসকল! থাম। দশটি বিষয়ে আমাকে নসীহত
করার সুযোগ দাও। এগুলো আমার কাছ থেকে মুখস্থ করে নাও :

- ✓ কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর না।
- ✓ আমানতে খেয়ানত কর না।
- ✓ প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।
- ✓ শত্রুপক্ষের কোনো নিহত ব্যক্তির অঙ্গ ছেদন করে আকৃতি
বিকৃত কর না।

- ✓ খেজুরগাছ বা যে কোনো রকমের ফলবান বৃক্ষ উপড়ে, কেটে বা পুড়িয়ে দিও না।
- ✓ খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত কারও ছাগল, গরু কিংবা উট ইত্যাদি হত্যা কর না।
- ✓ পশ্চিমধ্যে বা তোমাদের গন্তব্য স্থানে গির্জা, মন্দির বা উপাসনালয়ে সর্বদা উপাসনারত লোকদের বিরক্ত কর না - তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় থাকতে দিও।
- ✓ কেউ তোমাদের খাদ্যদ্রব্য দান করলে বিসমিল্লাহ বলে তা খাওয়া শুরু করবে।
- ✓ তোমাদের সাথে এমন লোকদের সাক্ষাৎ হবে যারা মাথার মধ্যস্থল মুড়িয়ে মাথার চারিদিকে চুল রাখে, তাদের মস্তক কেটে ফেলবে।
- ✓ আর তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুদের সাথে লড়াই করবে।

যাও, এখন আল্লাহর নামে যাত্রা কর।’^{২৪৬}

মুজাহিদ বাহিনীকে উপদেশ দেওয়ার পর তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে যেভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে সব কাজ সম্পন্ন করবে। তাই কাযা’আ এলাকার উপর প্রথম আক্রমণ করবে এবং তারপর আবিল (বর্তমানে এটা জর্ডানের দক্ষিণে অবস্থিত)। সুতরাং রাসূল যেসব কাজ করতে বলেছেন, তার কোনোটাতে অবহেলা করবে না। (ফিরে আসার জন্য) তাড়াহুড়ো করবে না। বরং (ফিরে আসার আগে) নিশ্চিত করবে যেন তার সব আদেশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়।’^{২৪৭} তারপর উসামা তার বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

^{২৪৬} তারিখ আত-তাবারী (৪/৪৬)।

^{২৪৭} প্রাগুক্ত (৪/৪৭)।

উসামা যখন তার গন্তব্যে পৌঁছলেন, তিনি তার ঘোড়সওয়ারদের কাযা'আ এবং আবিল এলাকার উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। এ অভিযানে অকল্পনীয় সাফল্য আসে। উসামা এবং তার বাহিনী তাদের মিশন সম্পন্ন করে। পুরো অভিযানে তার সৈন্যরা অক্ষত থেকে প্রচুর গণীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। শাম যাওয়া-আসাসহ পুরো অভিযান সম্পন্ন করতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়।

রোম সম্রাট হিরাকল একই পত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদ এবং উসামার বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়েছিল। রোমানরা তাদের ভূমিতে এ পুরোদস্তুর দুঃসাহসিক অভিযানে হতভম্ব হয়ে গেল। বিস্ময়ে তারা বলে উঠল, ‘তাদের কি হলো? তাদের সাথীর মৃত্যু হয়েছে আর তারা এসে আমাদের ভূমিতে আক্রমণ করছে!’^{২৪৮} আর ঐসব এলাকার আরবরা বলল, ‘তারা যদি শক্তিশালী না হতো, তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে এ বাহিনীকে পাঠাত না।’

এভাবে আরব খ্রীস্টান এবং রোমানরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো যে, মুসলমানরা প্রচণ্ড শক্তিদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ একই সময় আবু বকর এবং বাকি মুসলমানরা আরব উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করছিলেন। রোমানদের মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে, তাতে তারা আগে যেভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য উদগ্রীব ছিল, তা প্রশমিত হয়ে আসে।^{২৪৯}

এ ঘটনা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামা বাহিনীকে রোমানদের আক্রমণ করতে পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

^{২৪৮} আহদ আল-খুলাফা আর-রাশেদীন, যাহাবি, পৃ. ২০।

^{২৪৯} আল-কামিল, ইবনে আসীর (২/২২৭)।

তিন। উসামা রা.-এর বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং উপদেশ

১। কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং তা ঈমানদারদের সিদ্ধান্তকে দুর্বল করতে পারে না।

কত বিস্ময়কর পরিবর্তন, আশ্চর্যজনক ওলট-পালট এবং কতই না দ্রুত এ পরিবর্তন! ঐ সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি আমাদের জীবনে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ

তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।^{২৫০}

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না
এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।^{২৫১}

চিন্তা করুন, নবম হিজরীতে কিভাবে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা দলে দলে অনুগত হয়ে তাদের গোত্রের পক্ষে ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য মদীনায় রাসূলের সাথে দেখা করার জন্য আগমন করেছে। এত বেশি প্রতিনিধি এসেছে যে, সেই বছরের নামকরণই হয়ে গেছে, ‘প্রতিনিধিদলের বছর’। এখন মাত্র দু-বছর পরেই আরবরা ধর্মত্যাগ করে তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছে এবং মুসলমানদের আক্রমণ করার মতো ভীতি সঞ্চার করেছে। মনে হয় তারা ইসলামের রাজধানী মদীনা দখল করে নেবে! নবম হিজরীতে এবং রাসূলের ইত্তেকালের পরে মুসলমানদের অবস্থা অবলোকন করে কারও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তা‘আলা যে

^{২৫০} সূরা আল-বুরুয, ৮৫:১৬।

^{২৫১} সূরা আশ্বিয়া, ২১:২৩।

শাশ্বত নিয়মে এ জগৎ পরিচালনা করছেন, তাতে কোনো জাতির অবস্থা বছরের পর বছর একই অবস্থায় রাখেন না। যে কোনো জাতি সহজ এবং স্বাভাবিক সময় উপভোগ করার পরই কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয় এবং এর উল্টোটাও সত্য। আজ যে জাতি বিত্ত-বৈভবের অধিকারী, কালই হয়তো সেটা আরেকজনের হাতে চলে যেতে পারে। এভাবেই জগতে রাজার পর রাজা এসেছে, চলে গেছে। যদি কেউ রাজার আসনে বসে, তাহলে অবশ্যই তার একদিন পতন হবে। রাজার কখন পতন হবে - এটা কখনই আলোচ্য বিষয় না, বরং আল্লাহ কখন তার পতন ঘটাবেন, সেটাই আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ বলেন,

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।^{২৫২}

আর-রাযি তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে লেখেন, ‘আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর সময় বিভিন্ন মানুষের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। মানুষজনের সুখ যেমন স্থায়ী হয় না, তদ্রূপ তাদের কষ্টও স্থায়ী হয় না। আজকে যার আনন্দ এবং যার শত্রুর জন্য বিষাদ, পরবর্তী দিন তার ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। একদিন তার শত্রুকে কষ্টে নিপতিত দেখে খুশি; কিন্তু অন্য কোনো দিন এর বিপরীত সত্য হয়ে উঠবে।’^{২৫৩} আল-কাযী আবুস-সউদ বিষয়টি এভাবে বলেছেন,

نُدَاوِلُهَا

‘আমি বদলাতে থাকি।’ এ আয়াতে শব্দটি বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ কোনো কিছু স্থায়ীভাবে পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকে। কারণ আল্লাহ সব যুগে এবং সব শতাব্দীতে মানুষকে পালাক্রমে নেয়ামত দিয়ে থাকেন। এটা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল জাতির জন্য প্রযোজ্য।^{২৫৪}

^{২৫২} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪০।

^{২৫৩} তাফসীর আর-রাযি (৯/১৫)।

^{২৫৪} তাফসীর আবু আস-সউদ (২/৮৯); রুহুল মা‘আনী, আল-আলুসী (৪/৬৮)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ জাগতিক নিয়ম ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি সাময়িক এ পরিবর্তনে নিজেকে গুটিয়ে নেননি। বরং তিনি নিজে সবার করেছেন এবং অন্যকে এদিকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর কাছ থেকে রহমতের আশা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।^{২৫৫}

মুমিনদের এ কথা মনে রাখা উচিত, কষ্ট যত বড়ই হোক না কেন, মুসীবত যত বেশি যাতনাদায়ক হোক, আল্লাহর শাস্ত নিয়ম যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।^{২৫৬}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যেমন করে তিনি পরিকারভাবে নিম্নোক্ত হাদীসের অর্থ বুঝেছিলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজেই তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

^{২৫৫} সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৬।

^{২৫৬} সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৫-৬।

করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ
পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য
মঙ্গলময় হয়।^{২৫৭}

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী প্রেরণ করা
থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি তা এই যে, কষ্ট ও মুসীবত যত
বড় ও ভয়াবহ হোক না কেন ঈমানদারকে দীনি করণীয় থেকে
বিরত রাখতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
মৃত্যু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দীনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে
বাধা হয়নি। মুসলমানদের জন্য এক কঠিন বিপদের পরিস্থিতিতে
তিনি উসামার বাহিনীর প্রেরণ করার আদেশ থেকে পিছপা হননি।
আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
থেকে যা শিখেছিলেন, তা হলো, সবকিছুর উপর দীনকে প্রাধান্য
দিতে হবে। তার জীবনাবসান হওয়া পর্যন্ত তিনি এ নীতিতে অবিচল
ছিলেন।

২। কারও মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি থেমে যায় না এবং রাসূল
সা.-এর সূনাতকে অনুসরণের গুরুত্ব

উসামার বাহিনী প্রেরণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু
মুসলমানদেরকে একটি পরিকার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন : রাসূলের
মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি অবশ্যই থেমে থাকা উচিত না এবং থেমে
থাকবে না। অথবা এভাবে বলা যায়, ইসলামের উন্নতি কোনো
ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। এটা চিরন্তন সত্য যে, যদি
কোনো নেতা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আরেকজন নেতৃত্ব গ্রহণ
করে। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল
ইন্তেকাল করেছেন, এটা সারা মুসলিম জাহানের জন্য ছিল সবচেয়ে
কষ্টকর অধ্যায়, ভবিষ্যতেও মুসলমানরা এরকম দুঃসহ অবস্থার
মুখোমুখি হবে না, কিন্তু তার মৃত্যু কখনই বোঝায় না যে,
মুসলমানরা এখন আর অন্যদের কাছে ইসলামের বার্তা প্রচার-প্রসার

করবে না। বরং রাসূলের মৃত্যুতে মুসলমানদের উপর আগের চেয়ে আরও বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন না, এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাদের উপরই ছিল—সারাবিশ্বের মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দেওয়া। এটা অনুধাবন করেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শোকে মুহ্যমান হয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকেননি। বরং মাত্র তিন দিন পরেই উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করে তিনি এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা এ কারণে সাহসী সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাতে তিনি এবং মদীনার মুসলমানরা ধর্মত্যাগীদের দ্বারা আক্রমণের স্বীকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার মধ্যে ছিলেন। সবাই তার কাছে বাইআত গ্রহণ করার পর তিনি এক ভাষণে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, তিনি ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ে চেষ্টা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক রেওয়াতে পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন,

‘হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলামকে আঁকড়ে ধর। আল্লাহর উপর বিশ্বস্ত থাক। কারণ আল্লাহর ধর্মই পৃথিবীতে টিকে থাকবে এবং আল্লাহর কথা পরিপূর্ণ। অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে সাহায্য করে এবং তার মনোনীত ধর্মের জন্য আত্মাণ চেষ্টা-সাধনা করে। আল্লাহর কসম, আমরা এ চিন্তা করি না যে, আমাদেরকে কতজন আক্রমণ করতে এল, আল্লাহর তরবারিগুলো উন্মুক্ত এবং আমরা সেগুলো খাপে বন্দী করে রাখিনি। যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই যাব যেভাবে আমরা রাসূলের পাশে থেকে লড়াই করেছি। যে কেউ মন্দ কাজ করে, সেটা তার নিজের উপরই বর্তাবে।’^{২৫৮}

আরেকটি কারণে উসামার বাহিনী প্রেরণ করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তা এই যে, শান্তি এবং যুদ্ধ—উভয় অবস্থায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকে অুনসরণ করা। উসামার বাহিনী প্রেরণ

করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐকান্তিকভাবে রাসূলের আদেশকে মেনে চলারই চেষ্টা করেছেন। তার এবং মুসলমানদের সম্মুখে যে বিপদের আশঙ্কা ছিল, তা উপেক্ষা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলের নির্দেশকে বাস্তবায়ন করা। এ বাহিনী পাঠানো উচিত কি উচিত না—এ ব্যাপারে যত আলোচনা হয়েছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বারবার কথায় এবং কর্মে এ বিষয়টির দিকেই অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাই শিরোধার্য এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নের উদাহরণসমূহ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ক। ধর্মত্যাগীদের কারণে যখন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উসামার বাহিনীকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিল, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার শপথ! হিংস্র জন্তুরাও যদি আমার দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তবুও আমি উসামার বাহিনীর সিরিয়া অভিযান বন্ধ করব না। আর যদি এ শহরে আমি ছাড়া আর একজন লোকও না থাকে, তবুও আমি এ বাহিনী প্রেরণ করবই।’^{২৫৯}

খ। উসামা যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন এবং মদীনার অধিবাসীদেরকে নিয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং এজন্য জুরফ থেকে মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রাসূলের নির্দেশকে মানার চেয়ে নিজের বেঁচে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার আচরণে, কথায় এবং কর্মে কুরআন মাজীদের এই আয়াতেরই প্রতিধ্বনি ছিলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হলো।^{২৬০}

গ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক গঠিত উসামা বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারেই শুধু অনড় ছিলেন না, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সেনাপতি নির্বাচিত করেছিলেন, তারই নেতৃত্বে এ বাহিনী প্রেরণ করতে চেয়েছেন। আনসার সাহাবীদের পরামর্শে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রবীন একজনকে সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপারে অনুরোধ করলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ড রাগ হলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এরকম কোনো অনুরোধ করতে পারে। আবু বকর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দাঁড়ি ধরে বলেন, ‘হে খাণ্ডাবের পুত্র! আল্লাহর রাসূল যাকে এই অভিযানের জন্য অধিনায়ক নিযুক্ত করে গেছেন, তাকে পদচ্যুত করার জন্য তুমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ?’^{২৬১}

ঘ। রাসূল জীবদ্দশায় যা কিছু করেছেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেহেতু ছোট ছোট সুনুতের ব্যাপারেও বিস্তারিত জানতেন, এজন্য খলীফা হওয়ার পর তা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। মূলত খেলাফতকালে তিনি যা করেছেন, তা সবই ছিল রাসূলের

^{২৬০} সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৬।

^{২৬১} তারিখ আভ-তাবারী (৪/৪৬)।

পরিপূর্ণ অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উসামার সৈন্যবাহিনীকে তাদের সাথে কিছু পথ পায়ে হেঁটে বিদায় দিয়েছিলেন। রাসূল যখন মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামেন পাঠিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে তিনি তাকে বিদায় দিয়েছিলেন। মু'আয যখন তার মিশনে মদীনা থেকে রওনা হয়েছিলেন, তখন রাসূল তার পাশে কিছু পথ হেঁটে হেঁটে তাকে কিছু নসীহত করেছিলেন। মু'আয বাহনের উপর বসা ছিলেন, আর রাসূল পায়ে হাঁটছিলেন।^{২৬২} এ ঘটনার ব্যাপারে শায়েখ আহমাদ আল-বান্নাহ বলেন, 'আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একই আচরণ করেন, যদিও উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বয়সে খুব ছোট ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ঠিক আগে উসামাকে সেনাপতি বানিয়েছিলেন। কিন্তু উসামা রাসূলের ইন্তেকালের পরে এ অভিযান সম্পন্ন করেন। তাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পায়ে হেঁটে তাকে বিদায় জানান এবং তখন উসামা বাহনের উপর বসা ছিলেন। এটা করার পেছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যেরকম করেছিলেন, সেটার অনুসরণ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।'^{২৬৩}

ঙ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনীর সৈন্যদের বিদায় জানানোর সময় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন। এটা ছিল রাসূলের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পূর্বে তাদেরকে নসীহত করতেন। আরও লক্ষ্যণীয় এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যেসব নসীহত করতেন, প্রায় একই কথা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনীকে বলেছেন।^{২৬৪}

^{২৬২} আল-ফাতহ আর-রব্বানি লি-তারতিব মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানি (২১/২১৫)।

^{২৬৩} বুলগ আল-আমানী (২১/২৫)।

^{২৬৪} কিসসা বা'হ আবু বকর জাইশ উসামা, পৃ. ৩২।

উসামার বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে আমলে এবং কথায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরোপুরি রাসূলের অনুসরণ করেছেন এবং উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে একই পরিকল্পনা অনুসরণ করতে বলেছেন যা তাকে রাসূল অন্তিম মুহূর্তে বলে গিয়েছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে যেভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে সব কাজ সম্পন্ন করবে। তাই কাযা’আ এলাকার উপর প্রথম আক্রমণ করবে এবং তারপর আবিল (বর্তমানে এটা জর্ডানের দক্ষিণে অবস্থিত)। সুতরাং রাসূল যেসব কাজ করতে বলেছেন, তার কোনোটিতে অবহেলা করবে না।’ আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, ‘হে উসামা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে দিকে যে গোত্রকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে দিকেই রওনা হও। তাই ফিলিস্তিনের দিকে যাও এবং মৃত্যুর লোকদের উপর আক্রমণ কর। তুমি যাদেরকে পেছনে ফেলে যাচ্ছ, তাদের জন্য চিন্তা কর না। আল্লাহ তাদের উপর আছেন।’^{২৬৫}

এটা সত্য যে, শুরুতে সাহাবীরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে না পারলেও পরে তাকে ঠিকই অনুসরণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ খুলে দিয়েছিলেন, ফলে তারা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সঠিক এবং যতই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক না কেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যই আসল। সিদ্ধান্ত তাদের মতের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু সেটাই তাদেরকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করেছে; যারা মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন, তারা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আগ্রাণ লড়েছেন এবং উসামা বাহিনীর সৈন্যরা জরুরী ভিত্তিতে যুদ্ধ জয়ের জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়েছে। কারণ তাদের মধ্যে বিজয়ী হয়ে ফিরে মুসলমানদের সাথে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল।

তাদের দৃঢ় ঈমান এবং আচরণের জন্য আল্লাহ তাদের জন্য যেমন অনেক গণিমতের মাল লাভ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন, তেমনি শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন।
পাশ্চাত্যের স্কলার থমাস আরনল্ড উসামার বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনীকে শাম দেশে অভিযানে প্রেরণ করেন যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই বাহিনীকে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। আরবে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং মুসলমানদের অমত সত্ত্বেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বাহিনী প্রেরণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিপক্ষকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, ‘আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা আগেই রাসূল দিয়ে গিয়েছেন এবং চিল-কাকও যদি আমার দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তবুও আমি রাসূলের নির্দেশমতো উসামার বাহিনীর সিরিয়া অভিযানে পাঠাব।’ এটাই পরে অনেক সফল সামরিক অভিযানের মধ্যে প্রথম অভিযান ছিল যেখানে সিরিয়া, পারস্য এবং আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলকে টার্গেট করা হয়েছিল। সেসব অভিযানের প্রেক্ষিতে মুসলমানরা পারস্য সম্রাটকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে সক্ষম হয় এবং রোমানদের কাছ থেকে কিছু উর্বর এবং সম্পদশালী অঞ্চল দখল নিয়ে নেয়।^{২৬৬}

খেলাফতের শুরু থেকেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন যে, বিজয় নির্ভর করে কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই। যে সব মুসলমানরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন এবং জমিনে শান্তির ফায়সালা করেছেন। আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেনি, তখনই অপমান এবং লাঞ্ছনার পরাজয় দিয়েছেন।^{২৬৭}

৩। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যই কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী মীমাংসা করতে হবে

উসামার বাহিনী প্রেরণ করা ঠিক কি ঠিক না—এ বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে যে মতভেদ হয়েছে, তা আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। হ্যাঁ, এক পর্যায়ে তারা একে অন্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে; কিন্তু কুরআন এবং হাদীসের আলোকে তারা এর দ্রুত মীমাংসা করতে সক্ষম হয়েছে। রাসূলের ইত্তেকালে পর এক কঠিন মুহুর্তে তারা শুধু উসামার বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি, বরং উসামার নেতৃত্ব নিয়েও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। তারা এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু এই মতপার্থক্যের কারণে তারা একে অন্যকে ঘৃণা করেননি অথবা নিজেরা মারামারিতে লিপ্ত হয়ে যাননি, এমনকি তারা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করেননি। আর যারা এ বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তের উপর ছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিকারভাবে তা উপস্থাপন করার পর তা মেনে নিতেও দ্বিধা করেননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন যে, এটা কিছুতেই তার বর্জন করা ঠিক হবে না যে কাজ স্বয়ং রাসূল করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন এবং ঐ নেতাকেও অপসারণ করা ঠিক হবে না যাকে স্বয়ং রাসূল নির্বাচিত করেছিলেন, তখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে।

তাদের এ মতপার্থক্য আরও একটি বিষয় শিক্ষা দেয় যে, ইসলামী আইনের ব্যাপারে একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি হচ্ছে, কোনো বিষয়ে বেশিরভাগ লোকের মতই সঠিক নয়; ভিন্ন কথায়, কোনো বিষয়ে

বেশিরভাগ উলামাদের সিদ্ধান্ত যে ঠিক হবে, এটা সবসময় সত্য নাও হতে পারে। এখানে বেশিরভাগ সাহাবীরা (এর মধ্যে ইসলামের অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীও ছিলেন) উসামার বাহিনী ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেই মত দিয়েছিলেন। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ধর্মত্যাগীরা মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে এবং স্বদেশ রক্ষা না করে এ মুহূর্তে বিদেশে সৈন্য পাঠানো ঠিক হবে না।^{২৬৮} এ মতামত কোনো সাধারণ মানুষেরা দেয়নি, বরং এমন সব শ্রেষ্ঠ মানুষের মতামত ছিল যারা ছিলেন রাসূলের সাহাবী এবং এ পৃথিবীতে নবী-রাসূলের পরে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। রাজনৈতিকভাবে এটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মেনে নেওয়া অনেক নিরাপদ ছিল, কিন্তু তিনি এমন ভুল করতে চাননি যেটা যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে কঠিন সমালোচনা সৃষ্টি করবে। এজন্য তিনি ইশারা করেছেন যে, রাসূলের নির্দেশ মানাই সবার মতামতের চেয়ে বেশি দামী। এ বিষয়ে সংখ্যালঘু—যতদূর আমরা জানতে পারি, একমাত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু—সঠিক ছিলেন। একইভাবে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন সাংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীরা মনে করেছে যে, তিনি ইন্তেকাল করেননি। আর সংখ্যালঘু সাহাবীরা যার মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন মনে করেছেন যে, রাসূল সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। সাংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীরা ভাবাবেগের উপর নির্ভর করেছেন, আর সংখ্যালঘুরা কুরআনের উপর আমল করেছেন। যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।^{২৬৯}

ফতহুল বারি কিতাবে হাফিজ ইবনে হাযার উপরের ঘটনার সাথে প্রথমে উল্লেখিত মূলনীতির মধ্যে একটি চমৎকার সম্পর্ক তৈরি করেছেন: ‘শরীয়তের কোনো বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন সংখ্যালঘু উলামায়ে কেরামের

^{২৬৮} তারিখ খলীফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ১০০।

^{২৬৯} কিসসা বা'হ আবু বকর জাইশ উসামা, পৃ. ৪৪।

মতও সঠিক হতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মত ভুল হতে পারে। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই কোনো সিদ্ধান্তকে সঠিক বলা যাবে না।^{২৭০} অন্য কথায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম একমত হলেই এটা প্রমাণ করে না যে, সিদ্ধান্তটি সঠিক।

৪। কথা অনুযায়ী আমল হতে হবে এবং ইসলামের সেবায় যুবকদের ভূমিকা

উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন প্রচণ্ড ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নেতা নির্বাচন করা হলো, তখন তার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর; অন্য বর্ণনায় আঠারো বছর। বয়সের কারণেই তিনি রণক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে অনেক সাহাবী তার নেতৃত্বে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। তাদের এ অনুভূতি নিশ্চিত না হলেও বুঝতে অসুবিধা হতো না। উসামার সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকে অনেক যুদ্ধে চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, ইসলামের বড় বড় যুদ্ধ—বদর ও উহুদ—এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সী যোদ্ধাও ছিলেন। আবার অনেকে রণক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ত উপদেষ্টাও ছিলেন; যেমন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু (খলীফা হওয়ার আগে যিনি উসামার বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন) এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবার অনেকেই একজন বিশ বছর বয়সী যুবকের নির্দেশ মানতে স্বস্তি বোধ করছিলেন না। তারা এমন একজন সেনাপতি চাচ্ছিলেন যে কিনা অভিজ্ঞ, বয়সেও প্রবীণ এবং যাকে সব সৈনিকরা সম্মান করে। একটিই সমস্যা ছিল, তারা পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। কারণ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। এজন্য তাদের তর্ক করার কোনো অধিকারই ছিল না; কারও জন্যই তা উপেক্ষা করা বা অন্তরে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করার অবকাশ ছিল না; রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্বাচিত সেনাপতির আনুগত্য করা এবং অন্য যে কোনো সেনাপতির মতো তাকেও মেনে চলা তাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল। এ বিষয়টাই আবু বকর তাদের কাছে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি কেবল তাদেরকে সামান্য কথায় সতর্ক করেননি; তিনি তার কথাকে কার্যে পরিণত করেছেন। এজন্য তারা যদি এই বিশ বছর বয়সী যুবকের কাছে বিনয়ী হয়, তাহলে তিনিও তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এটা দু-ভাবে করেছেন :

ক। পুরো মুসলিম জাতির নেতা হয়েও তিনি উসামার পাশে বিনয়ের সাথে হেঁটেছেন, অথচ উসামা বাহনের উপর বসা ছিলেন। উসামা ছিলেন বিশ বছর বয়সী (অথবা আঠার) যুবক, আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ষাটের বেশি, উসামা বাহনে আরোহনের জন্য অনুরোধ করার পরও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং তিনি উসামাকে বাহন থেকে নেমে হাঁটতেও নিষেধ করেছেন। তিনি এটা সব সৈনিকের সামনেই করেছেন যেন সবাই জেনে নেয় রাসূলের পছন্দ ছিল যে, উসামা এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে এবং তিনি এ কারণে দলের সবার সম্মান এবং আনুগত্যের দাবী রাখেন। এটা এমন ছিল যেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, ‘হে মুসলমান, আমার দিকে তাকাও: যদিও আমি রাসূলের খলীফা, আমি সেনাপতিকে সম্মান করার জন্য হাঁটছি, সে এমন একজন সেনাপতি যাকে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারপরেও তোমরা তোমাদের নেতা হিসেবে কিভাবে তার সমালোচনা করতে পার?’^{২৭১}

খ। মদীনার জটিল পরিস্থিতিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টা উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রয়োজন ছিল। একটিই সমস্যা ছিল যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উসামার বাহিনীর একজন সাধারণ সৈন্য। পুরো মুসলিম জাতির খলীফা হিসেবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রেখে যাওয়ার জন্য তিনি একটি আদেশ দিলেই

পারতেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার জন্য রেখে যান। উসামার বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যরা যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য উসামাকে অনুরোধ করতে দেখলেন, তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারল যে, উসামা অন্যান্য নেতার মতোই তাদের নেতা এবং তিনি তাদের সম্পূর্ণ সম্মান এবং আনুগত্যের দাবীদার।

উপরের দু-টি কাজের মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথাকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি দলের সব সদস্যের পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর পরে তিনি নিজে, যদিও তার এটা করার প্রয়োজন ছিল না, একই কাজ করেছেন, উসামার প্রতি রাসূলের মনোনীত নেতা হিসেবে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, শুধু কথা বলাই যথেষ্ট না, সেটাকে আমলে পরিণত করা জরুরী। আল্লাহ বলেন,

اتْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের দিকে আদেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বোঝ না? ^{২৭২}

সন্দেহাতীতভাবে উসামার বাহিনীর ঘটনা ইসলামের খেদমতে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্মরণ রাখা দরকার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বিশ বছর (অথবা আঠার বছর) বয়সী যুবককে কোনো ছোটখাট গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য নেতা বানাননি, বরং ঐ সময়কার

সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। এ যুবক তার যোগ্যতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন এবং কিছু দিন পরই রণাঙ্গণ থেকে বিজয় এবং প্রচুর গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে এসেছেন। যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা এবং মদীনার জীবন অধ্যায়ন করে, তাহলে যে কেউ দেখতে পাবে যে, কিভাবে যুবকরা নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ইসলামের খেদমত করেছে এবং পরবর্তীদের জন্য কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে।^{২৭৩}

৫। যুদ্ধের আদব-কায়দা

যুদ্ধ প্রকৃতিগতভাবেই খুব অপ্রীতিকর এবং নিষ্ঠুর, যদিও কখনও কখনও এর প্রয়োজন রয়েছে। যে জাতি যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে জাতিকে অবশ্যই প্রাণঘাতী এবং আক্রমণাত্মক হতে হবে, কিন্তু কখনই বর্বর ও অসভ্য হওয়া উচিত নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে, তা সবই ছিল বর্বরোচিত উপখ্যান। এমনকি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও যেসব যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে শত্রুকে নিধন, শত্রুর ভূমিতে বাড়ি-ঘরসহ সব স্থাপনা ধ্বংস, মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা, শত্রুকে অপদস্ত, মৃতকে অবমাননা ইত্যাদি করার জন্য বর্বরোচিত উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

এখন যে বলা হয়, মানুষ সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং পূর্বের যুগের ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করেছে—এটা জঘন্য মিথ্যা। আর ইসলামের যুদ্ধ-বিগ্রহ খুব খারাপ অথবা কমপক্ষে অন্যান্য জাতির তুলনায় ভালো ছিল না—এটা আরও মারাত্মক মিথ্যা। এটা অবশ্যই সত্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ মানেই রক্তাক্ত সংঘাত, তথাপি

^{২৭৩} কিসসা বা'হ আবু বকর জাইশ উসামা, পৃ. ৭০।

রাসূল ও খুলাফায়ে রাশেদীন যুদ্ধকে যতদূর সম্ভব মহান, সভ্য এবং দয়ার ক্ষেত্র বানিয়েছিলেন। এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনী অভিযানে রওনা হওয়ার আগে যে নসীহত করেছিলেন, তাতে দেখুন, তিনি বলেছেন, ‘হে লোকসকল, থাম। দশটি বিষয়ে আমাকে নসীহত করার সুযোগ দাও। এগুলো আমার কাছ থেকে মুখস্থ করে নাও : কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর না, আমানতে খেয়ানত কর না, প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না, শত্রুপক্ষের কোনো নিহত ব্যক্তির অঙ্গ ছেদন করে আকৃতি বিকৃত কর না, খেজুরগাছ বা যে কোনো রকমের ফলবান বৃক্ষ উপড়ে, কেটে বা পুড়িয়ে দিও না, খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত কারও ছাগল, গরু কিংবা উট ইত্যাদি হত্যা কর না, পথিমধ্যে বা তোমাদের গন্তব্য স্থানে গির্জা, মন্দির বা উপাসনালয়ে উপাসনারত লোকদের বিরক্ত কর না—তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় থাকতে দিও।’

এ বক্তব্য ইসলামে নতুন নয়; কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় কোনো বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করার পূর্বে এরকম অনেক বক্তব্য দিয়েছেন।^{২৭৪} ঐসব বক্তব্যের সাথে উপরের বক্তব্যেও যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের বাণীকে অন্য জাতির কাছে প্রচার-প্রসার করাই মূল লক্ষ্য। এ মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে :

ক। তাদেরকে অবশ্যই মর্যাদাবান হতে হবে, বিশ্বাসঘাতক নয়। অন্য জাতির সাথে কৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তারা বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে কারও সম্পদ চুরি করবে না অথবা জোর করে দখলে নিবে না।

খ। মৃত শত্রুর লাশ বা চেহারাকে বিকৃত করা যে কোনো মুসলমান সৈন্যের জন্য নিষিদ্ধ।

গ। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমান সৈন্যরা কিছুতেই শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের কোনো ক্ষতি করবে না। এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

ঘ। ইসলাম এটা নিষিদ্ধ করে যে, শত্রুর ভূমিতে যে কোনো স্থাপনা বা গাছ-পালা ধ্বংস করা যাবে না। আধুনিক যুগের যুদ্ধে এটাকে কোনো বিষয়ই মনে করা হয় না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম যোদ্ধাদেরকে শস্য, খেজুর বৃক্ষ, বাগান অথবা ক্ষেত-খামার নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া উট, গরু বা দুগ্ধা—যা ঐসময় গর্বের বস্তু ছিল, জবাই করতে নিষেধ করেছেন।

ঙ। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে অবশ্যই আগে নাযিলকৃত ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং বিভিন্ন উপসনালয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে উপাসনারত ব্যক্তিদের ক্ষতি করা যাবে না। এ মূলনীতি ইসলামী যুদ্ধের সভ্য এবং পরিশুদ্ধ প্রকৃতিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। মুসলিম যোদ্ধাকে সাধকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়নি, বরং যারা সত্যকে স্বীকার করতে চায় না, অন্যায়-অবিচারকে লালন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ তৈরি করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে।

উপরে বর্ণনা থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, বর্তমান যুগে এমন কোনো আর্মি কি আছে যারা এসব মূলনীতির ধারে-কাছে আসতে পারে? এর উত্তর অবশ্যই, না। আধুনিক যুগে ও সভ্যতায় কত নিরীহ মহিলা এবং শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে, আর এ হীন কাজকে ‘পরোক্ষ ক্ষতি’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। দেশের স্থাপনাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে যে, মনে হয়, একটি পরিত্যক্ত বিরান ভূমি।

গত বিশ বছরে সংঘটিত যে কোনো ছোট যুদ্ধকেও পর্যালোচনা করুন, আপনাকে অবশ্যই তা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আপনার লোমকূপ দাঁড়িয়ে যাবে! অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, আমাদের মুসলিম জাতির বর্তমান

করুণ অবস্থার কারণে এসব যুদ্ধের বেশিরভাগ শিকার হচ্ছে মুসলমানরা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, উসামার সৈন্যদের প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য কেবল কথার ফুলঝুরি নয়, বরং একটি মূলনীতি যা তার সময়ে এবং পরেও অনুসরণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬। উসামা রা.-এর বাহিনী প্রেরণে রাজনৈতিক ফায়দা

উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী প্রেরণে মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নেওয়া পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা। তিনিই এটা শুরু করেছিলেন, তারপর সুনির্দিষ্ট আক্রমণ পরিকল্পনাসহ পুরো বাহিনীকে সাজিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমান সম্রাটের দখলকৃত কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারেননি যে, তার এ মিশনকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তথাপি তিনি পুরো বাহিনীকে গঠন এবং শাম দেশের দিকে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর যখন রাসূল ইত্তেকাল করলেন, এ বাহিনী জুরফ এলাকায় ক্যাম্পিং করে অবস্থান গ্রহণ শুরু করল। এ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে মদীনায়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেমন অনুভব করতেন? অবশ্যই তার মনে হতো, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। এজন্য তিনি ঠিক এর উল্টো কাজ করেছেন; তিনি উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে প্রেরণ করে রাসূলের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়ন করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী প্রেরণের পেছনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের আদেশকে বাস্তবায়ন করা। এখানে আর

কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। কারণ রাসূলের অন্যান্য সব সাহাবী এ বাহিনীকে ফিরিয়ে এনে আরবের অস্থিরতা দমনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন।

উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল একটি সুদক্ষ কৌশলগত তৎপরতা যা মুসলমানদের জন্য অবিশ্বাস্য ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। এর ফলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, উসামার বাহিনী প্রেরণ করে তিনি বহিঃশত্রু রোমানদের এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু ধর্মত্যাগীদের উভয়ের কাছে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা খুব শক্তিশালী জাতি। এটা তাদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বাধ্য হয়। আরবের উত্তর প্রান্তে অধিবাসীরা বলে ওঠে, ‘তারা নিশ্চয়ই অনেক শক্তিশালী। নতুবা এই পরিস্থিতিতে এরকম বাহিনী প্রেরণ করতে পারত না।’ আর রোমানরা বলতে লাগল, ‘তাদের কি হলো, তাদের সাথীর মৃত্যু হয়েছে আর তারা এসে আমাদের ভূমিতে আক্রমণ করছে!’^{২৭৫} উসামার বাহিনী প্রেরণ করে যা আশা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সফলতা আসে। শত্রুর মনে নিজস্ব শক্তি, অস্ত্র এবং সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। ধর্মত্যাগীরা মদীনা আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে পেছনে হটে যায় অথবা মুসলমানদের সাথে নতুন করে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

এ অভিযানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্তে আরব গোত্রদের শত্রুতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই পরে এসব এলাকা বিজয় করা সহজ হয়ে যায়।

এ অভিযানের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক, কিন্তু এতে ঝুঁকিও ছিল মারাত্মক। মুসলমানদের একজন বিজ্ঞ এবং সাহসী নেতার প্রয়োজন

ছিল। তারা এরকম একজন নেতা পেয়েছিল যার মধ্যে এ গুণ পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। বিবর্ণ জিনিস যেরকমই লাগুক দেখতে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময় তার চিন্তা-চেতনায় অবিচল এবং দৃঢ় ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে জটিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর তুলনা তিনি নিজেই।

এ অভিযানের পরবর্তী ফলাফল হিসেব করে শেষ করা যাবে না। নিকটবর্তী ফলাফল ছিল, উসামা এবং তার বাহিনী শত্রুদের পরাজিত করে অনেক গণিমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। যখন উসামার বাহিনী বিজয়ের বেশে মদীনায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির এবং আনসারদের অনেক বিখ্যাত সাহাবীদেরকে নিয়ে শহরের বাইরে অভ্যর্থনা জানাতে যান। সবার কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল, ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।’ মদীনার অধিবাসীরাও উসামার বাহিনীকে স্বাগত জানাতে ঘরের বাইরে বের হয়ে আসে। তারা বাহ্যিকভাবে খুব উচ্ছসিত ছিল, আর মনে মনে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হচ্ছিল। মদীনায় প্রবেশ করেই উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে দুই রাকাত শৌকরানা নামায আদায় করেন। আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সকল সাহাবীদের উপর রহম করুন।

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন

- কুরআন ও বিজ্ঞান (৬২৪০) | ইসলাম ও সামাজিকতা (৬৩০০) | ইসলামে আধুনিকতা (৬৩০০) | তাবলীগ ও তালীম (৬২৪০) | পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দীনী অনুভূতি (৬৩০০) | An Appeal to Common Sense (৬৪০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন

- আত্মশুদ্ধির পাথের (৬২৪০) | প্রফেসর হযরতের মালফুযাত (৬৩০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন
- প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর (৬৩০০) | প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর (৬২২০) | সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি (৬২৩০) | পথের দিশা (৬৪০০) | সোহবতের গল্প (৬৩০০) | একজন আলোকিত মানুষ (৬৩০০) | একা একা আমেরিকা (৬৩০০) | পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন (৬৩০০) | মুহাম্মাদ আদম আলী
- খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি (৬৩০০) | জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (রাসূল সা.-এর বিবি, সঙ্গীনী, ফকীহ) (৬৫০০) | রশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী
- তাসাওউফ : তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয় (৬৩০০) | কসদুস সাবিল (৬১০০) অনুবাদ : মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ | মূল্য : ৬ ৩০০.০০
- রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ | ড. তারিক রমাদান | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৬ ৪০০.০০
- মুনাযাতে মাকবুল (৬২০০) | মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. | পিচ্ছিল পাথর (৬৪৮০) | খাদের বেগ | বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী
- মালফুজাতে বোয়ালভী রহ. | সংকলন : মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ | মূল্য : ৬ ৩০০.০০
- মুমিনের সফলতা | হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৬ ২০০

- হাদীসের দুআ দুআর হাদীস | ইমাম আবু ইসা তিরমিযী | অনুবাদ ও টীকা : মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৩০০.০০
- রমযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয় | মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ৩২০.০০
- মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয় | সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ২৪০.০০
- The Accepted Whispers (৳৪০০.০০) | Listening to the Quran (৳৫০০.০০) | First Things First (৳৮০০.০০) | Khalid Baig
-
- জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য ১২০০
- জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : উম্মে মুহাম্মাদ / মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ১৪০০.০০
- জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য ১১০০
- জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী এবং মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ২৩০০.০০
- মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন | শায়খ মাহমুদ আল-মিসরী অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক | মূল্য : ৳ ৯০০.০০
- তোমাকেই বলছি হে আরব | সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ | মূল্য : ৳ ২০০.০০
- তাকসীরে মুযিহুল কুরআন (প্রথম খণ্ড) | শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৮০০.০০
- মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) | সর্বমোট মূল্য : ৳১৬০০ রশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী